শ্রীহট্ট পরিচয়

রণেন্দ্রনাথ দেব

শ্রীহট্ট পরিচয়

শ্রীহট্টের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত

প্রথম পর্ব

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি প্রণীত

"শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থ অবলম্বনে আলোচনা

দ্বিতীয় পর্ব

রণেন্দ্রনাথ দেব লিখিত

শ্রীহট্টের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

বিবরণ

রণেন্দ্রনাথ দেব কর্তৃক প্রকাশিত
জেলা— নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২৩৫।

প্রথম প্রকাশ— ডিসেম্বর ১৯৮৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ— এপ্রিল ১৯৯৭

মুদ্রক :-
জিৎরাজ অফসেট
১০৩/১বি রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

সহোদরা অঞ্জলি, অর্চনা, অপর্ণা, অঞ্জনা

ও

সহোদর মনন-কে

শুভকামনা ও আশীর্বাদ সহ্।

মমতাবিহীন কালস্রোতে
বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হোতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।
ভারতী আপন পুণ্যহাতে
বাঙালীর হৃদয়ের সাথে
বাণীমাল্য দিয়া
বাঁধে তব হিয়া।
সে বাঁধনে চিরদিন তরে তব কাছে
বাঙলার আশীর্বাদ গাঁথা হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট সম্মিলনীর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান হবার কথা ছিল এবং একটি স্মরণগ্রন্থ বার করারও প্রস্তাব ছিল। ওই গ্রন্থটির জন্য আমি একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠাই। আজ পর্যন্ত গ্রন্থ বার হয়নি, অনুষ্ঠানও হয়েছে বলে শুনি নি। প্রবন্ধটি লিখবার সময় অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি প্রণীত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' বইটি থেকে আমি সাহায্য নিয়েছিলাম। বারবার মনে হচ্ছিল— এ বই কেন পুনরায় মুদ্রিত হয় না? ছাত্রজীবনে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের কলেজে এক সভায় অচ্যুতচরণ চৌধুরী মশায়কে সংবর্ধিত করা হয়। সে সভায় তাঁর সম্বন্ধে ও তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে কিছু জেনে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' পড়বার জন্য কৌতূহল জন্মায়। কিন্তু বইটি তখনই দুষ্প্রাপ্য হয়েছে, দুদিন বাদে আমিও পড়ার তাগিদ হারিয়ে ফেলি। দীর্ঘকাল পরে যখন বইটি পড়বার সুযোগ পেলাম লেখকের পাণ্ডিত্য, ঐতিহাসিক মনীষা, রচনা সৌকর্য, পরিশ্রমশীলতা, তথ্যপ্রাচুর্য আমায় অভিভূত করে ফেলে। যাঁরা বাংলা সাহিত্য পাঠ করেন, বাঙালী ও বাংলাদেশ সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন এ বই না পড়ে তাঁদের চলে না, এ আমার বিশ্বাস হল। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের' কোনো কোনো অংশের পরিমার্জনা ও নতুন অধ্যায় ও তথ্য সংযোজন প্রয়োজন। এ কাজে যাঁরা যোগ্যব্যক্তি তাঁদের দুয়েকজনকে অনুরোধ করলাম— কেউ সাহস পেলেন না। প্রকাশক খুঁজলাম। পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে দু-হাজার পৃষ্ঠার বই ছাপাতে কারো উৎসাহ দেখা গেল না। বইটি সম্পূর্ণভাবে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে পড়ে যাবে একথা ভাবতেও কষ্ট হলো। নিজের চাকরিতে ব্যস্ত থাকি— সময় করে উঠতে পারি না। ১৯৮০ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে মাসখানেকের মধ্যে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের' একটি সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করলাম। যদি মূল বই পাঠকেরা না-ও পড়েন এর বিষয়বস্তুর কিছুটা আস্বাদ তাঁরা পাবেন।

সারসঙ্কলনের পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' দুটি অংশে বিভক্ত— পূর্বাংশ ও উত্তরাংশ। পূর্বাংশে দুই ভাগ। প্রথম ভাগে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় ভাগে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। উত্তরাংশে তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ। তৃতীয় ভাগে পরগণা অনুসারে সাজিয়ে বহু পরিবারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ ভাগে শ্রীহট্টের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবন চরিত।

সারসঙ্কলনের সময় আমি পূর্বাংশের প্রায় সবটারই উল্লেখ করেছি। খুব ছোট হলেও প্রতিটি অধ্যায়ের কিছু কিছু বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় বিন্যাস মূল বইয়ে যেমন আছে সেরকম। উত্তরাংশে তৃতীয় ভাগ সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছি। চতুর্থ ভাগ থেকে মাত্র ক'টি জীবনী গ্রহণ করেছি। এঁরা সবাই আধুনিককালের পূর্ববর্তী। আধুনিক যুগের মনীষীদের জীবন কথা এ বইয়ের দ্বিতীয় পর্বে আমার লিখিত অংশে দিতে চেষ্টা করেছি।

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' বিশাল গ্রন্থ— প্রতি অংশে প্রায় আটশো পৃষ্ঠা। বর্তমান সারসংকলন ওই অপূর্ব সৃষ্টির শুষ্ক কঙ্কাল মাত্র। বিশেষতঃ অচ্যুতচরণের ভাষাসৌন্দর্য এ সংকলনে কিছুই ধরা পড়বে না, শুধু চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব তাঁর ভাষার অনুগমন করতে।

ইতিহাস রচনায় অচ্যুতচরণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাঁর যৌক্তিকতা ও বৈজ্ঞানিকতা বিশেষ প্রশংসনীয়। অচ্যুচরণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমাধারী ছিলেন না। আজ থেকে নব্বুই বছর আগে একাজে যখন তিনি হাত দেন আমাদের দেশে ইতিহাস রচনার সুষ্ঠু পন্থা তখনো গড়ে ওঠে নি। বিস্ময়ের বিষয়, অচ্যুতচরণের রীতি সম্পূর্ণ আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। তথ্য-উপাদানের ক্ষেত্রে তিনি, শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রস্তরলিপি, প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও ইতিহাস, প্রাচীন বাংলাকাব্য ও জীবনী এগুলি ছাড়াও শ্রীহট্ট জেলার প্রতিটি গ্রাম থেকে উল্লেখযোগ্য পরিবারগুলির বংশবৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছিলেন। সংস্কৃত-বাংলা-ফার্সি অজস্র দলিল তিনি সংগ্রহ করেন। এগুলির ভিত্তিতে প্রতিটি তথ্যকে যাচাই করে তিনি ইতিহাসের অঙ্গীভূত করেছেন। অচ্যুতচরণের গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পরে পদ্মনাথ সরস্বতী মশায় নিধনপুর তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করেন। তাঁর 'কামরূপ শাসনাবলী' আরো পরে প্রকাশিত হয়। এইসব উপাদান সংযোজনা করলে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' আরো পূর্ণাঙ্গ হতো সন্দেহ নেই, কিন্তু তা না হওয়ার জন্য এর প্রতিপাদ্য বিষয় ম্লান হয় নি।

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' প্রকাশিত হবার পর অমৃতবাজার পত্রিকা, বসুমতী, বঙ্গবাসী, ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, পরিদর্শক প্রভৃতি পত্রিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মতো সমালোচকেরা বইটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। কিন্তু 'প্রবাসী' পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩১৮) আচার্য যদুনাথ সরকার যা লিখেছিলেন তা এর সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন :

'স্বদেশকে ভালবাসিতে হইলে তাহাকে ভাল করিয়া জানা চাই। তবেই স্বদেশপ্রেমিকতা বৃথা ভাবোচ্ছ্বাসে বিলীন হইয়া যায় না। আমরা এত কম বেড়াই যে নিজের জেলার অনেক স্থানই চিনি না।......

সুতরাং জেলার ইতিহাস লেখার যে একটা চেষ্টা দেশময় জাগিয়া উঠিয়াছে, সেটা শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করি। এই কার্যে "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের" লেখক যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন এবং যে শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে। ..... ফলতঃ ইউরোপে ইতিহাস লিখিতে আজকাল যেরূপ সুশৃঙ্খল প্রণালী ও সমবেত চেষ্টা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" বঙ্গদেশে তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত।

ইহার বিশুদ্ধ সংবাদ, ঠিক তারিখ ও সংখ্যা, চিত্র, দলিলের প্রতিলিপি, বংশাবলী প্রভৃতির জন্য, জেলার ইতিহাস হইলেও ইহা বঙ্গের ঐতিহাসিকের, ভারতের ঐতিহাসিকের, নিকট প্রথম শ্রেণীর উপকরণ বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম তথ্যের ভিত্তি না পাইলে কোন ইতিহাস স্থায়ী হইতে পারে না। সমাজের ইতিহাস লিখিবার পক্ষেও গ্রন্থখানি এক অত্যাবশ্যক খনি।'

আজকালকার 'মহাগ্রন্থে'র ভিড়ে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' যোগ্য মর্যাদা পাবে কি ?

বইটিকে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশের সঙ্গে আরো কিছু তথ্য দেওয়া প্রয়োজন, এ আমি অনুভব করি। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' মোটামুটি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীহট্টের ইতিহাস। এর পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি অন্ততঃ চুম্বকাকারে দেওয়া দরকার। আমি ইতিহাসবিদ নই, সাহিত্যের একজন সাধারণ

ছাত্র। সেজন্য ঐতিহাসিকের দায়িত্ববহন করার দুশ্চেষ্টা না করে শ্রীহট্টের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়মূলক একটি অধ্যায় যোজনা করেছি। বর্তমান গ্রন্থটির প্রথম পর্ব অচ্যুতচরণের রচনার নিষ্কর্ষ, দ্বিতীয় পর্ব আমার রচিত, কিন্তু সকলেই বুঝবেন এই অংশের প্রায় সব তথ্য অচ্যুতচরণের গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ও উত্তরাংশ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে অচ্যুতচরণ তথ্যসংগ্রহ করছিলেন ও লিখছিলেন। তিনি ধনীব্যক্তি ছিলেন না। এই গ্রন্থ রচনায় অনন্যমনা হয়ে তিনি সংসারের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন নি। বইটি লেখার কালে একে একে তাঁর স্ত্রী, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনিরুদ্ধ, পুত্র কুসুমাঙ্গ ও কন্যা নীলিমা মারা যান। পরমভাগবত অচ্যুতচরণ উপর্যুপরি শোকের আঘাত নিঃশব্দে বহন করেন। 'উত্তরাংশের' ভূমিকা পাঠ করলে আমাদের দৃষ্টি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি প্রীতি ও অনুরাগবশতঃ তিনি যে কাজ করেছেন আমরা আজকাল তা স্মরণ রাখাও প্রয়োজন বোধ করি না, কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন দূরে থাক।

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' প্রণয়নে মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য সরস্বতী মশায়ের দানের উল্লেখ অচ্যুতচরণ নিজেই করে গেছেন। পদ্মনাথ সরস্বতী অচ্যুতচরণের হাতে নিজের সংগৃহীত সমস্ত উপাদান সমর্পণ তো করেনই, উপরন্তু এই বিশাল গ্রন্থের মুদ্রণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার তিনিই বহন করেন। অধ্যাপক পদ্মনাথও ধনবান ছিলেন না, কিন্তু এই ত্যাগ স্বীকার দ্বারা তিনি অধ্যাপনা বৃত্তিকে পুণ্যআলোকে উজ্জ্বল করেছেন। এই দুই মহাত্মার কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পড়ে আমি আনন্দ পেয়েছিলাম, পাঠকেরাও সে আনন্দের আস্বাদ পান, এই আমার কামনা। শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত গুপ্তচৌধুরীর কয়েকটি লেখা, শ্রীকুমুদবন্ধু ভট্টাচার্যের 'সাহিত্য ও সংবাদিকতায় শ্রীহট্টের অবদান' এবং সৈয়দ মূর্তাজা আলীর 'আমাদের কালের কথা' বইগুলি থেকে অনেক স্থলে সাহায্য নিয়েছি। তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই। পরিশিষ্টে সুন্দরীমোহন দাসের 'সিলেটী রামায়ণ' উদ্ধৃত হয়েছে। এটি সংগ্রহ করে দিয়েছে আমার কনিষ্ঠভ্রাতা মননকুমার। শ্রীহট্টীয় প্রবাদ প্রবচনগুলি সংগ্রহ করেছি আমার শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক স্বর্গত শশীমোহন চক্রবর্তীর গ্রন্থ থেকে। শ্রীহট্টীয় উপভাষা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমার মান্য সহকর্মী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দাসের একটি লেখা থেকে সাহায্য নিয়েছি।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ঐতিহাসিক তথ্যবিষয়ে কোনো কোনো স্থলে পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। সে কাজ ইতিহাসবিদের করণীয়। আমি শুধু দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই :

প্রথমতঃ, নবগীর্বান বংশীয় রাজাদের সঠিক কালনির্ণয় প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, অচ্যুতচরণ প্রাপ্ত সনন্দগুলির মধ্যে দুয়েকটিতে আলাকুলি বেগ-এর নাম পেয়েছেন। শের আফগানের প্রকৃত নাম ছিল আলাকুলি বেগ। তিনি কি শ্রীহট্টে কখনো ফৌজদার ছিলেন ? এই প্রশ্নটির মীমাংসা হওয়া দরকার।

গ্রন্থটি সংকলন ও রচনার প্রায় চার বছর পরে মুদ্রিতরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। যখন এটি লিখি যে-কোনো বিষয়ে খট্‌কা লাগলে পিতৃদেব নীরেন্দ্রনাথ দেবকে জিজ্ঞাসা করে সন্দেহভঞ্জন করেছি। কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থটি তাঁকে দেখিয়ে সংশোধন করবার আগেই তিনি লোকান্তরিত হন। আজ তিনি জীবিত থাকলে শ্রীহট্টের পূর্ব গৌরবের সামান্য প্রতিফলনও আমার রচনায় মূর্ত হয়েছে দেখলে অসীম প্রীতি লাভ করতেন। গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে শোকতপ্ত চিত্তে বাবা ও মায়ের স্মৃতির প্রতি প্রণাম নিবেদন করছি।

ছোটমামা স্বর্গত লালা হিমাংশুভূষণ দাসের জীবদ্দশায় এ-বই তাঁর হাতে তুলে দিতে পারলাম না, এ আমার আর এক ক্ষোভ।

আমার বোনেরা— অঞ্জলি, অর্চনা, অপর্ণা, অঞ্জনা এবং ভাই মনন সারা জীবন আমার সকল কাজে সহযোগিতা করেছে। এ বই ওদের নামে উৎসর্গ করে তৃপ্তিলাভ করছি।

আমার সকল সাহিত্যকর্মের পিছনে রয়েছে আমার স্ত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবের নিয়ত উৎসাহ দান। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নেই। পুত্র শ্রীমান অলয়জ্যোতি, কন্যা কল্যাণীয়া রশ্মি, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ শ্রীমান রাজন, শ্রীমান সঞ্জীব, শ্রীমান সন্দীপ এবং ভাগিনেয়দ্বয় শ্রীমান অংশুমান ও শ্রীমান অনির্বাণ এ বই পড়ে শ্রীহট্টের মহিমা উপলব্ধি করবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মামা শ্রীপুণ্যব্রত ঘোষ আমার আবাল্য বন্ধু। বহু বিপদের দিনে তাঁর কাছ থেকে অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি। এই সুযোগে তাঁকেও প্রীতি জানাই।

তরুণ শিল্পী শ্রীসত্যেন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীহট্টের সুসন্তান। অসুস্থ অবস্থায়ও গ্রন্থের প্রচ্ছদলিপি এঁকে দিয়ে আমায় ঋণগ্রস্ত করেছেন।

সবশেষে বলতে হয় শ্রীদেবব্রত চৌধুরীর (শ্রীহট্টের কৌড়ীয়া, সিঙ্গেরকাছ) কথা যিনি সাহায্যের হাত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে না বাড়ালে এ বই কোনো দিনই মুদ্রিত হত না। তাঁর বদান্যতা ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার আমায় কতখানি শক্তি যুগিয়েছে তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না। তাঁর ও তাঁর ভ্রাতা শ্রী সত্যব্রত চৌধুরীর অশেষ সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করি।

আরো কত বন্ধুর নাম অনুক্ত রয়ে গেল। তাঁরা সবাই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

একটি ভ্রমের উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের সারভাগ ছাড়া অন্যান্য অংশেও পৃষ্ঠার শিরোদেশে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত কথাটি ছাপা হয়েছে। হওয়া উচিত ছিল— 'শ্রীহট্ট পরিচয়'।

৪ ডিসেম্বর ১৯৮৩ **রণেন্দ্রনাথ দেব**

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এক

প্রথম মুদ্রণের পনেরো বছর পরে "শ্রীহট্ট পরিচয়" আবার মুদ্রিত হচ্ছে। প্রথমবারে মুদ্রিত বইটির প্রায় সবকটি কপি বিক্রী হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রয়োজন হল। আমার ধারণা ছিল এ বইয়ের দ্বিতীয় মুদ্রণের দরকার হবে না। "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের" সার সংকলন রূপে বইটি বার করেছিলাম। সম্প্রতি "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" পুনবায় মুদ্রিত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও দেখতে পাচ্ছি অনেকে সংক্ষিপ্ত রূপে বইটি পেতে চান। তাঁদের চাহিদার কথা মনে রেখে বইটি পুনরায় ছাপালাম।

পাঠক সাধারণ যেভাবে "শ্রীহট্ট পরিচযেব" সমাদর করেছেন তাতে আমাব কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। বইটি দ্রুত বিক্রী হবে এমন আশা আমি কবি নি। কোনো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিই নি। কোথাও গ্রন্থ-সমালোচনা স্তম্ভে এ বই স্থান পেয়েছে, এমন শুনি নি। তবু বইটি পড়বাব জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা দেখে আমি অভিভূত। বহু দূব-দূরান্ত থেকে মানুষ এ বই কেনাব জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দুয়েকটি দুষ্ট ব্যক্তি কোনো কোনো সম্প্রদায়েব নাম কবে আমায় কুৎসিত ভাষায় চিঠি লিখেছেন। কয়েকজন (এঁদেব মধ্যে তথাকথিত অধ্যাপকও আছেন) বইয়ের ব্যাপাবে আমায় প্রতারণা করেছেন। কিন্তু বৃহৎ পাঠক সমাজেব সমাদর এত বেশি পেয়েছি যে অপকারী ব্যক্তিদেব আমি কোনো গুরুত্ব দিই না। গ্রন্থ বিক্রয়ে অনেকে অযাচিতভাবে সাহায্য করেছেন। বিশেষ সহায়তা পেয়েছি আমাব তিন বন্ধু— শিলং সেন্ট এড্‌মন্ড্‌স্ কলেজের ইংরাজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক বনমালী রায়, করিমগঞ্জ কলেজেব ইংরাজিব অধ্যাপক ও প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ সুখময় বসু ও শিলচরের প্রসিদ্ধ প্রধান শিক্ষক ও জননেতা প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামীব কাছ থেকে। বনমালীবাবু ও সুখময়বাবু কিছুকাল পূর্বে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁদেব পবিত্র স্মৃতিব প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। বন্ধুবব শ্রীবিশ্ববন্ধু সেনকেও অজস্র ধন্যবাদ।

বনমালীবাবু বইটি পড়বার পর বিভিন্ন পত্রে তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন। তাঁর দুটি মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, সিলেটী ভাষায় কিছু কিছু খাসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যেমন, পেযারা শব্দেব বদলে সিলেটে বলা হয় 'সফ্‌রিআম' বা সংক্ষেপে 'সফ্‌রি'। এটিব মূল খাসি শব্দ 'শ-প্রিয়াম' বা প্রিয়াম ফল। তাঁব দ্বিতীয় মতটি সুবমা নদী সংক্রান্ত। যদিও বাসুদেব শরণ অগ্রবাল তাঁব "পাণিনি রচনায় ভারত" গ্রন্থে বলেছেন, পাণিনিতে সুরমা শব্দেব উল্লেখ আছে, তাঁর এই মত অভ্রান্ত বলে মনে হয় না। বনমালীবাবু লিখছেন— "শ্রীহট্ট পরিচয়েব মানচিত্রে নদী-সংক্রান্ত কিছু ভুল বহিয়াছে। খাসিয়া জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে নির্গত— লোভা, কুইগাং, চেঙ্গরখাল, পিয়াইন, চেলা, খাইমারা, যাদুকাটা, বৌলাই— নদীগুলির ধারা মিলিত হইয়া সুরমা নদীর সৃষ্টি হইয়াছিল। জলের রং 'সুর্মা' বা কাজলেব মত বলিয়াই নদীর এই নাম। নবাবী আমলে খাল খনন করিয়া ইহাকে ববাকেব সহিত যুক্ত কবা হয়। ইহার ফলে কুশিয়ারার অববাহিকা অঞ্চলে

বন্যার প্রকোপ অনেকটা লাঘব হয়। এই সুরমা নদী পশ্চিম এবং পরে দক্ষিণবাহিনী হইয়া পৈন্দা গ্রামের নিকট পৈন্দা এবং সুরমা এই দুই শাখায় বিভক্ত হয়। এই পৈন্দা পশ্চিমবাহিনী হইয়া পরে শ্রীহট্ট এবং ময়মনসিংহের সীমা বরাবর দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। সুরমা আরও দক্ষিণে আজমীরিগঞ্জের (টানাখালি) নিকট কালনী এবং শাখাসুরমা নামে দুই শাখায় বিভক্ত হয়। শাখা সুরমা দক্ষিণ-পশ্চিমবাহিনী হইয়া রাজানগর, চরলারচর, শ্যামার চর হইয়া ময়মনসিংহের অন্য এক নদীতে পতিত হয়। কালনা দিরাই ধল হইয়া মারকুলীর নিকট বিবিয়ানার সহিত মিলিত হইয়া ভেড়া মোহনা ধলেশ্বরী নামে পদ্মা মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়। কুশিয়ারা মনুমুখের নিকট বিবিয়ানা ও শাখা বরাক নামে দুই শাখায় প্রবাহিত হয়। শাখা বরাক হবিগঞ্জের দিকে এবং বিবিয়ানা মারকুলির দিকে প্রবাহিত হয়।"

বনমালীবাবুর মত সঠিক কিনা নিরূপণ করা হোক।

নাম গোপন করে কেউ কেউ তাঁদের মতামত জানিয়েছেন ও দুয়েকটি ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেগুলি শুধরে দিলাম।

দুই

"শ্রীহট্ট পরিচয়" বার হবার পর শ্রীহট্টের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে এই বইগুলির উল্লেখ করা সমীচিন। ছাত্রজীবন থেকে আমি শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরীর লেখাগুলির অনুরাগী পাঠক। "শ্রীহট্ট পরিচয়" তাঁকে উপহার স্বরূপ পাঠালে পর তিনি তাঁর The Copper Plates of Sylhet বইটি আশীর্বাদসহ আমায় উপহার দিয়েছেন। আমি নতমস্তকে তাঁর দান গ্রহণ করছি। নয়াদিল্লী শ্রীহট্ট সম্মিলনীর পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (১৯৮২) শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মন্মথরঞ্জন চৌধুরীর সৌজন্যে আমি তার একটি কপি পাই। এই গ্রন্থে আমার প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী রচিত "সংস্কৃত সাধনায় শ্রীভূমি সন্তান" প্রবন্ধটি খুব মূল্যবান। আর একটি দামী প্রবন্ধ দুর্গাপুর শ্রীহট্ট সম্মিলনী প্রকাশিত (১৯৯৫) "শ্রীভূমি-শ্রীহট্ট" গ্রন্থে ডঃ সচ্চিদানন্দ ধরের লেখা "শ্রীহট্ট অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার প্রসার" প্রবন্ধ। শিলং রবীন্দ্রস্মৃতি গ্রন্থাগারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে "সংহৃতি" নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন বার হয়েছে (১৯৯২)। এটির অন্যতম সম্পাদক শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র চৌধুরী। এঁর সম্পাদনায় কিছুদিন আগে আর একটি সংকলনগ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে (১৯৯৬)— "শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখা"। করিমগঞ্জের অধ্যাপক ডঃ সুজিৎ চৌধুরী তাঁর রচিত "শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস" আমাকে উপহার দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর ভ্রাতা রবিজিৎ চৌধুরী "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" সম্পূর্ণ গ্রন্থটি মুদ্রিত করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় মাত্র একখণ্ড মুদ্রিত হবার পর অকস্মাৎ নিতান্ত অকালে রবিজিতের দেহান্ত হয়েছে। ডঃ সুজিৎ চৌধুরীর কল্যাণে এ বইটিও আমি পেয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রবিজিতের ভ্রাতারা তাঁর আরব্ধ কর্ম সুসম্পন্ন করবেন। ডঃ সুজিৎ চৌধুরী পরিশ্রমী গবেষক। সেইজন্য তাঁর কোনো কোনো মতের যৌক্তিকতা বিষয়ে আমি

সন্দিহান হলেও (যেমন কপিলমুনি প্রসঙ্গে) তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। এখানে তাঁর একটি লেখার উল্লেখ করবো। "সংহৃতি" সংকলনে তিনি "শ্রীহট্টে আর্যব্রাহ্মণ্য প্রভাবের সূচনা : নিধনপুর লিপি" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। অচ্যুতচরণ চৌধুরী যখন "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" লেখেন তখনও নিধনপুর লিপি আবিষ্কৃত হয় নি। এর আরো পরবর্তীকালে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমভাগ অঞ্চলে আর একটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে যার পাঠোদ্ধার করেছেন শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী। এই দুটি তাম্রলিপির বিচার করে ডঃ চৌধুরী মনে করেন দানে উল্লিখিত শাল্মলী ময়ূর অগ্রহার ভূমি এবং বিষয় চন্দ্রপুর (বা চন্দ্রপুরী) শ্রীহট্টেই অবস্থিত ছিল এবং দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণেরা লাট বা গুজরাট দেশাগত এবং সম্ভবতঃ আসাব পথে তাঁরা কিছুকাল মিথিলায় বসবাস করেছিলেন। ডঃ চৌধুরীর অভিমতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত এবং তাঁর বিস্তারিত রচনাটি সম্পূর্ণ হবার অপেক্ষায় আছি।

প্রসঙ্গতঃ অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের দুয়েকটি মন্তব্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। "চৈতন্যাবদান" গ্রন্থে অধ্যাপক সেন বলেছেন, শ্রীহট্টের প্রকৃত নাম ছিল শীলহট্ট অর্থাৎ একজন ব্যক্তি এখানকার হাটের উঞ্ছ কুড়িয়েই জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হতো। গয়াতে মা ও বাবার পিণ্ড দেবার সময় দেখেছি ওখানকার পাণ্ডারা সিলেটকে সিলহট্ট বলে উল্লেখ করেন। মনে হচ্ছে এটিই প্রাচীন রূপ। শ্রীহট্ট শব্দটি পরেকার পরিবর্তন।

অধ্যাপক সেন বলেন, চৈতন্যের জন্মের পূর্বে যেসব শ্রীহট্টবাসী নবদ্বীপে বসতি স্থাপন করেন তাঁরা একটি উন্নততর শিক্ষা ও সংস্কৃতিব উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীহট্ট এর অনেক আগে থেকেই জ্ঞানচর্চার একটি উৎকৃষ্ট কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

অধ্যাপক সুকুমার সেনের দুটি মন্তব্যই পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রণিধানের বিষয়।

তিন

"শ্রীহট্ট পরিচয়" উৎসর্গ করেছিলাম আমার ভ্রাতাভগ্নীদের নামে। তাদের আমি আবার সস্নেহ আশীর্বাদ জানাই। এ বইয়ের প্রচারে তাদের দান সর্বাধিক। আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা এবং আমার সুহৃদ্বর্গ শ্রীহট্ট পরিচয়ের প্রতি যে অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন এবং জানা অজানা শত শত পাঠক এ বইটির যে আনুকূল্য করেছেন আমি তার ঋণ শোধ করতে অক্ষম। তাঁরা আমার বিনীত নমস্কার গ্রহণ করুন। "শ্রীহট্ট পরিচয়" স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজব্যয়ে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত দেবব্রত চৌধুরী। এবারও মুদ্রণভার তিনি হাসিমুখে বহন করেছেন। তিনি দীর্ঘায়ু হয়ে দেশের ও দশের সেবা করুন, এই প্রার্থনা। জিৎরাজ অফসেটের কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দৃষ্টিক্ষীণতা বশতঃ আমার প্রুফ দেখায় অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে। জিৎরাজ অফসেটের কর্মীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন সেগুলি সংশোধন করতে। ত্রুটি আমারই।

এ-৮/৭৯ কল্যাণী (এ-ব্লক)
জেলা— নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১ ২৩৫ রণেন্দ্রনাথ দেব
৮ মার্চ ১৯৯৭

প্রথম পর্ব : ইতিবৃত্ত

পূর্বাংশ [প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ]

উত্তরাংশ [তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ]

দ্বিতীয় পর্ব : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত

পূর্বাংশ

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম ভাগ

ভৌগোলিক বৃত্তান্ত

অধ্যায় — ১. শ্রীহট্ট জেলার সংক্ষিপ্ত কথা
২. প্রাকৃতিক বিবরণ
৩. কৃষিজাত দ্রব্য
৪. শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য
৫. বাণিজ্য
৬. ইতর প্রাণী
৭. অধিবাসী
৮. ধর্ম ও শিক্ষা
৯. তীর্থস্থান

প্রথম ভাগ

ভৌগোলিক বৃত্তান্ত

১. শ্রীহট্ট জেলার সংক্ষিপ্ত কথা

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির উত্তর-পূর্ব প্রান্তভাগে শ্রীহট্ট অবস্থিত। শ্রীহট্ট প্রাচীন বঙ্গভূমির অংশ বিশেষ; আইন-আকবরি ও রিয়াজ-উস্-সালাতিন প্রভৃতি ফার্সি গ্রন্থে শ্রীহট্ট বঙ্গদেশের অন্তর্গত বলে লিখিত আছে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে শ্রীহট্টকে আসাম প্রদেশভুক্ত করা হয়।

শ্রীহট্ট জেলার উত্তর সীমাস্থলে খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়, পূর্বদিকে কাছাড় জেলা, দক্ষিণে পার্বত্য ত্রিপুরা, এবং পশ্চিমে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলা। শ্রীহট্ট জেলা উত্তর অক্ষাংশ ২৩.৫৯ থেকে ২৫.১৩ এবং পূর্ব দ্রাঘিমা ৯০.৫৮ থেকে ৯২.৩৮ মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্রগর্ভ থেকে শ্রীহট্ট ৫৫ ফিট উর্ধ্বে স্থিত।

শ্রীহট্ট জেলার অধিকাংশ ভূমিই সমতল প্রান্তর। স্থানে স্থানে জঙ্গলাচ্ছাদিত বালুকাময় ছোট ছোট টিলা আছে। প্রান্তরে বহুতর নদী প্রবাহিত; সাধারণতঃ নদীগুলির তীরদেশেই জনবসতি। শ্রীহট্টে হাওরের সংখ্যাও কম নয়, বর্ষাকালে হাওরগুলিতে অনেক জল হয়। শ্রীহট্টের পূর্বদিক ক্রমোন্নত এবং পশ্চিমাংশ নিম্ন। ভূমি অতি উর্বরা, বৃষ্টিপাত মাত্রেই মাটি কৃষ্ণবর্ণ পঙ্কের আকার ধারণ করে।

শ্রীহট্ট ঘনবসতি সমাচ্ছন্ন জনপদ হলেও এর অনেকস্থান জল ও জঙ্গলাবৃত। উত্তরে খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পর্বত এবং দক্ষিণে ত্রিপুরা পর্বত উন্নতশীর্ষে দণ্ডায়মান। পূর্বদিগ্‌ভাগে ছোট ছোট পাহাড়। সুরমা ও বরাক নদী পূর্ব থেকে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত— উভয়পার্শ্বে সুরমা উপত্যকার সুরমা প্রান্তর বিস্তৃত। জঙ্গলাবৃত ভূমি পশ্চিমাংশে ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে— উত্তর-পশ্চিমাংশে জলাভূমির বাহুল্য।

শ্রীহট্টের প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নমনোমুগ্ধকর। পাহাড়ের নীরবগভীর ভাবের বিশদ বর্ণনা সহজসাধ্য নয়। বনে বৃক্ষের সারি, শাখায় শাখায় আকাশ সমাচ্ছন্ন। পুষ্টাঙ্গ বৃক্ষে স্থূলাঙ্গী লতা—লতায় লতায় ফুল। পাহাড়ের যে অংশে বাঁশবন সেখানকার শোভা অবর্ণনীয়। ঈষৎ হরিদ্রাভ নবীন শ্যামল পাতায় শোভিত বাঁশের শ্রেণী ক্রোশের পর ক্রোশ চলেছে তরঙ্গের মতো।

বর্ষাকালে হাওরের দৃশ্য সেরকমই গাম্ভীর্যময়। যতদূর দৃষ্টির সীমা— বহু যোজনব্যাপী অনন্ত জলের রাশি— যেন বিশাল সমুদ্র, বায়ুবেগে চঞ্চল। হেমন্ত ঋতুতে মাঠের শোভা মাধুর্যময়। কবি প্যারীচরণের ভাবে মন যেন গাইতে থাকে—

শ্রীহট্ট লক্ষ্মীর হাট আনন্দের ধাম,
সর্বাপেক্ষা প্রিয়তর এ ভূমির নাম।

শ্রীহট্টের জলবায়ু কিঞ্চিৎ আর্দ্র হলেও স্বাস্থ্যকর। এদেশে গ্রীষ্ম অপেক্ষা শীতের প্রভাবই অধিক। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়— বৃষ্টির বার্ষিক গড় ১০০ ইঞ্চির কম নয়। এর কারণ শ্রীহট্ট চেরাপুঞ্জীর নিকটবর্তী। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সুনামগঞ্জে প্রায় ২১০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছিল। এজন্যই জলবায়ু কথঞ্চিৎ আর্দ্রভাবাপন্ন। বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সাধারণতঃ বৃষ্টি হয়। কার্ত্তিক থেকে শীত অনুভূত হতে থাকে, পৌষ মাসে শীতের প্রাচুর্য অনুভূত হয়। ফাল্গুন চৈত্র ও বৈশাখ মাসে রোদের তাপ তীক্ষ্ণ হতে শুরু করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীহট্ট জেলায় (জয়ন্তীয়া সহ) পরগণা ছিল ১৯১ টি। গ্রামের সংখ্যা তখন প্রায় আট হাজার; অধিবাসীদের বসতবাড়ির সংখ্যা পাঁচ লক্ষের মত; একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ও সাতটি এন্ট্রান্স স্কুল ছিল; মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪২ এবং মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয় ১৪। ৩৮টি উচ্চ প্রাথমিক ও ৭৫১টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া সদরে মেয়েদের জন্য একটি মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয় ও ৮৩টি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় ছিল।

সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল ৪৩; প্রধান দাতব্য চিকিৎসালয়টির স্থাপনা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। ১৩৮টি পোস্ট অফিসের মধ্যে ১টি হেড অফিস, ৩৪টি সাব অফিস ও ১০৩টি ব্রাঞ্চ অফিস। এদের মধ্যে কম্‌বাইন্‌ড্‌ অফিস ৩২টি।

শ্রীহট্ট জেলার পরিমাণফল (জয়ন্তীয়াসহ) ৫৪৪৩ বর্গমাইল। জেলার দৈর্ঘ্য পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ৯০ মাইল এবং প্রস্থ উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৭৫ মাইল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের লোক গণনা অনুসারে সমগ্র জেলার লোকসংখ্যা ছিল ২২৪১৮৪৮ জন। শাসন কাজের সুবিধার জন্য জেলাকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়ঃ

১. উত্তর শ্রীহট্ট	৮৬৩.৫০	বর্গমাইল	৪৬৩৪[illegible]৭
২. করিমগঞ্জ	১০৬৬.০০	,,	৪১০৪৬০
৩. দক্ষিণ শ্রীহট্ট	১০৬৪.০০	,,	৩৭৯১৫৮
৪. হবিগঞ্জ	৯৯৯.০০	,,	৫৫৫০০১
৫. সুনামগঞ্জ	১৪৫০.০০	,,	৪৩৩৭১১

পাঁচটি মহকুমার অধীনে ১৬টি থানা ও তদধীনে ১৫টি ফাঁড়ি থানা ছিল। শ্রীহট্ট জেলা ডেপুটি কমিশনার দ্বারা শাসিত হত। ইনি ছিলেন সুরমা উপত্যকার কমিশনার সাহেবের অধীন।

এ ছাড়া পুলিস সুপারিন্টেডেন্ট ও তাঁর সহকারী, জেল সুপারিন্টেডেন্ট প্রভৃতি ছিলেন। বিচার বিভাগে ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট জজ ও তাঁর সহকারী এবং সব-জজ ও অ্যাডিশনাল সব-জজ। মহকুমাগুলিতে দেওয়ানী বিচারকার্য সম্পাদিত হত মুন্সেফ দ্বারা।

প্রত্যেক মহকুমার ভার অর্পিত হত একজন অ্যাসিস্টেন্ট বা এক্সট্রা অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনারের উপর। সাব-ডিভিশনাল অফিসারের অধীনে ছিলেন এক্সট্রা অ্যাসিস্টেন্ট ও সাব-ডেপুটিগণ।

১৯০৪ সনে জেলার পুলিশ বিভাগে ছিলেন ৬ জন ইন্সপেক্টর (এঁরা মহকুমাগুলিতে অবস্থিতি করতেন), ৪৯ জন সব-ইন্সপেক্টর, ৪ জন হেড কনস্টেবল, ২৬৭ জন কনস্টেবল ও ৫১৫৮ জন গ্রাম্য চৌকিদার। ওই বছরে সরকারের মোটামুটি আয়ের হিসাবঃ

ভূমি-রাজস্ব	৮৪২৪৪৩	টাকা
ঐ -- বিবিধ	৬৩২৯৫	,,
	৯০৫৭৩৮	,,
জলকর	৬৬৯০০	,,
বনকর	৭০৪২৫	,,
আবগারী	২৬০৭০৮	,,
স্ট্যাম্প	৫১৫৭৯২	,,
রেজিস্টারী	৫৩৭০৯	,,
প্রভিন্সিয়েল রেট	২৩৭৪১৫	,,
ইনকাম ট্যাক্স	৫৩৫১৯	,,
	২২০৪২০৬	,,

প্রাচীনকালে শ্রীহট্ট লাউড়, গৌড় ও জয়ন্তীয়া এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। মুসলমান শাসনকালেও শ্রীহট্টের সীমা ছিল বিস্তৃততর--- তখন ত্রিপুরার সরাইল ও ময়মনসিংহের জোয়ানশাহী প্রভৃতি শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে লিখিত আছে, সম্রাট আকবরের সময় শ্রীহট্ট জেলা আট ভাগে বিভক্ত ছিল ; এক একভাগ মহল নামে কথিত হত---

মহলের নাম	**রাজস্ব (দাম)**	**মন্তব্য**
প্রতাপগড় (ও পঞ্চখণ্ড)	৩৭০,০০০ ---	পূর্বে পঞ্চখণ্ড পর্যন্ত প্রতাপগড়ের সীমা ছিল।
বাণিয়াচঙ্গ	১,৬৭২,০৮০ ---	বর্তমানে বহুখণ্ডে বিভক্ত।

বাজুয়া বা বাহুয়া সহর	৮০৪,০৮০ —	বর্তমানে একটি ক্ষুদ্র মহল।
জয়ন্তীয়া	২৭,২০০ —	এর অংশবিশেষ মোগল সম্রাটের করদরূপে গণ্য হয়ে থাকবে।
হাবিলি সিলেট	২,২৯০,৭১৭ —	বর্তমান শ্রীহট্ট সহরাদি নিয়ে গঠিত।
সতর খণ্ডল (সরাইল)	৩৯০,৪৭২ —	কৈলাসচন্দ্র সিংহ ত্রিপুরার ইতিহাসে লিখেছেন সরাইলেব অধিকারী "দেওয়ানগণ তাঁহাদের রাজস্ব শ্রীহট্টের আমিলের নিকট প্রেরণ করিতেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবেব শাসনকালে সবাইল-সতর খণ্ডল শ্রীহট্ট হইতে খারিজ হইয়া ঢাকা নেয়ামতের নেজামত সেরেস্তাভুক্ত হয়।"
লাউড়	২৪৬,২০২ —	বর্তমানে একটি পবগণামাত্র।
হরিনগর	১০১.৮৫৭ —	ঐ

দাম আধুনিক ডবল পয়সার ন্যায় একটি তাম্রমুদ্রা। আট দামড়ীতে এক দাম এবং চল্লিশ দামে এক শেরশাহী টাকা হত। আকবরের রাজস্বমন্ত্রী রাজা তোডরমল্লের "ওয়াসিল তোমার জমা" নামক রাজস্ব বিবরণে এই হিসাব দেওয়া হয়েছে। এতে শ্রীহট্টের রাজস্ব মোট ১৬৭,০৪০. টাকা ধার্য হয়।

১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলিখাঁর "জমা কামালে তোমাবি" নামক পাকা হিসাবে রাজস্ব বর্ধিত হয়ে ৫৩১,৪৫৫. টাকায় দাঁড়ায় এবং মহালের সংখ্যা হয় ১৪৮। এই মহালগুলিই পরে ভিন্ন ভিন্ন পরগণারূপে আখ্যাত হয়। হান্টার সাহেব ১৮৬টি পরগণার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আরো পাঁচটি পরগণার নাম করেন নি। সব জড়িয়ে পরগণাব সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯১।

পূর্বে রাজস্ব সংগ্রহের এক-একটি কেন্দ্র স্থান ছিল, তা জেলা নামে খ্যাত। উত্তর শ্রীহট্ট সাবডিভিশনে পারকুল, তাজপুর ও জয়ন্তীয়াপুর, এই তিনটি কালেক্টরী বিভাগ। করিমগঞ্জের কালেক্টরী বিভাগ— লাতু। দক্ষিণ শ্রীহট্টে— নয়াখালি, রাজনগর ও হিঙ্গাজিয়া। হবিগঞ্জেব কালেক্টরী বিভাগ— নবিগঞ্জ, লস্করপুর ও শঙ্করপাশা। সুনামগঞ্জের কালেক্টরী বিভাগ— রসুলগঞ্জ।

২. প্রাকৃতিক বিবরণ

পাহাড়

বিচ্ছিন্ন পাহাড় খণ্ডের নাম টিলা।

শ্রীহট্ট জেলার উত্তরে খাসিয়া ও জয়ন্তীয়ার উন্নতশীর্ষ পাহাড় শ্রেণী শ্রীহট্ট সীমা বহির্ভূত হলেও বড় আখিয়া ও পাণ্ডুয়া পরগণা এবং মূলাগোলে ঐ পাহাড়ের অংশবিশেষ এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শ্রীহট্ট জেলার পাহাড়গুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিখ্যাত, এই পাহাড়গুলির মূল দক্ষিণ সীমান্তবর্তী ত্রিপুরা পর্বত শ্রেণীঃ

১. **পলডহরের বা সরসপুরের পাহাড়** — জেলার পূর্ব সীমায় শ্রীহট্ট ও কাছাড়েব মধ্যে অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ মাইল, প্রস্থ কোন কোন স্থলে প্রায় ১৩ মাইল। এর পূর্বে কাছাড় জেলা, পশ্চিমে পলডহর, এগারসতী ও চাপঘাট পরগণা। উচ্চশৃঙ্গ ছত্রচূড় (ছাতাচূড়া)— ২০৩৪ ফিট উঁচু (ত্রিপুরার মহারাজা ছত্রমাণিক্যের নামানুক্রমে)। উচ্চতা ক্রমে হ্রাস পেয়ে বদরপুর পর্যন্ত চলে এসেছে। মধ্যস্থানের নাম সরসপুর, উচ্চতা ১০০০ ফিট।

২. **দু-আলিয়া বা প্রতাপগড়ের পাহাড়**— পলডহরের পাঁচ মাইল মাত্র পশ্চিমে অবস্থিত। প্রতাপগড় পরগণার মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৩০ মাইল দীর্ঘ। সর্বাধিক উচ্চতা ১৫০০ ফিট।

৩. **আদম-আইল বা পাথারিয়ার পাহাড়**— দু-আলিয়া পাহাড়ের অল্প কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। উত্তরে-দক্ষিণে প্রায় ২৮ মাইল দীর্ঘ। পূর্বে প্রতাপগড়, জফরগড় ও রফিনগর পরগণা, পশ্চিমে পাথারিয়া ও শাহবাজপুর। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ৮০০ ফিট। মাধবতীর্থ নামক জলপ্রপাত এখানে অবস্থিত।

৪. **ষাঁড়ের গজ বা লংলার পাহাড়**— আদম আইল পাহাড়ের কয়েক মাইল পশ্চিমে। বৃষের ককুদের ন্যায় আকৃতি। উত্তরে দক্ষিণে প্রায় বারো মাইল দীর্ঘ। পূর্বে পাথারিয়া পরগণা, পশ্চিমে লংলা। উচ্চশৃঙ্গ ষাঁড়ের গজ (১১০০ ফিট)।

৫. **আদমপুরের পাহাড়**— লংলার পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে। উত্তরে-দক্ষিণে প্রায় ২৩ মাইল দীর্ঘ। পূর্বে আদমপুর, ইটা ও পশ্চিমে চৌয়ালিশ। সর্বাধিক উচ্চতা ৫০০ ফিট — ষাঁড়ের গজ থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

৬. **বড়শীযোড়া বা বালিশিরার পাহাড়**— আদমপুর পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে। দৈর্ঘ্য— উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ২২ মাইল। পূর্বে ভানুগাছ ও ছয় চিরি পরগণা, পশ্চিমে বালিশিরা ও চৌয়ালিশ পরগণা। সাধারণ উচ্চতা ১৫০ থেকে ৩০০ ফিট। এই পাহাড়ে অনেক চা বাগান আছে।

৭. **সাতগাঁও ও বিষগাঁয়ের পাহাড়**— বালিশিরার পাহাড় থেকে আট মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৩০ মাইল দীর্ঘ। সর্বাধিক উচ্চতা ৬০০ ফিট। এখানেও অনেক চা বাগান রয়েছে।

৮. **রঘুনন্দন পাহাড়**— জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত, বিষগাঁয়েব পাহাড় থেকে প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমে। উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৮ মাইল দীর্ঘ। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ৭০০ ফিট।

টিলাগুলির মধ্যে সদরের মনাবায়ের টিলা ও করিমগঞ্জের নিকটবর্তী দেউলীর টিলা বিশেষ খ্যাত।

নদী

শ্রীহট্ট জেলার নদীগুলি প্রকৃতপক্ষে উপনদী। প্রধান নদী বরাক বা বরবক্র তাব উপনদীসমূহ নিয়ে এক বৃহৎ জলপ্রবাহ সৃষ্টি করেছে।

বরাক নদী মণিপুবের উত্তরে আঙ্গামীনাগা পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণাভিমুখে মণিপুর দিয়ে প্রায় ১৮০ মাইল প্রবাহিত হযে কাছাড় জেলায় প্রবেশ করে। কাছাড় জেলার পূর্বসীমা পর্যন্ত এ নদী নৌগম্য, এর পরে নয়। কাছাড় জেলা ভেদ করে বদরপুর থেকে সাত মাইল দূরে বরাক দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়েছে। উত্তর শাখা সুরম্যা বা সুরমা নামে খ্যাত এবং দক্ষিণ শাখার নাম কুশিয়াবা বা ববাক।

১। **কুশিয়ারা বা বরাক** ভাঙ্গাবাজারের কাছে মূল বরাক নদী থেকে নির্গত হয়ে স্থানে স্থানে বিভিন্ন নাম ধারণ করে বাহাদুরপুরেব কাছে পুনরায় দুই শাখায় বিভক্ত হযেছে—

(ক) উত্তব বা প্রথম শাখা বিবিয়ানা নাম নিয়ে কালনীর সঙ্গে মিশে ধলেশ্বরী নদীতে পড়ছে।

(খ) দক্ষিণ বা দ্বিতীয় শাখা ববাক নামেই নবিগঞ্জ হবিগঞ্জ হয়ে ঐ ধলেশ্বরীতেই পড়ছে।

কুশিয়ারা বা ববাক নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ মাইল। মূল নদী তীরে — ভাঙ্গাবাজাব, করিমগঞ্জ, ফেঁচুগঞ্জ, বালাগঞ্জ, মনুমুখ প্রভৃতি।

বিবিয়ানা তীরে — শেরপুর, ইনায়েৎগঞ্জ, মারকুলি প্রভৃতি।

দক্ষিণ শাখা (বরাক) তীরে — নবিগঞ্জ, কালিয়ার ভাঙ্গা, হবিগঞ্জ, রত্নপুর, সুজাতপুর, বাজুকা।

২। **সুরমা** — হরুটিকরের কাছে মূল বরাক নদী থেকে বিভক্ত হয়ে উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিমাভিমুখে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত গেছে। এরপর দক্ষিণাভিমুখী হয়ে দিরাই দিয়ে মারকুলির কাছে বিবিয়ানার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এব তীরে— অষ্টগ্রাম, কানাইরঘাট, রামদা, গোলাপগঞ্জ, শ্রীহট্ট' সাহাগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, ছাতক, দুহালিয়া, আমবাড়ি সুনামগঞ্জ, পাথারিয়া দিরাই প্রভৃতি। সুরমার দৈর্ঘ্য দুশো মাইলেরও বেশি।

(ক) কালনী— বিবিয়ানার সঙ্গে সুরমা মিলিত হয়ে কালনী নাম ধারণ করেছে। তীরে— বণভূঞি।

(খ) সুরমার দ্বিতীয় এক শাখা চরণার চর শ্যামার চর হয়ে ময়মনসিংহে প্রবেশ করে আজমীরিগঞ্জের কাছে ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

৩। **ধলেশ্বরী বা ভেড়ামোহানা** মূল নদী নয়। কালনী বিবিয়ানা প্রভৃতিব সংমিশ্রণে আজমীরিগঞ্জ থেকে এক বিশাল জলপ্রবাহ প্রায় ৪৫ মাইল ধাবিত হয়ে পরে মেঘনা নদীতে পরিণত হয়েছে। এই নদী শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলার সীমারূপে প্রবাহিত। তীববর্তী স্থান আজমীরিগঞ্জ, কাকাইলছেও, বিথঙ্গল, মাদনা।

পূর্বোক্ত নদীগুলির প্রধান উপনদীসমূহ ঃ

১। **লঙ্গাই**— ত্রিপুরার জম্পই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তরাভিমুখে কাবিমগঞ্জের তিন মাইল দক্ষিণে (লঙ্গাই স্টেশন) পর্যন্ত এসেছে, তাবপব পশ্চিমাভিমুখে হাকালুকি হাওবেব মধ্য দিয়ে জুড়ী নদীর সঙ্গে একত্রে ফেঁচুগঞ্জেব কাছে কুশিয়ারায পড়েছে। জুড়ী সম্মিলন পর্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৫ মাইল। তীববর্তী স্থান— হাতীখিবা, বৈঠাখাল, চান্দখিবা, পাথাবকান্দি, নিলামবাজার, লাতু, জলডুব প্রভৃতি।

২। **মনু**— ত্রিপুরার সম্খলং পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে উত্তরপশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে মনুমুখে কুশিয়ারাতে মিশেছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মাইল। তীবে— কৈলাসহব, কদমহাটা, মৌলবী বাজাব, আখাইলকুড়া প্রভৃতি। মনুর প্রধান উপনদী ধলাই— এটিরও উৎপত্তি ত্রিপুরার পাহাড়ে।

৩। **খোয়াই বা প্রাচীন ক্ষমা নদী**— ত্রিপুরার পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে হবিগঞ্জের সন্নিকটে বরাক নদীতে পড়েছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ মাইল। তীরে— মুচিকান্দি, গাজীগঞ্জ, লস্করপুর, হবিগঞ্জ প্রভৃতি।

৪। **গোয়াইন**— জয়ন্তীয়া পর্বত থেকে সারি নদী নামে উৎপন্ন হয়ে কুইগাঙ্গ নামে উপনদীর সম্মিলনে গোয়াইন নাম ধরে ও দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে চেঙ্গের খাল নামে ছাতকের উত্তরে সুরমায় পড়েছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ মাইল।

৫। **পিয়াইন**— জয়ন্তীয়া পাহাড়ে উৎপন্ন, ছাতকের উত্তরে সুবমায় পতিত।

৬। **বৌলাই**— খাসিয়া পাহাড় থেকে নির্গত। কংস নদের সঙ্গে মিলে ধনু নাম নিয়ে ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করেছে। যাদুকাটা ও রক্তি এর দুই উপনদী।

৭। **কংস**— গারো পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে বৌলাই-র সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

অন্যতর নদী— উত্তর শ্রীহট্টে— লুবা, বার, কুইগাও ; করিমগঞ্জে— লুলা, শিংলা, কচুগাও ; দক্ষিণ শ্রীহট্টে— জুড়ী, গোপলা ; হবিগঞ্জে— করঙ্গী, সুতাং, কলকলিয়া ; সুনামগঞ্জে— ধামালিয়া, পীনি, মহাসিংহ।

খালের মধ্যে উল্লেখ্য— মৌলবী খাল (সুরমার সঙ্গে কুশিয়ারাকে যুক্ত করেছে), আমিরউদ্দীন খাল (বরাকের সঙ্গে ইটাখলা নদীতে যুক্ত করেছে), নটী খাল (করিমগঞ্জে কুশিয়ারার সঙ্গে লঙ্গাইকে যুক্ত করেছে।)

হাওর

বর্ষার অনতিগভীর জলমগ্ন ভূভাগ— যার অধিকাংশ হেমন্তে শুকিয়ে যায়, তাকে হাওর বলে। হাওরের যে অংশে হেমন্তে জল থাকে সেই গভীর অংশকে বিল বলা যায়। বিলই প্রকৃতপক্ষে হ্রদ। নিচে প্রধান হাওরগুলির নাম ও শ্রীহট্ট সহর থেকে এদের দূরত্ব উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

উত্তর শ্রীহট্টে—

১। জিল্‌কাব হাওর ও ঝিন্‌কার হাওর— ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ইহাকলস পরগণায়।

২। বাড়ুয়া ও হাইল্‌কা হাওর— ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রেঙ্গা পরগণায়।

৩। চাতল ও মৈজল— ১২ মাইল দক্ষিণে গহরপুর পরগণায়।

৪। বড় হাওর— ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গহরপুর পরগণায়।

৫। বানাইয়া হাওর— ২২ মাইল দক্ষিণে দুলালী পরগণায়।

৬। শউলা হাওর— ৬ মাইল পূর্বে বরায়া পরগণায়।

করিমগঞ্জে—

১। শণবিল, এর উত্তরাংশের নাম রাতা বিল— ৪০ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে এগারসতী পরগণায়। প্রবাদ বাক্য 'শণবিল নড়ে চড়ে, রাতায় পরাণে মারে।'

২। হাকালুকি— ২২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পাথারিয়া পরগণায়। পূর্বাংশে বৃহত্তম হাওর।

দক্ষিণ শ্রীহট্টে—

১। হাইল হাওর— ৪৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চৌয়ালিশ পরগণায়।

২। কাওয়া দিঘীর হাওর— ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ইটা ও শমসেরনগর উভয় পরগণায়।

হবিগঞ্জে—

১। মাকাল কান্দি— ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বাণিয়াচঙ্গ পরগণায়।

২। কাগাপাশা ও ঘোলডুবার হাওর— ৩৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বাণিয়াচঙ্গ পরগণায়।

৩। ঘুঙ্গিয়া জুড়ি— ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তরফ ও মান্দার কান্দি পরগণায়।

সুনামগঞ্জে—

১। দেখার হাওর— ৩০ মাইল পশ্চিম-উত্তরে পাগলা পরগণায়।

২। শনির হাওর— ৫০ মাইল পশ্চিম-উত্তরে লাউড় পরগণায়।

৩। জয়ার হাওর— ৩০ মাইল পশ্চিম-উত্তরে লক্ষ্মণশ্রী পরগণায়।

৪। জামাই কাটা, নলুয়া, পরুয়া, মহাই হাওর— ২৫ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে আতুয়াজান পরগণায়।

৫। টেঙ্গুয়ার হাওর— ৫৫ মাইল পশ্চিম-উত্তরে বংশীকুণ্ডা পরগণায়।

৬। টগার হাওর— ৬০ মাইল পশ্চিমে সেলবরষ পরগণায়।

শ্রীহট্টে প্রকৃত হ্রদ না থাকলেও নবিগঞ্জের কাছে 'অমৃতকুণ্ডকে' হ্রদ বলা যায়। এ হ্রদের জল অতি পরিষ্কার।

উৎস ও প্রস্রবণ

লাউড়ের পণা একটি প্রসিদ্ধ ঝরণা। বারুণী যোগে বহু লোক পণাতীর্থে যায়। দিনারপুরের ফুলতলীর প্রস্রবণ ও বারপাড়া পরগণায় ঠাণ্ডাকুয়া নামক উৎস বিশেষ বিখ্যাত। জয়ন্তীয়ার হরিপুরে একটি তপ্তকুণ্ড আছে— কুণ্ডের জল শীতল, কিন্তু জলতলস্থ ভূমি উত্তপ্ত।

প্রপাত

আদম আইল পাহাড়ের বিখ্যাত মাধব প্রপাতে প্রায় একশ হাত উঁচু থেকে জল পড়ে, বৃষ্টির সময় বহুদূর থেকে জলপতনের শব্দ শোনা যায়।

মরুভূমি

লাউড় পরগণায় যাদুকাটা নদীর পাশে কিছু পরিমাণ স্থানে গাছপালা জন্মে না, এ যেন ক্ষুদ্রায়তন মরুভূমি।

৩. কৃষিজাত দ্রব্য

ধান ঃ

শ্রীহট্টের সর্বপ্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান। অনতি উচ্চ ভূমিতে নানা জাতের শালিধান ও আশুধান জন্মে। 'দুমাই' নামে আশুধান দু-মাসে জন্মে থাকে। নিম্নভূমিতে জন্মায় আছরা, বাগদার প্রভৃতি ধান। জলাভূমে আমন কাতারিয়া, আমন বাদাল হয়। জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধানের চারাও বাড়তে থাকে— পনেরো-কুড়ি হাত পর্যন্ত হয়। যে নিম্নভূমিতে হেমন্ত কালেও কিছু কিছু জল থাকে সেখানে শাইল বোব জন্মায়। এ ধান সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জে বেশী হয়।

বিরণী ধান অনতিউচ্চ ভূমিতে জন্মে— এ ধান শুধু পিঠে তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। খৈ খুব ভাল হয়।

ধান ছাড়া সর্ষে, তিসি, মূলাবীজ, তিল, কলাই, মুগ প্রভৃতি রবিশস্যের মধ্যে প্রধান। আখের চাষও মন্দ হয় না। উনিশ শতকের শেষ থেকে পাটের চাষ ক্রমে বাড়ে। তরফ পরগণায় ও অন্যত্র কিছু কিছু তামাকের চাষও হয়।

ফলমূল ঃ

শ্রীহট্টের কমলা অতি বিখ্যাত। জেলায় অনেক কমলার বাগান ছিল। প্রধানতঃ খাসিয়া পাহাড়ে উৎপন্ন হলেও জয়ন্তীয়া, পঞ্চখণ্ড প্রভৃতি স্থানেও কমলার চাষ ছিল।

আনারসের প্রধান উৎপাদন জলডুব ও পঞ্চখণ্ডে।

ভুবি (লটকা), লুকলুকি বা পানিয়ালা, পিঠাকরা প্রভৃতি অনেকটা বন্য ফল। পিঠাকরার গাছবৃক্ষেই "আগর" পাওয়া যায়।

কলার বিভিন্ন জাতের মধ্যে উল্লেখ্য— ডিঙামানিক, কুলপতি বা সবরি, চিনি-চাঁপা, শাইল বা ভুষা ও আঠিয়া।

আম ও কাঁঠাল জেলার সর্বত্র জন্মে। লেবুর মধ্যে পাওয়া যায়— বাতাবী, পানি বা ঝুটা জামির, জাড়া ও জাজি জামির, এলাচি জামির, আদা জামির, চস্নি বা কলম্বক জামির— (শেষের তিনটি অন্নব্যঞ্জনাদি সুগন্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়), সাতকড়া ইত্যাদি।

অন্যান্য ফলের মধ্যে আছে— গোলাপজাম, কালোজাম, জামরুল, আমলকী, বেল, এনবাদাম, পেঁপে, পেয়ারা। তেঁতুল, চালতা, থৈকল, ডেফল, আমড়া ও লেওইর অম্লরসাত্মক।

সুপারি শ্রীহট্টের সর্বত্র পাওয়া যায়— প্রচুর পরিমাণে জন্মে চাপঘাট পরগণায়। তরমুজ ও টেনাবের চাষ হয় জুমে। শসা জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মে, খীরা শীতের সময় মাঠে উৎপন্ন হয়।

শাকসব্জি ঃ

গোলআলু ছাড়া সবজির মধ্যে পাওয়া যায়— কচু, মুখী, বেগুন (লংলার বেগুন সর্বোৎকৃষ্ট), মানকচু, শিম, লাউ, কুমড়া, উচ্ছে, করলা, কাকরোল, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ঢেঁড়শ প্রভৃতি। শাকের মধ্যে নালিশাক, নটে, লাই (লাইসর্ষে)। গন্ধিডাটা, বামকলার থোড় ও করিল (সংস্কৃত করির বা বাঁশের কচি অঙ্কুর), কোনো কোনো স্থানে পাহাড় থেকে সংগৃহীত হয়।

মশলাদি ঃ

তেজপাতা, পান, লঙ্কা প্রচুর হয় (গোলমরিচ হয় না)। আদা, হলুদ, ধনে, পাটনাই জিরা, পেঁয়াজ, রসুন সর্বত্র জন্মে। জয়ন্তীয়ায় রসুন জাতীয় ক্ষুদ্রাকৃতি 'ঝলাঙ্' উৎপন্ন হয়— এর গন্ধ পেঁয়াজ ও রসুনের তুলনায় মৃদু।

ঔষধাদিঃ

শ্রীহট্টের বনে পাহাড়ে হরিতকী, চালমুগরার গোটা, মুসব্বর সুলভ। শ্রীহট্টের বংশলোচন বা বাঁশের চূণ প্রসিদ্ধ।

সাধারণ লোকে ওষুধরূপে ব্যবহার করে চিরতা, জামালগোটা, বেলশুট, ওলটকম্বলের ডাঁটা, কাষ্ঠবরুজ, গুলঞ্চ, আমছাল, নিমছাল, অশোকছাল।

ফুলঃ

বড়গাছ— চাঁপা, বকুল, কদম, কাঞ্চন, অশোক,

ছোটগাছ— শেফালি, করবী, কামিনী, স্থলপদ্ম,

চারা জাতীয়— টগর, গন্ধরাজ, জবা, গাঁদা,

গুল্ম জাতীয়— গোলাপ, সেউতি (শ্বেতগোলাপ), জুঁই, জাতি, বেলি, চামেলী, কুন্দ, কেতকী, রঙ্গন,

লতাজাতীয়— মাধবী, বনমালতী, ঝুমকা,

কন্দজাতীয়— সর্বজয়া, ভূঁইচাঁপা, রজনীগন্ধা,

জলজ পুষ্পের মধ্যে শ্বেত ও রক্তপদ্ম এবং শ্বেত ও রক্ত কুমুদ (সাপলা) প্রধান।

আয়কর ফুলের মধ্যে, মণিপুরীরা কুসুম ফুলের চাষ করে থাকে। কুসুমের বীজে তেল হয় ও ফুলে গোলাপি রং হয়। কুসুমের তেল ওষুধে ব্যবহার্য।

বৃক্ষাদিঃ

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে দেখা যায়, শ্রীহট্ট থেকে প্রচুর কাঠ চালান হতো। বর্তমান কালেও জঙ্গলগুলি সরকারের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রতাপগড় পরগণায় ১০৩ বর্গমাইল রিজার্ভ ফরেষ্ট ছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে, জয়ন্তীয়া প্রভৃতি স্থানে, ১৭৭ বর্গমাইল 'আনক্লাসড় ফরেষ্ট' ছিল।

বিবিধ কাজে নিম্নোক্ত কাঠগুলির ব্যাপক প্রয়োগ ছিল— চাম ও আম (বন্য), রাতা ও কুর্তা, পীং ও পোংতা, শিমইল ও জাবইল, গন্ধরই ও সুতরং, পুমা ও তুলা, কদম ও ফরিস, কাওয়াঠোটি ও কাই মূলা, সুন্দি ও বনাক প্রভৃতি। এছাড়া ছিল নাগকেশর ও গাম্বারি, কাঁঠাল ও পালান।

জারইল বৃক্ষ [illegible] বনে উৎপন্ন হয়, এ গাছের গোলাপি রঙের ফুল অতি সুশোভন। জারইল পুমা প্রভৃতিতে নৌকা প্রস্তুত হয়। চাম, কাঁঠাল, সুন্দি, গন্ধরই প্রভৃতিতে উৎকৃষ্ট তক্তা হয়। বনাক গাম্বারি প্রভৃতি গাছের তক্তাও উৎকৃষ্ট।

সুতরং, তুলা প্রভৃতিতে একদা চায়ের বাক্স প্রস্তুত হত। কাঁঠাল, কাইমূলা, কাওয়া ঠোঁটি, কুর্তা প্রভৃতিতে ঘরের খুঁটি হয়। পুমা ও পালানের কাঠ হালকা বলে চেয়ার, দোলা ও খেলনা প্রভৃতি তৈরি হয়। নাগকেশরের সুগন্ধি পুষ্প থেকে একরূপ আতর ও ফল থেকে তেল হয়। এর কাঠ দৃঢ় বলে দালানের কড়ি বরগায় ব্যবহৃত হত।

পাহাড়ে রবার গাছও আছে। উদাল গাছের বাকল দিয়ে শক্ত দড়ি তৈরি হয়। কাইমুলার নির্যাস যেমন আঠার কাজ করে তেমনি মহাল গাছের নির্যাস থেকে ধুনা হয়। বলওয়া ও বনচালতা গাছের পাতা শুকিয়ে এক সময় কাঠ পালিশ করার রীতি ছিল। 'ছাতাপাতি' কন্দজাতীয় উদ্ভিদের পাতা, এ দিয়ে ছাতা বানায়। 'আনরকলি' সুবৃহৎ পাতা-বিশিষ্ট উদ্ভিদ, পাহাড়ে জন্মে ; এত বড় পাতা যে একজন মানুষ এতে শুতে পারে।

বাঁশের মধ্যে মুলি, খাং, ডলু, জাই, বরুয়া, পেঁচা, বাঁশকাল, মৃত্তিঙ্গা প্রভৃতি নানা জাতীয় বাঁশ আছে।

গল্লা, জালি ও সুন্দি— তিন জাতীয় বেতের মধ্যে গল্লা বৃহৎ জাতীয় এবং সুন্দি ক্ষুদ্র জাতীয়। উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম কাজে লাগে সুন্দি বেত।

বড়লুথা ছন ও উলু ছন চাল ছাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। বড়লুথা পাহাড়ে জন্মায়। যে স্থানে ছন উৎপন্ন হয় তাকে 'ছনের খলা' বলা হয়।

নল ও মূর্তা পাহাড়ের পঙ্কিল স্থানে জন্মে থাকে। নল চিরে চাটাই ও মূর্তার বেত দিয়ে উৎকৃষ্ট পাটি প্রস্তুত হয়।

সুনামগঞ্জের হাওরগুলির মধ্যে ও হবিগঞ্জের অনেক স্থানে পাঁকের নিচে এক প্রকাব অদ্ভুত উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়—এর নাম 'কচম' গাছ। জলের তলায় পাঁকের নিচে অবক্র স্থূলাঙ্গ লতার মতো এটি দীর্ঘভাবে বেড়ে ওঠে—এক একটি সাধারণতঃ ১২|১৪ হাত লম্বা ও ৩|৪ হাত বেড় বিশিষ্ট হয়। কাঠের বর্ণ হরিদ্রাভ লোহিত। একবার শুকিয়ে গেলে কচম কাঠে জল প্রবেশ করতে পারে না।

জুম চাষঃ

খাসিয়া কুকি নাগা কাছাড়ী প্রভৃতি পার্বত্যজাতীয় লোকেরা টিলার উপর জুম আবাদ করে। এক এক পুঞ্জি বা পাড়ার লোক একত্রে জুমের জন্য কাজ কবে থাকে। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে জঙ্গল কেটে ফেলে, ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে ফেলে, বৈশাখ মাসে বীজ রোপণ করে। 'টাকল' নামক দা দিয়ে ছোট ছোট গর্ত করে তাতে ধান ভুট্টা কার্পাস তিল লঙ্কা-মরিচ তরমুজ চিনার প্রভৃতির বীজ একসঙ্গে রোপণ করা হয়। থাবা নামক বেতের দীর্ঘাকাব চাঙ্গারিতে ঐ সমস্ত বীজ একত্রে মিশ্রিত থাকে।

চা ঃ

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে আসামে সর্বপ্রথম বন্য চা গাছ পাওয়া যায়। প্রথম চা-বাগান প্রস্তুত হয় লক্ষ্মীপুরে, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীহট্টের জঙ্গলে স্বভাবজাত চা-বৃক্ষের সন্ধান পাওয়া যায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'নর্থ সিলেট টি কোম্পানি' স্থাপিত হওয়ার পর মালনীছড়ায় একটি চা ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীহট্ট জেলায় ১৫৪টি চা-বাগানের মধ্যে দেশীয়দের বাগান ছিল মাত্র ১৬টি। রাজা গিরিশচন্দ্রের বিদ্যানগর চা-বাগান বিখ্যাত। দুটি বাগান দেশীয়দের যৌথ মূলধনে পরিচালিত হত—'ইন্দেশ্বর টি অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানীর' উত্তরভাগ চা-বাগান ও 'ভারত সমিতির' কালীনগর চা-বাগান।

শ্রীহট্টের জঙ্গলে চায়ের মতো স্বভাবজাত কফি বৃক্ষও পাওয়া গিয়েছিল।

৪. শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য

বস্ত্র শিল্প ঃ

শ্রীহট্টের বস্ত্র বয়ন শিল্প অবহেলনীয় ছিল না, কিন্তু আজ তা অতীতের বস্তুমাত্র। লস্করপুরের উর্নি চাদর ঢাকাই চাদরের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল না, প্রতি চাদরের মূল্য ছিল ১৸০. থেকে ৪. পর্যন্ত। লস্করপুর-ছিলিম নগরের তন্তুবায়েদের প্রস্তুত একজোড়া ভাল ধুতির দাম ছিল ১০. ও শাড়ির দাম ছিল ১২.। দেশীয় লোকের উৎসাহ না পাওয়ায় গত শতকের শেষ ভাগেই এই গৌরবাত্মক ব্যবসাটি লোপ পাচ্ছিল।

এণ্ডি বস্ত্র—হবিগঞ্জের উত্তর মাছুলিয়া গ্রামের নমঃশূদ্র জাতীয় লোকেরা গত শতাব্দীর শেষ ভাগেও গুটি পোকা পুষে এক জাতীয় মোটা এণ্ডির চাদর প্রস্তুত করতো। এণ্ডি রেশম সুতার ধুতি মুগার ধুতি নামে কথিত হত। জয়ন্তীয়াতেও এণ্ডি তৈরি হত। দেশীয় লোকের অবহেলা ও অনাদরে এ শিল্প বিলুপ্ত।

মণিপুরী খেস—সদর, প্রতাপগড় ও ভানুগাছ প্রভৃতি স্থানের মণিপুরীরা উৎকৃষ্ট খেস ও পাতলা মশারি প্রস্তুত করতো—খেসের মূল্য ছিল ১. থেকে ৫|৭ টাকা। লাইচাংফির মূল্য হত ৪|৫ টাকা।

যুগীয়ানা গিলাপ—যুগীয়ানা কাপড় এক সময়ে এ জেলায় সকলেই সাদরে ব্যবহার করতো। যুগীদের প্রস্তুত কাপড়ের মধ্যে 'গিলাপ' বা জোড়া চাদর শীত নিবারণোপযোগী। গিলাপের থান ২২|২৪ হাত দীর্ঘ ও ১$\frac{১}{২}$ হাত প্রস্থ বিশিষ্ট। সুতরাং মধ্যে সেলাই করে ৬ হাত লম্বা জোড়া চাদর তৈরি করে ব্যবহার করতে হয়। গিলাপের দাম ছিল পাঁচসিকা থেকে তিন টাকা পর্যন্ত।

মাছ ধরা জাল ঃ মৎস্য শিকারের জন্য শনসূত্রের দ্বারা নানারূপ জাল প্রস্তুত করা হয়।

মহাজাল— একাধিক নৌকা সাহায্যে বহুস্থান ব্যাপ্ত করে এককালে বহু সংখ্যক মাছ ধরা যায়। দাম একশ টাকার মতো ছিল।

বড় জাল বা গলুকা জাল— ৭০ হাত দীর্ঘ ও ৬ হাতের কম পরিসর যুক্ত হয় না। জালের উপর বাঁশের টুকরো বাঁধা থাকায় জালের উপরিভাগ ভেসে থাকে।

ঝাঁকি জাল—প্রান্ত ভাগে সীসার খণ্ড বাঁধা থাকে। জাল হাতে নিলে সঙ্কুচিত থাকে—ছুঁড়ে জলে ফেললে বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

হুরা জাল— এটি লম্বা হয়। দুই প্রান্তে দুজন টেনে ধরে মাছ শিকার করে।

খেত জাল— চতুষ্কোণ বিশিষ্ট।+ আকৃতির বাঁশের দণ্ডে জালের চার কোণা বেঁধে জলে ডুবিয়ে রাখে ও দড়ির সাহায্যে ক্ষণে ক্ষণে টেনে তোলে।

হেফা জাল— ত্রিকোণাকার। ইংরাজী Y (ওয়াই) আকৃতির বাঁশের দণ্ডে তিন প্রান্ত বেঁধে নৌকায় বসে মাছ ধরে। আকৃতিতে ক্ষুদ্রতর হলে ছাট জাল বলে এবং তার চেয়েও ছোট হলে বলে পেলুইন।

এ ছাড়া উথাল, সঙ্গা, কাত্তি প্রভৃতি নামে আরো ক-ধরনের জাল আছে।

বাঘ শিকারের জন্যও দড়ির জাল ব্যবহৃত হয়—এটি অনেকটি হুরা জালের মত। শূকরাদি প্রাণী ও পাখি শিকারের জাল অপেক্ষাকৃত ছোট।

কাষ্ঠ শিল্পঃ নদী ও হাওরেব দেশ শ্রীহট্টে নৌকার প্রাচুর্য অস্বাভাবিক নয়; ভালো কাঠ পাওয়া যায় বলে বৃহৎ নৌকাও তৈবি হত। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ লিণ্ডসে ৪০০ টন ওজনের বিরাট এক তরী প্রস্তুত করান। এব তলাব অংশ ছিল সতেরো ফিট। মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষের সময় মিঃ লিণ্ডসে ধান বোঝাই কুড়িটি নৌকাব এক বহর সেখানে পাঠিয়েছিলেন। ইতিহাসে পাই মোগল আমলে লাউড়ের রাজাকে রাজস্বেব বদলে সমবতরী যোগাতে হত। হবিগঞ্জের ‘পলওয়ার’ নৌকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাণ্ডুয়ার ‘বারকী’ নৌকা অল্প জলে চলাব পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও অভিনব আকৃতি বিশিষ্ট।

চাপঘাট, লংলা, রাজনগর ও লস্করপুরে একদা উৎকৃষ্ট পালকী প্রস্তুত হত। ঢাকা দক্ষিণে কাঠের ‘খাঞ্চা’ (থালা) ও চাড়ী ও লাউড়েব হুঁকার নল বিখ্যাত।

বাঁশ ও বেত শিল্পঃ এই শিল্পের মধ্যে শীতলপাটি সর্বপ্রধান। মূর্তা নামক একজাতীয় গুল্মের বেত দিয়ে তৈরি শীতল পাটির খ্যাতি ভারতব্যাপী। মূল্য ছিল গুণানুসারে আট আনা থেকে দশ টাকা পর্যন্ত। ২০|২১ হাত দীর্ঘ পাটিকে ‘সপ’ বলে থাকে। ইটা ও চৌয়ালিশ পরগণাতে সর্বোৎকৃষ্ট শীতল পাটি প্রস্তুত হয়। পাটি প্রস্তুতকারকগণ ‘পাটিয়ারা দাস’ নামে আখ্যাত।

নল নামক গুল্ম দিয়ে চাটাই তৈরি হয়। চাপঘাট ও তরফ পরগণার বাঁশের ছিলকা দিয়ে ‘নেউলি’ প্রস্তুত হত। শীতল পাটির অনুরূপ এবং [illegible]তর নেউলি দিয়ে তৈরি হত ভাল ঘরের বেড়া—কিন্তু এর ব্যবহার ক্রমশঃ কমে যায়।

চাঁচ বা ধারা (দরমা) দূরবর্তী স্থানে রপ্তানী হত। সদরের বেতের তৈরি পেটারা, বাক্স, মোড়া এবং বাঁশের চেয়ার ও ইজিচেয়ার ইয়োরোপীয়ানদের দ্বারা বিশেষ আদৃত হয়েছিল। সদরের শেখঘাট ছাপরবন্দ পাড়ার কারিগরদের তৈরি বাঁশ বেতের একটি ছোট ঘর ১৮৮৩ খৃঃ ইংলণ্ডের প্রদর্শনীতে প্রেরিত হয়ে পারিতোষিক পায়।

পর্ণ ও তৃণ শিল্পঃ বাঁশ বেতের ফ্রেমে "ছাতা পাতি" রেখে যে ছাতা তৈরি হত তার দাম ছিল তিন আনা থেকে সাত আনা। কৃষকদের মাথায় বাঁধার ছোট ছাতার দাম তিন পয়সা থেকে পাঁচ পয়সা।

ধাতব শিল্পঃ—তৈজসপত্রাদির মধ্যে শ্রীহট্ট জিন্দাবাজারের প্রস্তুত পিতলের ঘটি, ব্রহ্মচালের পিতলের বাসন ও কাঁসার বাটি ও করতাল, শ্রীহট্ট, ব্রহ্মচাল, বদরপুর, মাধবপুর, আখাইলকুরা ও শ্রীমঙ্গলের পিতল ও ভরতকাঁসার বাসন বেশ উৎকৃষ্ট ছিল। ইটার পাচগাঁও রাজনগরের লৌহদ্রব্য অতি উৎকৃষ্ট। বিখ্যাত জাহানকোষা তোপ (দৈর্ঘ্য বারো হাত, পরিধি তিন হাত, মুখের বেড় দেড় হাত) পাঁচগার জনার্দন কর্মকাব কর্তৃক ১০৪৭ হিঃ সনে নির্মিত হয়—কামান সংলগ্ন পিত্তল-ফলক পাঠে তা জানা যায়। জনার্দনের বংশ জনাইর গোষ্ঠী নামে আজো খ্যাত। লস্করপুরের সোনা-রূপার গিল্‌টির কাজ অতি চমৎকার কাজ ও প্রসিদ্ধ।

মৃৎশিল্পঃ হিন্দু কুমার জাতিরা এবং খুসকী নামক মুসলমানেরা মাটির বাসন প্রস্তুত করে। মটকা ও কাছলী অতি বৃহৎ পাত্র। বেজোড়া পরগণার বেঙ্গাডুবা গ্রামে পাক কার্যেব উপযোগী সুদৃঢ় পাতিল তৈরি হয়।

প্রস্তর শিল্পঃ পুরাকালে শ্রীহট্টে প্রস্তর শিল্পের উৎকর্ষের কিছু নিদর্শন রয়েছে ঊনকোটিব মূর্তিতে ও প্রতাপগড়ের রাজবাটিতে প্রাপ্ত প্রস্তর চিত্রে।

হস্তীদন্ত শিল্পঃ হাতীর দাঁতের বেত চুলের মত চিকণ করে তা দিয়ে পাটি প্রস্তুত কবা হয়। এ দিয়ে সুন্দর পাখাও তৈরি হয়—এ রকম একটি পাখা কলকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। হস্তী দন্তের কারিগরকে খণ্ডিকর বলে।

বিলুপ্ত চর্মশিল্পঃ রিয়াজ-উস্-সালাতিন গ্রন্থে লিখিত আছে, উৎকৃষ্ট ঢালের জন্য শ্রীহট্ট সমস্ত হিন্দুস্থানে বিখ্যাত। শ্রীহট্ট শহরের লামা বাজারের পশ্চিমে ঢালকর পাড়া মহল্লায় পূর্বে ঢাল প্রস্তুত হয়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র রপ্তানি হত।

গন্ধ ও খাদ্য শিল্পঃ পাথারিয়া পরগণায় আগর কাঠ থেকে উৎকৃষ্ট আতব প্রস্তুত হয়। পিঠাকরা নামক এক জাতীয় বৃক্ষের সার কাঠ চূর্ণ করে তা চুইয়ে আতর তৈবি কবে। আতর প্রস্তুত হয়ে গেলে আগরচূর্ণে মন্ড মিশিয়ে 'ধূপ' প্রস্তুত করা হয়। নাগকেশব ফুল থেকেও এক প্রকার আতর প্রস্তুত হয়।

খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে তরফের লালি গুড়, পাথারকান্দির মণিপুরীদের তৈরি চিড়া ও ছাতকের কমলা মধু বিশিষ্ট।

লাক্ষা শিল্প: কুশিয়ার কুল, ভাটেরা, বরমচাল, লংলা, ইন্দেশ্বর, কাণিহাটি প্রভৃতি স্থানে বটগাছে লা-পোকা (পিপীলিকা বিশেষ) ধরান হয়। পোকাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখায় আঠার মত পদার্থ প্রস্তুত করে, এর রং লাল। শাখা কেটে লা সংগৃহীত হয় এর নাম 'লার ঝুড়ি'। লার কাজ যারা করে তাদের 'লাহারি' বলে। লস্করপুরের লার চুড়ি মুসলমান রমণীদের প্রিয়। লা (=গালা)।

খনিজ দ্রব্য—

চূণ—মোগল রাজত্বের সময়েও শ্রীহট্টে চূণের ব্যবসা চলতো। ছাতকের নিকটবর্তী উতম ও ব্রহ্ম পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে চূণা পাথর পাওয়া যায়। জয়ন্তীয়ার জাফলং পাহাড়েও চূণা পাথর আছে। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে রেসিডেন্ট (কালেকটর) লিণ্ডসে সাহেব চূণের কারবার করেন। এরপর 'ইংলিশ কোম্পানী' বহুকাল ছাতকে চূণের কারবার করেছিলেন। ১৯০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট থেকে প্রায় ২০ লক্ষ মণ চূণ রপ্তানি হয়।

মেটে তেল—শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের মধ্যস্থ ঝালনা ছড়ায় পাওয়া যায়।

কয়লা—জয়ন্তীয়া ও লংলার পাহাড়ে কয়লা আছে।

লবণ—পূর্বে দেশীয় লবণই লোকে ব্যবহার করতো। লবণের খনিকে এদেশে 'খুলি' বলা হয়। নবাবী আমলে খুলির লবণাক্ত জল (দেখতে অনেকটা কর্দমময়) জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরি হত। এই লবণের স্বাদ ঈষৎ কষায়। লঙ্গাই ও শিংলা উজানের পাহাড়ে লবণের খুলি আছে। দু-আলিয়া পাহাড়ের নুন্টাছড়ার উৎপত্তিস্থলে লবণের খুলি থাকায় এর জল লবণাক্ত ছিল। আদম আইল পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে দাস গ্রামের কাছে লবণের এক বৃহৎ খুলি ছিল—আঠারো শতকের প্রথম ভাগে ঐ খুলি পাথর চাপা দিয়ে নষ্ট করা হয়।

শুক্তি ও মুক্তা—ঘুঙ্গিয়া জুড়ির হাওরে উৎকৃষ্ট শুক্তি মিলে। তরফের করঙ্গী নামক ক্ষুদ্র নদীর ঝিনুক থেকে একদা মুক্তা পাওয়া যেত বলে কথিত হয়।

৫. বাণিজ্য

শ্রীহট্টের বাণিজ্য নিতান্ত অবহেলনীয় ছিল না। শ্রীহট্ট (কাজির বাজার ও বন্দর বাজার), বালাগঞ্জ, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নবিগঞ্জ, সমশেরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, আজমীরিগঞ্জ ও বাণিয়াচঙ্গ—নদী তীরবর্তী এই গঞ্জগুলি ছিল প্রধান বাণিজ্য স্থান। ঢাকার নারায়ণগঞ্জ বন্দর থেকে 'ইণ্ডিয়ান জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর' একটি জাহাজ শ্রীহট্ট জেলার মাদনা, বিথঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, মারকুলি, ইনায়েতগঞ্জ, শেরপুর, মনুমুখ, বালাগঞ্জ, ফেঁচুগঞ্জ, নায়েবঘাট, বৈরাগীবাজার, সেওলা, লক্ষ্মীবাজার, করিমগঞ্জ, ভাঙ্গাবাজার বদরপুর হয়ে শিলচর পর্যন্ত যেত। এই স্টিমারের পথ ছিল যথাক্রমে পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, কালনী—বিবিয়ানা ও কুশিয়ারা-বরাক।

উক্ত কোম্পানীর আর একখানা স্টিমার পূর্বোক্ত পথে মারকুলি পর্যন্ত এসে ভিন্ন পথে দিরাই, পাসাইয়া কলস, সুনামগঞ্জ, দোয়ারাবাজার, হবিপুর, ছাতক, কলারুকা, গোবিন্দপুর, লামা কাজির বাজার, বাইয়ার মুখ হয়ে পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, কালনি—বিবিয়ানা ও সুরমার পথে শ্রীহট্ট শহরে পৌঁছাত। ফেঁচুগঞ্জ স্টেশন এই পথে কোম্পানীর বৃহত্তম স্টেশন ছিল, এখানে স্টিমার সাবাবার একটি ছোট কারখানাও ছিল।

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের কাজ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়ে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। প্রথমতঃ শিলচর পর্যন্ত গাড়ী চলেছিল। এই পথে শ্রীহট্ট জেলার স্টেশন ছিল—মনতলা, ইটাখলা, সাহজীবাজার, শায়েস্তাগঞ্জ, দারাগাও, রসিদপুর, সাতগাও, শ্রীমঙ্গল, আলীনগর, শমসেরনগর, টিলাগাও, কুলাউড়া, জুড়ী, দক্ষিণভাগ, বড়লিখা, লাতু, লঙ্গাই, করিমগঞ্জ, চরগোলা, ভাঙ্গা ও বদরপুর।

ফেঁচুগঞ্জ থেকে শ্রীহট্ট শহর পর্যন্ত ঘোড়ার গাড়ী চলাচল করতো।

প্রাচীনকালের সড়কগুলির মধ্যে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ভগ্নাবশেষ দেখা গেছে এগুলির—প্রতাপগড় পরগণায় পিঠাখাউরীর জাঙ্গাল, ঢাকা দক্ষিণে দেওয়ানের শড়ক, লংলায় রাজশড়ক। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট থেকে কাছাড় পর্যন্ত ৮২ মাইল দীর্ঘ একটি পথ ছিল। শ্রীহট্ট-ছাতক রাস্তা আরম্ভ হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে।

(কুলাউড়া—শ্রীহট্ট, শায়েস্তাগঞ্জ—হবিগঞ্জ, শায়েস্তাগঞ্জ—বাল্লা প্রভৃতি রেল সংযোগ অনেক পরে হয়েছে।)

শ্রীহট্ট থেকে শিলং যাবার পথ (৭২ মাইল) ছিল বিশেষত্বপূর্ণ। শ্রীহট্ট শহর থেকে স্থল পথে হেঁটে বা নৌকাযোগে ছাতক হয়ে কোম্পানীগঞ্জ, সেখান থেকে থারিয়া ঘাট যেতে হয়। থারিয়াঘাট থেকে উঁচু পথের শুরু। অনেকে থাবা আরোহণে শিলং যেতেন। মনুষ্য বহনোপযোগী থাবা বাঁশের একরূপ মোড়া বা চেয়ার। খাসিয়ারা থাবা সংলগ্ন দড়ি মাথায় দিয়ে থাবা পিঠে নেয়। চেরাপুঞ্জী, চেরাডিম, ডম্পেপ, মালিম অতিক্রম করে শিলং পৌঁছানো যেত।

আমদানী—রপ্তানিঃ

শ্রীহট্ট জেলায় প্রতি বছর আমদানীর তালিকায় ছিল—লবণ, তেল, ডাল, ঔষধ, চিনি, মিছরি, ময়দা, কাপড়, কাগজ, দেশলাই, জুতা, লোহার কড়াই, মদ-গাঁজা-আফিম, চীনামাটির বাসন, এনামেলের বাসন, পিতল ও কাঁসার বাসন, সুপারি, নারকেল, এলাচ, লবঙ্গ, পেঁয়াজ, তামাক, মৌরী, করোগেটেড আয়রণ, আলকাতরা, সিমেন্ট প্রভৃতি।

রপ্তানির মধ্যে প্রধানতঃ—চাল ও ধান, চা, তিসি, সর্ষে, কমলা ও কমলামধু, মধু, মোম, লা, আগরকাঠ ও আতর, তেজপাতা, লঙ্কা, কার্পাস, চামড়া, চূণ, ঘি, পুরানো ঘি, শীতলপাটি সপ, খড়্গ, বাঁশ, বেত, ছন, কাঠ, চাঁচ, পাতার ছাতি, শুকনো মাছ, আলু প্রভৃতি। এছাড়া রপ্তানী হতো হাতীর দাঁত, মহিষের সিং, হরিণের শিং। সর্ষের তেলও বাইরে যেত।

ওষুধের মধ্যে ছিল দারচিনি, চালমুগরার তেল, বংশলোচন। ছাপরা জেলার হরিহর ছত্রের মেলায় শ্রীহট্টের হাতী বিক্রয় হতো।

ঢাকা—কলকাতার সঙ্গে পরোক্ষভাবে এবং খাসিয়া পাহাড়, পার্বত্য ত্রিপুরা ও কাছাড়ের সঙ্গে বাণিজ্য চলতো প্রত্যক্ষভাবে।

৬. ইতর প্রাণী

পশু ঃ

আরণ্য জন্তুর মধ্যে সর্বাগ্রে হাতীর কথা বলা কর্তব্য। হাতীরা দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে। প্রতিদলে চরাল কুন্‌কী নামে একটি বৃহৎ হস্তিনী এবং গুণ্ডা নামে একটি দাঁতাল হাতী থাকে। এরা দলপতি স্বরূপ। স্থানান্তরে যেতে চরাল কুন্‌কী সর্বাগ্রে এবং গুণ্ডা সর্বপশ্চাতে থাকে। সাধারণতঃ হস্তিনীদের কুন্‌কী বলা হয়। দন্তহীন হাতীর নাম মাক্‌না। মধ্যে মধ্যে যূথভ্রষ্ট হাতীও পাওয়া যায়। গুণ্ডার দল নির্ভীক।

বর্ষাকালে হস্তীযূথ দুর্গম উচ্চতর পর্বতে চলে যায়, শীতে প্রত্যাগমন করে। বন থেকে বনান্তরে যাবার সময় পথাবরোধক বৃক্ষ শাখা ভেঙ্গে লতা ছিন্ন করে সুন্দর পথ প্রস্তুত করে, একে বলে 'দোয়াল'। বন-কামলাদের প্রধান রাস্তা দোয়াল।

বন্য হাতীরা 'এক পদক্ষেপে' যায় অর্থাৎ অগ্রবর্তিণী চরাল কুন্‌কীর পদচিহ্নের পর পদবিক্ষেপ করে দলের তাবৎ হাতী চলে যায়; পদচিহ্ন দেখে পথে মাত্র একটি হাতী গেছে বলে বোধ হয়।

তিন উপায়ে হাতী ধরা হয়—খেদা, ফাঁস ও পরতালা। যে সকল স্থানে হাতী প্রায়শঃ ধরা পড়ে সে স্থানকে বলে রমনা। শ্রীহট্ট জেলায় ছয়টি রমনা প্রসিদ্ধ—শিংলা, লঙ্গাই লাউড, ভানুগাছ, মূলাগোল, তারাপুর।

খেদার প্রধান কার্যকারকের নাম পাঞ্জালীরা। পাঞ্জালীরা প্রথমতঃ জঙ্গলে গিয়ে হাতীর সন্ধান করে; পদচিহ্ন পরীক্ষায় তাদের গতি ও আনুমানিক সংখ্যা নির্দেশ করে। সুবিধাজনক স্থানে হস্তীযূথকে পেলে অপর লোকের সাহায্যে ঘেরাও করে নেয়। এই লোকদের বলে 'গড়ওয়া'। প্রতি খেদায় পাঞ্জালী সংখ্যা অন্যূন ১৬ জন এবং গড়ওয়া সংখ্যা ৩০০ জন হওয়া চাই।

বেষ্টন করার পর সকলে একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে, এতে হাতীর দল ভীত হয়ে এক জায়গায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। এই অবকাশে পাঞ্জালীরা কয়েক হাত অন্তরে অন্তরে দুই দুই জন লোক পাহারার কাজে রেখে দেয়। দু-জনের একজন কাছের গাছ কেটে পাঞ্জালীদের নির্দেশানুসারে হাতীর গমনপথের মুখে সুবৃহৎ "খোঁয়াড়" প্রস্তুত করতে থাকে। যারা প্রহরায় থাকে তাদের সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলে।

এই খোঁয়াড়ের বহির্ভাগে বৃক্ষের ঠেকান দেওয়া হয়, যেন ভিতর থেকে ঠেলে ধরলে কোনো অনিষ্ট না ঘটে। খোঁয়াড়ের নাম 'গড়'।

যখন যে জায়গায় হাতীর দলকে ঘেরাও করে আগুন জ্বেলে আবদ্ধ রাখা হয়, তার নাম 'পাতবেড়'। পাতবেড়ের মধ্যে গড় বাঁধা হয়। গড়ের মধ্যে একটি ছড়া থাকা চাই—হাতীরা আবশ্যকমত তার জল পান করবে। পাতবেড়ের পিছনে দিকে অর্থাৎ হাতী যে দিকে থাকে, সেদিকে গড়ের মুখ রাখা হয়। মুখ থেকে দুদিকে দুটি বাহু বিস্তৃত করা হয়, এর নাম 'পাইরালা'। গড়ের মুখ আবশ্যক মত বন্ধ করার জন্য বড় বড় বৃক্ষ নির্মিত দুয়ার কৌশলেক্রমে রক্ষা করা হয়। পাইরালার সামনে এবং দরজার কাছেও শুকনো বাঁশপাতা প্রভৃতি রেখে দেয়। এ ছাড়া গড়ের ভিতরে ৭|৮ হাত বিস্তার ও প্রায় দুই হাত গভীর এক পরিখা (খাল) খনন করা হয়।

গড় বাঁধার কাজ শেষ হলে, যথা নির্দিষ্ট সময়ে পাতবেড়ের পিছন দিক থেকে চিৎকার ধ্বনি, বন্দুকের আওয়াজ ও ঢাকের শব্দে তুমুল কোলাহল করে হাতীর দলকে বিতাড়িত করে। সামনের দিক নিরাপদ ভেবে ওরা গড়ের দিকে বিদ্যুৎ গতিতে ধাবিত হয়। সমস্ত হাতী পাইরালার সীমায় যাওয়া মাত্রই তাদের পিছনে পূর্ববক্ষিত শুকনো পাতায় আগুন দেওয়া হয়। আগুন দেখে অধিকতর ভীত হয়ে তারা গড়ে প্রবেশ করে। দলের শেষ হাতীটি দুয়ারের সীমা পার হওয়া মাত্র সুকৌশলে রক্ষিত কপাট বা বৃক্ষ দ্বারা পথ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এস্থানেও পাতায় আগুন জ্বেলে দেয়।

কোনো কোনো দুরন্ত হাতী পরিখা পার হয়ে গড় ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করে ; তখন বাইরের লোকেরা বল্লম দিয়ে তাকে আঘাত করে। একে বলে 'গড় দাখিল'। হাতীর দল গড়ে আবদ্ধ হলে যত সত্বর সম্ভব একটি শিক্ষিত পোষা কুন্‌কী সুবিধামত গড়ে প্রবেশ করিয়ে তার সহায়তায় অন্য হাতীদের বেঁধে ফেলা হয়।

কিন্তু ফাঁস শিকারে প্রতিবারে একটি হাতীর বেশি ধরা যায় না। একাকী একটি কুন্‌কী হাতী বিচরণ করতে দেখা গেলে মাহুতেরা দুটি শিক্ষিত পোষা কুন্‌কী নিয়ে তার কাছে যায়। পোষা হস্তিনী দুটি বন্যটির কাছাকাছি এসে নিমেষে শুঁড় দিয়ে তার মাথায় ফাস তুলে দেয়। ফাঁস শিকারে মাকনা কি গুণ্ডা হাতী ধরা বিপদজনক।

যূথভ্রষ্ট গুণ্ডা কি মাকনা হাতী মদমত্ত হলে মাহুতেরা চারটি কুন্‌কী তার কাছে নিয়ে যায়। হস্তিনীরা শুঁড় দ্বারা স্পর্শ করে হাতীকে ভুলিয়ে রাখে। মাহুত অতি সতর্কভাবে বন্য হাতীর পায়ে দড়ি বাঁধে। শ্রীহট্টে পরতালা শিকারের প্রথা নেই।

অন্যান্য জন্তুর মধ্যে রয়াল বেঙ্গল, চিতাবাঘ, খুপি বাঘ (wolf), গণ্ডার ও কৃষ্ণ ভল্লুক পাওয়া যায়। মেট্‌না নামক বন্য গো কুকিরা পালন করতো। জয়ন্তীয়ার জঙ্গলে গবয় (বন গরু) আছে। হরিণের মধ্যে 'শিঙ্গাল' ও 'খাট্‌লী বা আমড়াখাউরী' নামক দুই জাতের হরিণ দৃষ্ট হয়। খাট্‌লীর আকার ছোট।

এ ছাড়া প্রাণীদের মধ্যে উল্লেখ্য—লজ্জাবতী বানর, বনবিড়াল, কাঠবিড়ালী, উদ্‌বিড়াল, 'বাড়ল' (দ্রুতধাবনশীল), শজারু, খরগোস, নেউল, "শিকারী" (অনেকটা কুকুরাকৃতি) হনুমান এবং লাঙ্গুলহীন ও লাঙ্গুলবিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকার বানর ছাড়া বনমানুষও কদাচিৎ দৃষ্ট হয়েছে।

পাখী ঃ

বিঙ্গরাজ (বিহঙ্গরাজ) পাখী একমাত্র শ্রীহট্টেই পাওয়া যায়—আইন-ই-আকবরিতে এব সুখ্যাতি করা হয়েছে। এরা কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ লাঙ্গুলবিশিষ্ট। বর্ণবৈচিত্র্য না থাকলেও স্বরবৈচিত্র্যেব জন্য বিখ্যাত। স্বর অতি সুমিষ্ট। বিভিন্ন জন্তুর স্বর অবিকল অনুকরণ করতে পারে বলে হরবোলা নামেও আখ্যাত হয়। এরা মাংসাশী পক্ষী।

শেরগঞ্জ নামক সুমিষ্ট স্বর বিশিষ্ট পাখীর কথা আইন-ই-আকবরি ও রিয়াজ উস্-সালাতিনে বলা হয়েছে। পাহাড়ে ধনেশ পাখী পাওয়া যায়—এর তেল সূতিকা রোগে উপকারী, এই জন্য অনেকে এ পাখী শিকার করেন।

অন্যান্য পাখি—ময়না, তোতা (শুক), সারি (শালিক), শ্যামা, দোয়েল, তুতিয়া, কোকিল, বউ-কথা-কও, কাঠঠোকরা, মাছরাঙা, ঘুঘু, বুলবুল, বাবুই, খঞ্জন প্রভৃতি। 'মধুরা' নামে একজাতের পাখি পাহাড়ে থাকে—আকারে বনমোরগেব মত কিন্তু শব্দ বাঘের গর্জনের মতো।

মৎস্যাদি ঃ

মাছের মধ্যে রুই, কাত্‌লা, চিতল, বোয়াল, আড় (ঘাঘট), শউল, ঘনিয়া, গজার, কানলা (ফলি), পাবদা, বাচা, বাইন, মাগুব, কই, চ্যাং, চিংড়ি, রাণী, ট্যাংরা, পুঁটি সর্বত্র সুলভ।

আড় জাতীয় 'বাঘ মাছ' আকারে অতিবৃহৎ হয়। পার্বত্য নদীর জঙ্গলাংশে মহাশউল ও পালান নামে দু-জাতের মাছ মেলে। শউল জাতীয় পীপলা নামক মাছও পাহাড়ী নদীতে পাওয়া যায়। সুনামগঞ্জ মহকুমায় প্রতিবছর সর্বাধিক মাছ ধরা হয়।

বিবিয়ানা ও ধলেশ্বরীতে ঘড়িয়াল ও কুমীর মধ্যে মধ্যে দেখা যায়।

৭. অধিবাসী

শ্রীহট্টের অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকটি পার্বত্য জাতি ব্যতীত সবাই বাঙালী। ১৯০১ সালেব লোক গণনায় এদের কার সংখ্যা কত ছিল তাবও কিছু কিছু উল্লেখ কবা যাচ্ছে।

কামার—নবশাখের অন্তর্গত। লৌহদ্রব্য প্রস্তুত করা ছাড়া অনেকে সোনা-রূপার কাজও করে থাকে। (৯৪৯৫)

কায়স্থ—লিপি ব্যবসায়ী। শ্রীহট্টে বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত (৬৩৮৮৩)।

কাহার—চাষ ও পালকি বহনকারী (২২০৭)।

কুমার—নবশাখ শ্রেণীভুক্ত (১২২৭৮)।

কুশিয়ারী—'রাঢ়' নামেও কথিত। কুশিয়ার অর্থাৎ ইক্ষুর চাষ করে বলে এই নাম। বাংলার আর কোথাও এ জাতি নেই। এরা বলবান, সাহসী ও পরিশ্রমী। জল অচল ছিল, সম্প্রতি চল হচ্ছে। জলডুব গ্রামে এদের বাস বেশি (১৩৯০)।

কেওয়ালী বা কপালী—জলচল নয়। পূর্বে ব্যবসা ছিল বস্ত্র বয়ন (১১২৬)।

কৈবর্ত—জালিক দাস (৪৪৭০১)।

গণক—গ্রহবিপ্র ও গণক শাস্ত্রমতে দুই জাতি। ভবিষ্যৎ পুরাণের মতে সূর্যদেবের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে গ্রহবিপ্রের উদ্ভব। এরাই শাকদ্বীপী বিশুদ্ধ বিপ্র। বর্তমানে গণক ও শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্রকে পৃথক করা কঠিন। সমাজে গণকের সম্মান বেশি নয়— এদের জল অচল (৫৬১০)।

গণ্ডপাল বা গাড়ওয়াল—পূর্বে সম্ভবতঃ পার্বত্য জাতি ছিল। নৌকা সংরক্ষণ ও নৌকাচালনে অদ্বিতীয় (৩৩২)।

গন্ধবণিক—বৈশ্যবর্ণ সম্ভূত বণিকগণ, বৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার—গন্ধবণিক শঙ্খবণিক, কাংস্যবণিক, সুবর্ণবণিক, মণিবণিক। এই পঞ্চবণিক মধ্যে গন্ধবণিক শ্রেষ্ঠ। বর্তমানে স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয়াদি এদের ব্যবসায়। এরা এখন নবশাখ শ্রেণীর ন্যায় পরিগণিত (১০৬৬)

গোয়ালা—জলচল (১৪১২৭)।

চামার—অন্ত্যজ জাতি (প্রায় ৫০০০)।

চূণার—চূণ পোড়ানো ও বিক্রয় এদের বৃত্তি (২৭০)।

ঢুলী বা বাদ্যকর—ডোম, পাটনি বা কৈবর্ত থেকে এদের উদ্ভব বলে অনুমিত হয় (১০২৫৫)।

তাঁতী—এদের মধ্যে সাধারণতঃ ক্ষীর তাঁতী আচরণীয়, অন্যরা নয়। নবশাখ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত (প্রায় ৩০০০)।

তেলী—নবশাখ শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু ধর্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় এদের বৈশ্যবর্ণ বলে প্রতিবেদন করেছেন। এদের জল আচরণীয় (৩০৩১২)।

দাস—দাস জাতীয়েরা বঙ্গের সামরিক জাতি বলে কথিত হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের গণনাকালে এরা নিজেদের হালুয়াদাস বলে পরিচয় লিখিয়েছিল, কিন্তু ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের গণনায় হালুয়াদাস, দাস ও শূদ্রদাস এই তিন নামে জাতীয় পরিচয় দেয়। পূর্বে এদের জলচল ছিল না—এখন জলচল হয়েছে। শ্রীহট্টে এদের সামাজিক সম্মান কম নয়, নবশাখ শ্রেণীর উপরে এদের স্থান নির্দেশ করতে কোনো আপত্তি নেই। দাস জাতির মধ্যে অনেক শিক্ষিত, সমাজে সম্মানীয় ব্যক্তি আছেন। লোক সংখ্যা—দাস পরিচয়ে ৭০৬৮৮, শূদ্র পরিচয়ে ৪৫৩৪২, হালুয়াদাস পরিচয়ে ২৭৩১৩। শূদ্রদাস বলে পরিচয় দিয়েছিল ২১২২০ জন ব্যক্তি। দাসেরা পরিশ্রমী ও বলবান—চাষবাস তাদের প্রধান ব্যবসায়।

ধোপা—মোটসংখ্যা ২৩৫০৮।

(নদীয়াল) ডোম ও পাটনি—মূলতঃ এক জাতি হলেও পাটনিরা এখন ডোম বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে (৭৩২৪৬)।

নমঃশূদ্র (চণ্ডাল)—নমঃশূদ্র ও চণ্ডাল একজাতি বলে খ্যাত— কিন্তু মূলতঃ এরা একজাতি ছিল বলে বোধ হয় না। বস্তুতঃ এরা দুই পৃথক জাতি (১৩২৩০৭)।

নাপিত—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে নাপিতের মোদক বৃত্তি অবলম্বন করার উদাহরণ পাওয়া যায় (২১২২৪)।

ব্রাহ্মণ—শ্রীহট্টে অতি প্রচীনকাল থেকে ব্রাহ্মণদের অবস্থিতির প্রমাণ থাকলেও খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সম্মানিত সাম্প্রদায়িক বিপ্রেরা আগমন করেন। এঁদের আগমনের সঙ্গে শ্রীহট্টে মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের মত বিশেষরূপে প্রচলিত হয়। সাম্প্রদায়িকগণের পরে, পশ্চিম দেশ থেকে আরো বহুতর উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এদেশে আগমন করেন। সদ্‌ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৩৯৭৬১।

ব্রাহ্মণ (বর্ণ)—যে সকল জাতির জল, সমাজের চল নয় তাদের পৌরোহিত্য করে যে ব্রাহ্মণেরা স্বসমাজে পরিত্যক্ত হয়েছেন তাঁরা বর্ণব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত (২৪০০)।

ভাট বা ভট্টকবি—কবিতা বচনা ও কবিতাগান এদের ব্যবসায়। এরা উপবীত ধারণ করে ও ক্ষত্রিয় জাতীয় বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। সামাজিক সম্মান কম নয় (৭৭৮)।

ভূঁইমালী—পাল্‌কী আদি বহন ও মাটি খনন এদের জাতিগত ব্যবসায়। ভূঁইমালী ও হাড়ি একজাতীয় লোক হলেও হাড়ি আখ্যা ধারণ করতে অনেকেই লজ্জা বোধ করে (৪১১৮৪)। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ভূঁইমালী বলে কোনো জাতির উল্লেখ নেই।

ময়রা—এরা নবশাখ শ্রেণীর অন্তর্গত শুদ্ধ জাতি বলে বিবেচিত (৮৫২)।

মাহারা—পাল্‌কি বহন এদের কার্য, সম্প্রতি চাষ-আবাদ করছে। ইটার রাজা সুবিদনাবায়ণ এদের সৃষ্টিকর্তা বলে কথিত আছে। জলচল না হলেও হুঁকা চল আছে (৩৪৮১)।

মালো—মৎস্যজীবী, কৈবর্তের পরেই এদের স্থান (১৫৯৮২)।

যুগী—যুগীগণ আপনাদের আদি পুরুষের নাম গোরক্ষনাথ বলে উল্লেখ করে এবং নিজেরা 'নাথ' উপাধি ধারণ করে। তারা যোগীর সন্তান বলে মৃত্যু হলে সন্ন্যাসীর ন্যায় দেহ সমাহিত করে। এদের পুরোহিত নেই, স্বজাতির মধ্যে কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি যজ্ঞসূত্র ধারণ করে পৌরোহিত্য করে থাকে, এরা মোহন্ত নামে পরিচয় দেয় (৭৮৯১৫)। বস্ত্রবয়ন এদের ব্যবসায়, অধুনা অনেকে চাষ আবাদ করছে।

লোহাইত কুরী—মেঘনা তীরবর্তী লোহাইতদের বৃত্তি মাছধরা, কিন্তু শ্রীহট্টবাসী লোহাইত কুরীগণ সিদ্ধ চাল প্রস্তুত করে (৩৯৮)।

বারুই—বর প্রস্তুত করতঃ পানের ব্যবসায় করে বলে 'বরজ' বা বারুই নামে কথিত। নবশাখ শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের মধ্যে ভদ্র, মিত্র, নন্দী, দেব প্রভৃতি উপাধির প্রচলন দেখে কেউ কেউ কায়স্থ থেকে এদের উদ্ভব অনুমান করেন। আবার কেউ কেউ এদের বৈশ্য বর্ণও বলেন। শ্রীহট্টে বারুজীবিগণ কায়স্থ বলে পরিচয় দিতে অধিক আগ্রহান্বিত (১৬৩৪৬)।

বৈদ্য—সম্মানিত বৈদ্য জাতিই পৌরাণিক অম্বষ্ঠ জাতি। এদের জাতিগত ব্যবসায় ব্রাহ্মণের চিকিৎসা। ভাটেরার তাম্রফলকে জনৈক বৈদ্যবংশীয় রাজমন্ত্রীর নাম পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে রাজা গৌড় গোবিন্দ বৈদ্যজাতীয় মহীপতিদত্তকে এদেশে আনয়ন করেন। শ্রীহট্টের বৈদ্যগণ উপবীত ধারণ করেন না এবং কায়স্থের সঙ্গে তাঁদের আদান-প্রদান প্রচলিত আছে। তারাও কায়স্থের মত মাসাশৌচ ধাবণ করেন (৩৭৯৬)।

শাঁখারি—বৈশ্যবর্ণ, তবে কায়স্থ সমাজভুক্ত হতে আগ্রহী। এদের ব্রাহ্মণেরা এখনো অনাচরণীয়। সংখ্যা ৭০, এটি সম্ভবতঃ প্রকৃত সংখ্যা নয়। বারুই-র মতন অনেক শাঁখারি কায়স্থ সমাজে আত্মগোপন করেছেন।

শুঁড়ী—শুঁড়ীগণ প্রায়শঃ সাহা উপাধি ধারণ করে, এইজন্য যারা নিজ ব্যবসা ত্যাগ করেছে তাদের বৈশ্য সাহা জাতি থেকে পৃথক করা কঠিন।

সাহা বা সাহু—সাহা শব্দ সার্থবাহ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়ে থাকবে। অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ বলেন, বণিকদের সাধু বলা হত, তারপর সাহু, পরে সাহা উপাধি দাঁড়িয়েছে। শ্রীহট্টে সাহাশ্রেণীর বহুতর লোক আছেন। সাধারণ সম্মানে কায়স্থের পরেই তাদের স্থান। কিন্তু উত্তর শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ, দক্ষিণ শ্রীহট্ট, (পূর্বাংশ) বাসী সাহুগণ বৈশ্য-সাহা বণিকদের থেকে পৃথক ছিল। রাজা সুবিদনারায়ণের সময়, পূর্বোক্ত বৈশ্য-সাহার সংশ্রবে, বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজ থেকে এরা পৃথক হয়ে পড়ে এবং কালক্রমে আপনাদের বৈশ্য সাহা জ্ঞানে সেভাবেই চলছে। সংখ্যা ৩৪৪০৬।

সুবর্ণ বণিক বা সোনার—কথিত আছে রাজা বল্লাল সেন এদের সমাজে অচল করেন (৭৭৫)।

পার্বত্য জাতিঃ

কুকি—অনেকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে হালাম ও তিপ্‌রা বলে পরিচয় দিয়ে থাকে (৩৬১)।

খাসিয়া ও সিন্টেং—খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পর্বতের অধিবাসী। সংখ্যা ৩০৮৩। শ্রীহট্টে কয়লা বিক্রয়কারী পাতর জাতীয় ব্যক্তিগণ হিন্দুমতাবলম্বী খাসিয়া জাতি থেকে পৃথক নয়।

গারো—সংখ্যা ৭৪৬, এরমধ্যে হিন্দুগারো মাত্র ৯৪ জন।

তিপ্‌রা—৮২৬১।

মণিপুরী—শ্রীহট্ট সদর, পাথারকান্দি, লক্ষ্মীপুর, ডলু, শিংলা, লংলা, ধামাই, গৌরনগর, পাথারিয়া, তরফ, আসামপাড়া, সুনামগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এদের বাস (১৬০৪৩)।

লালুং—বিবাহান্তে স্ত্রীর পিতৃবংশভুক্ত হয়, কিন্তু স্ত্রীর মরণান্তে আবার নিজ বংশত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে থাকে (৬৩৯)।

মুসলমানঃ

কুরেশি—হজরত মহম্মদ এবং শ্রীহট্টের শাহজালাল এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (৩৭৫)।

গাইন—নিম্ন শ্রেণীর গায়ক সম্প্রদায় (২২০)।

জোলা—নিম্নশ্রেণীর বস্ত্র ব্যবসায়ী (৪৯১)।

নাগারছি—বাদ্যকর (৪৯৪)।

পাঠান—শেখ, সৈয়দ, পাঠান, মোগল— চার শ্রেণীর অন্যতম (৬৪২০)।

মাহিমাল—মৎস্যজীবী মুসলমান (৩৫১৯৫)।

মীর শিকারী—নিম্নশ্রেণীর শিকারী জাতি (৩৯৫)।

মোগল—৪৯৩।

বেজ—পক্ষী শিকার ও সর্পক্রীড়া প্রভৃতি এদের ব্যবসায় (২২৩)। এই একই ব্যবসায়ী বেদিয়া জাতির বাসও শ্রীহট্টে আছে। এদের সংখ্যা ৫৮ জন মাত্র। এরা হিন্দুধর্ম মেনে চলে।

শেখ—আরবের সাধারণ মুসলমানদেব উপাধি শেখ (১১২৬৩৪৯)। অনেক মাহিমাল শেখ সংজ্ঞায় আত্মগোপন করেছিল বলে অনুমিত হয়।

সৈয়দ—হজরত মোহম্মদের জামাতা আলীর বংশজাত, মুসলমান সমাজে অতি সম্মানিত—সংখ্যা ৬৫৯৮।

খৃষ্টীয়ান ঃ

বুন্দাশিলের নেটিভ খৃষ্টীয়ানেরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জনৈক নবাব কর্তৃক গোলন্দাজ রূপে শ্রীহট্টে আনীত হয়। শ্রীহট্টে ছড়ার পারে কতক খৃষ্টীযান অধিবাসী আছে (৩৯৪)।

৮. ধর্ম ও শিক্ষা

ধর্ম ঃ

মুসলমান—উত্তর শ্রীহট্ট বহুপূর্বে মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয় বলে উক্ত মহকুমায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক। নীচজাতীয় হিন্দুদের ধর্ম পরিবর্তন ও মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহের বহু প্রচলনই এই সংখ্যাধিক্যের অন্যতম কারণ। শ্রীহট্টীয় মুসলমানদের মধ্যে সিয়াদের সংখ্যা অতি সামান্য। মোট সংখ্যা ১১৮০৩২৪।

হিন্দু—শাক্ত ৩১৩৫২২, শৈব ৫৭৫৭১ বৈষ্ণব ৫৬০৩৭৯। মোট হিন্দু সংখ্যা ১০৪৯২৪৮।

বৃক্ষ পশু প্রভৃতির উপাসক—১১৩৩৭ এবং খৃষ্টান ৩৯৪ জন মাত্র।

শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব—শাক্তদের মধ্যে পশ্বাচার ও বামাচার উভয়মতই প্রচলিত আছে। বামাচারী মতে মদ্যপান দূষণীয় নয়।

শৈবদের মধ্যে যুগী জাতীয় লোকের সংখ্যাই অধিক। ত্রিনাথ দেবতার অর্চনা বা সেবা এদের মধ্যে প্রচলিত। ত্রিনাথেব সেবায় গাঁজা ভোগই প্রধান। উপাসকগণ রাত্রে শিবের লীলাত্মক গান গেয়ে শেষে প্রসাদ ভক্ষণ করে। চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা উপলক্ষে কানফোড়া প্রভৃতি এদের ক্রিয়া ছিল।

অনেক উপধর্মাক্রান্ত ব্যক্তি নিজেদের বৈষ্ণব বলে থাকে। এদের মধ্যে কিশোরীভজন মতাবলম্বীদের সংখ্যা অধিক। শুদ্ধ বৈষ্ণবমতের সঙ্গে সহজ বা কিশোরীভজন মতের সম্পূর্ণ ঐক্য নেই। এরা পঞ্চরসিকের মতে চলে বলে কথিত। প্রত্যেকে উপাসনার জন্য এক একজন সঙ্গিনীর সাহায্য গ্রহণ করে এবং তাকে প্রেমশিক্ষার গুরু কল্পনা করা হয়। এরা উপাসনাকালে জাতিবিচার করে না। তাদের উপাসনাকার্য ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর অসাক্ষাতে গভীর রাতে সম্পাদিত হয়। কিশোরীভজন উচ্চশ্রেণীর লোকেরা আদর করেন না।

জগন্মোহনী বৈষ্ণবগণও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন ধর্মসম্প্রদায়—এর উৎপত্তিস্থান শ্রীহট্ট জেলা। প্রায় চারশ বছর পূর্বে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। গোপীনাথের শিষ্য বাঘাসুরাবাসী জগন্মোহন গোসাঞি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। এরা ব্রহ্মবাদী, প্রতিমা পূজায় তাদের স্পৃহা নেই। "গুরু সত্য এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া, গুরুকেই ইঁহারা প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করে" (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রথম ভাগ ২১০ পৃ.)। এরা স্ত্রীত্যাগী, ব্রহ্মচর্য পালন করাই তাদের ধর্মসঙ্গত বিধি। তারা তুলসী ও গোময়ের ব্যবহার করেন না এবং স্বসম্প্রদায়ের 'নির্বাণ সঙ্গীত' গান করাই উপাসনার অঙ্গ মনে করেন। জগন্মোহন গোসাঞির শিষ্যের প্রশিষ্য রামকৃষ্ণ গোসাঞি থেকে এ ধর্মের বহুল প্রচার হয়। বিথঙ্গলের আখড়া এদের প্রধান তীর্থস্থান। আরো দুটি আখড়া আছে মাছুলিয়া ও ঢাকার ফরিদাবাদে।

চাপঘাট পরগণাধীন কচুয়ারপার নামক স্থান নিবাসী ব্রহ্মনন্দ বৈষ্ণব তদঞ্চলে এইরূপ মত প্রচার করেন। তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় "ব্রহ্মানন্দী" নামে কথিত। জগন্মোহনী মতের সঙ্গে এ মতের বিশেষ অনৈক্য নেই। এরা জাতিভেদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না।

মণিপুরীরা বৈষ্ণবধর্মে বিশ্বাসী। রাসযাত্রা উপলক্ষে তারা আগ্রহ সহকারে 'লাইচাবী' অর্থাৎ কুমারীদের সহায়ে নৃত্যগীতসহকারে রাস গান করে। এরা বৈষ্ণবধর্মের গাঢ় অনুরাগী হলেও হিন্দু সমাজের অজ্ঞাত একটি জাতীয় দেবতার পূজা প্রত্যেক বংশে প্রচলিত আছে। ইনি মৎস্যপ্রিয় বলে এই দেবতাকে বোয়াল মৎস্যাদি উপহার দেওয়া হয়, এবং তিনি বংশের প্রধান ব্যক্তির জিম্মায়, বাড়ির পশ্চাৎভাগে অনাদৃতভাবে বাস করেন। বাল্যবিবাহের প্রচলন এবং অবরোধ প্রথা এদের মধ্যে নেই।

কুকি তিপ্‌রা প্রভৃতির জাতীয় দেবতাও মৎস্যাশী। কুকিদের বাঁশপূজা অতি আশ্চর্য। কথিত আছে তাদের পূজার মন্ত্রবলে উদ্দিষ্ট বংশদণ্ডের অগ্রভাগ ভূমিস্পর্শ করে থাকে। কুকিরা ঈশ্বর বিশ্বাসী হলেও পরকাল বোঝে না।

শ্রীহট্ট জেলায় অল্প সংখ্যক খৃষ্টীয়ান অধিবাসী আছে; এরা রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। অল্প সংখ্যক প্রটেস্টান্ট খৃষ্টানও আছে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টে প্রটেস্টান্ট মিশন স্থাপিত হয়। শ্রীহট্ট সদর, করিমগঞ্জ ও মৌলবীবাজারে ওকেলিশ মিশনের এক এক আড্ডা আছে। পরলোকগত রেভারেন্ড প্রাইজ সাহেবের যত্নে শ্রীহট্টে খৃষ্টধর্ম প্রথম প্রচারিত হয়। প্রাইজ সাহেব স্বীয় চরিত্রগুণে হিন্দু জাতিরও অতি প্রিয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হিন্দুদের অর্থসাহায্যে তাঁর সমাধিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রথম স্থাপিত হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে।

মুসলমান সমাজে শ্রীহট্টের আসুরা বিখ্যাত ছিল। আসুরা পর্বে ঈদগার ময়দানে লাঠি খেলা, বানুটি খেলা ইত্যাদি হয়ে থাকে, অনেক তাবুজ এসে জমা হয় ও মেলা বসে। (বাঁশের লাঠির দুই প্রান্তে জ্বলন্ত ন্যাকড়া জড়িয়ে লাঠি খেলার মতো বানুটি খেলা)।

হিন্দুদের বিশেষ আড়ম্বর দুর্গোৎসব পর্বে। শৈবদের মধ্যে বারুণীপর্ব এবং বৈষ্ণবদের ঝুলনযাত্রা ও রথযাত্রায় বিশেষ বিশেষ স্থলে বহু জনতার সমাবেশ হয়। শ্রীহট্টে মনসা পূজা ইতরভদ্র সকলেই করে। মনসা পূজা ও মাঘী-সংক্রান্তি প্রতিপালনে দরিদ্র ব্যক্তিও অবহেলা করে না।

নৌকাপূজা ও গোবিন্দকীর্তন শ্রীহট্টের দুটি বিশেষ ধর্মোৎসব। কোনো মাঠে গৃহ প্রস্তুত করে তাতে নৌকাকৃতি কাঠাম প্রস্তুত করা হয়। নৌকার কাঠামে মনসা মূর্তি প্রধান। অপর বহুতর দেব মূর্তি দ্বারা নৌকাগৃহ পূর্ণ করা হয়। এ পূজায় অনেক অর্থব্যয় হয়ে থাকে।

গোবিন্দকীর্তন সন্ধ্যা থেকে প্রভাত পর্যন্ত গাইতে হয়। ন্যূনাধিক দেড়শ দু শ লোক দলে দলে বিভক্ত হয়ে আসরে উপস্থিত হয়। লতাপুষ্প মণ্ডিত একটি কুঞ্জগৃহ নির্মাণ করে তাতে ৺রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ রাখা হয় ও তার সামনে দলে দলে পর্যায়ক্রমে অবিরাম গীত গায়। গীত শেষ হলে প্রভাতে মঙ্গল আরতি গেয়ে উৎসব শেষ করা হয় ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। গোবিন্দকীর্তনের সঙ্গীত, গৌরচন্দ্রিকা, জলসংবাদ, রূপ, খেদ, দূতী সংবাদ, অভিসার বা চলন এবং মিলন। এই পর্যায়ক্রমে গীত হয়।

পূর্বে ভাষা পদ্মপুরাণ সঙ্গীতযোগে শ্রাবণ মাসে গঠিত হত, এ প্রথা প্রায় উঠে গেছে। শ্রীহট্টবাসী কবি ষষ্ঠীবর ও নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ অনেকস্থানে পঠিত হত।

শ্রীহট্টে অন্যান্য দেবদেবী পূজায়, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। বারব্রতাদিতেও বড় বিশেষত্ব নেই। জন্মাহের ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠীপূজা, অবিবাহিতা বালিকাদের মাঘব্রত এবং রমণীদের সূর্যব্রত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাঘব্রতে সমস্ত মাঘমাস ধরে অবিবাহিতা বালিকাদের ভোরে উঠে স্নানান্তে ব্রতের নির্দিষ্ট বেদিকার সম্মুখে বসে কথা বলতে হয়। বেদীর সামনে জলপূর্ণ দুটি গর্ত থাকে ও অভিভাবিকাগণ তণ্ডুল, হরিদ্রা, ইষ্টকচূর্ণ এবং আবির দ্বারা প্রত্যহ বেদী ও ব্রতস্থান চিত্রিত করে দেন। পনেরোদিন পরে 'উদয় পূজা'। সেদিন সমস্ত প্রাঙ্গণভরে ছবি আঁকা হয়। ব্রত সমাপ্তি দিন 'দেউল' বিসর্জন করতে হয়। ব্রতের দিন নির্দেশার্থ এক একটি মাটির গোলক তুলসী বেদীব নিচে রক্ষিত হয়, তাই দেউল। উত্তম স্বামী, ধন জন, বস্ত্রালঙ্কার ইত্যাদি লাভ করা এই ব্রতের উদ্দেশ্য।

শ্রীহট্টে স্ত্রীলোকদের মধ্যে সূর্যব্রতও বিশেষ প্রচলিত। মাঘ মাসের কোন এক রবিবারে অভুক্তাবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে এ ব্রত করতে হয়। কলাগাছ, গাঁদাফুলে মণ্ডিত করে প্রাঙ্গণে প্রোথিত করা হয়। তার সামনে দুটি গর্তে জল ও দুধ রক্ষিত হয়, রঙিন চূর্ণে চন্দ্রসূর্যের চিত্র ভূমিতে

আঁকা হয়। ব্রতধারিণীকে শুধু উপবাস ও পরিচর্যা করতে হয়, ব্রাহ্মণই পূজা করেন। স্ত্রীলোকেরা কৃষ্ণলীলার গীত গেয়ে থাকেন। সূর্যাস্ত হলে ব্রতধারিণী উপবেশন করেন ও প্রসাদ ভক্ষণ করেন।

শ্রীহট্টের নগর সংকীর্তন ও বংশীবাদন অতি প্রসিদ্ধ।

বিদ্যাশিক্ষা ঃ

রেভারেণ্ড প্রাইজ সাহেবই এদেশে ইংবাজী শিক্ষাব বীজ বপন করেন। সেকালে একটি স্কুল ছিল বটে, কিন্তু সেটি স্থায়ী হতে পারেনি। উচাইলের জমিদার একজন ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, উচাইলে একটি বিদ্যালয়ও ছিল, ত্রিপুরা ময়মনসিংহের বহু ছাত্র এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়েছিল। ঢাকার ঐতিহাসিক বিবরণে লিখিত আছে যে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলায় ২৮টি স্কুলে ১১২৭ জন ছাত্র ছিল—এই অত্যল্প ছাত্র সংখ্যার অর্ধেকই থাকতো শ্রীহট্ট সহরে।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টের সরকারী স্কুল স্থাপিত হয়। এই স্কুল স্থাপিত হওয়ায় শ্রীহট্টবাসীর ইংরাজী শিক্ষার পথ প্রসারিত হয়। রায়সাহেব দুর্গাকুমার বসু মহাশয়ের কার্যকালে শ্রীহট্টজেলা স্কুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি গণনীয় স্কুল হয়ে দাঁড়ায়।

স্যার জর্জ ক্যাম্বেল প্রবর্তিত প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য শিক্ষক প্রস্তুতের আবশ্যক হওয়ায় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। শিক্ষক, গণিত শাস্ত্রবিদ ৺গোবিন্দ চরণ দাস ও স্বরূপচন্দ্র রায়ের যত্নে এই স্কুলের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। কয়েক বছরে শিক্ষকের অভাব পূর্ণ হলে এই স্কুল উঠিয়ে দেওয়া হয়।

হাইকোর্টের উকিল জয়গোবিন্দ সোম শ্রীহট্টের সর্বপ্রথম এম. এ. উপাধিধারী। ছনখাইড়বাসী গজনফর আলী খাঁ ১৮৯৩ খৃঃ ভাবতীয় সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হন। জলসুখাবাসী রমাকান্ত রায় ১৮৯৮ খ্রীঃ জাপানে গিয়ে খনিজ বিদ্যাশিক্ষা করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর করিমগঞ্জের গুরুসদয় দত্ত সিভিল সার্ভিস ও জলসুখার রাধামাধব রায় কুপারহিল কলেজের ইঞ্জিনীয়রিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসেন।

পূর্বে শ্রীহট্ট, কাছাড় এবং ময়মনসিংহ ও কুমিল্লার স্কুলসমূহ একজন ডেপুটি ইন্‌স্‌পেকটরের অধীনে ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের জন্য স্বতন্ত্র ডেপুটি ইন্‌স্‌পেকটর নিযুক্ত হন। সে থেকে শ্রীহট্টে সাধারণ শিক্ষার বিস্তাব হয়। এস্থলে ভূতপূর্ব ডেপুটি ইন্‌স্‌পেকটর রায়সাহেব নবকিশোর সেনের নাম উল্লেখ কবা কর্তব্য। তাঁর ঐকান্তিক যত্নে এদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সুরমা উপত্যকার জন্য একজন ইন্‌স্‌পেকটর নিযুক্ত হন ও প্রত্যেক মহকুমায় একজন ডেপুটি ইন্‌স্‌পেকটর থাকেন।

শ্রীহট্ট সহরে রাসবেহারী দত্তের বাড়িতে স্থাপিত 'রাসবেহারী স্কুল' দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত ইংরাজি স্কুলের আদি। শ্রীহট্ট ন্যাশনাল স্কুল বিপিনচন্দ্র পাল ও রাধানাথ চৌধুরীর কীর্তি। মুরারিচাঁদ কলেজ ও তৎসংসৃষ্ট স্কুল রায়নগরের উন্নতচেতা রাজা গিরিশচন্দ্র বায় কর্তৃক ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীহট্টে সরকারী স্কুল এবং করিমগঞ্জ মৌলবীবাজার হবিগঞ্জ, বাণিয়াচঙ্গ ও সুনামগঞ্জে সাহায্যকৃত স্কুল ছিল। জেলায় এন্ট্রান্স স্কুলের সংখ্যা ছিল সাত।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্রপাল, সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতির চেষ্টায় কলকাতায় 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী' স্থাপিত হয়েছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টে একটি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় আখালিয়ানিবাসী সদয়াচরণ দাসের কন্যা শ্রীমতী সরোজনী দাস শ্রীহট্টবাসী মহিলাদের মধ্যে প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শ্রীহট্টবাসী মুসলমানদের মধ্যে একরূপ নাগরাক্ষর প্রচলিত। অনেক মুসলমানী কেতাব এই অক্ষরে মুদ্রিত (সিলেটী নাগরী)। কলকাতায় (১৬নং গার্ডনার লেন, তালতলায়) শ্রীহট্টবাসী মুসলমানগণ এই অক্ষরে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন।

সংবাদপত্রঃ

সাধারণ শিক্ষা প্রচার পক্ষে সংবাদপত্রেব সহায়তা সামান্য নয়। শ্রীহট্ট লংলাবাসী গৌবীশঙ্কর ভট্টাচার্য ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা শোভাবাজার থেকে 'সংবাদভাস্কর' নামে একটি পত্রিকা বার করেন। এই পত্রিকা সপ্তাহে তিনদিন প্রকাশিত হত। 'সংবাদভাস্কর' ঈশ্বর গুপ্তেব সংবাদপ্রভাকরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

শ্রীহট্ট থেকে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম "শ্রীহট্টপ্রকাশ" প্রকাশিত হয়। লাতু নিবাসী প্যারীচরণ দাস এর সম্পাদক ছিলেন। 'পদ্যপুস্তক', 'ভারতেশ্বরী' প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা প্যারীচরণ হৃদয়বান কবি ছিলেন। শ্রীহট্টপ্রকাশ ছয় বছর প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র পাল ও রাধানাথ চৌধুরীর সম্পাদকতায় সাপ্তাহিক 'পরিদর্শক' পত্রিকা শ্রীহট্ট সহর থেকে বার হয়েছিল। কিছুদিন পরে রাধানাথবাবু স্বয়ং এক মুদ্রাযন্ত্র এনে একাকী সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন।

পরিব্রাজক, শ্রীহট্টমিহির ও শ্রীহট্টবাসী অল্পজীবী পত্রিকা। প্রথম মাসিক পত্র "শ্রীহট্ট দর্পণ" ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়ে দু-বছর চলেছিল।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম রহস্যাত্মক বার্ষিক পত্রিকা "ফুলতত্ত্ব" ছাপা হয়।

শশীন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত The Weekly Chronicle প্রকাশিত হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে।

মফঃস্বলের পত্রিকাগুলির মধ্যে প্রভাত (করিমগঞ্জ), প্রজাশক্তি (হবিগঞ্জ), মৈত্রী (বাণিয়াচঙ্গ) উল্লেখযোগ্য।

৯. তীর্থস্থান

উত্তরে পণাতীর্থ থেকে আরম্ভ করে মহাদেব রূপনাথ, সিদ্ধেশ্বর, ঊনকোটি, তুঙ্গেশ্বর ও ব্রহ্মকুণ্ড পর্যন্ত জেলার তিনদিকেই বৃত্তাকারে দেবস্থান আছে।

বামজঙ্ঘা মহাপীঠ

বামজঙ্ঘা মহাপীঠ সাধারণতঃ 'ফালজোরের কালীবাড়ি' নামে কথিত হয়। শ্রীহট্টের দুইটি মহাপীঠের অন্যতম এই পীঠ জয়ন্তীয়ার বাউরভাগ (বাম + উরু + ভাগ) পরগণায় অবস্থিত। পীঠাধিষ্ঠাত্রী জয়ন্তীদেবীর নামে সে অঞ্চল জয়ন্তীয়া রাজ্য ও উত্তর তীরবর্তী পর্বত জয়ন্তীয়া পর্বত নামে খ্যাত। এখানকার দেবীর নাম জয়ন্তী, ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর।

'বিশ্বকোষে' লেখা হয়েছে— "এই মহাপীঠ শ্রীহট্ট নগরী হইতে ৩৮ মাইল উত্তরপূর্বে পর্বতপাদদেশে একখণ্ড সমতল ভূমে, ইষ্টক নির্মিত প্রকাণ্ড এক ভিত্তির মধ্যস্থিত চতুষ্কোণ অগভীর এক গর্ভমধ্যে ও একখানি চতুষ্কোণ প্রস্তরোপরি অবস্থিত। ভৈরবও প্রস্তররূপী হইয়া দেবীর সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্থানে বহুতর নরবলি হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ রাজ এই নৃশংস প্রথা রহিত করিবার জন্য জয়ন্তীয়া রাজ্য দখল করিয়া লন। তদবধি নরবলি বন্ধ হইয়াছে।"

কিংবদন্তী এই, একদা কয়েকটি রাখাল বালক একটি প্রস্তরখণ্ডের সামনে খেলা করবার সময় তাদের মধ্যে একজন পূজক সাজে ও অপরজন ছাগশিশু হয়। ফুল দিয়ে পাথরের পূজা করবার পর পূজক বেশী বালক বিন্নাতৃণের দ্বারা তৈরী খড়্গ দিয়ে ছাগশিশু বালকেব কণ্ঠে আঘাত করবামাত্র বালকের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়। এ ঘটনা ঘটে জয়ন্তীয়ার বড় গোসাঞির রাজত্বকালে (১৫৪৮-১৫৬৪)। জয়ন্তীয়ারাজ খনন করে পাথরটি তুলে নিজপাটে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে সেই স্থানটিকে সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিয়ে চারদিক পাঁচিল তুলে ঘিরে দেন। সেই রাখাল বালক নিহত হওয়ার পর থেকে নরবলির প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল। জয়ন্তীয়া রাজ 'সমস্ত জয়ন্তী রাজ্যই মায়ের' বলে দেবীর সেবার জন্য কোনো দেবোত্তর নির্দিষ্ট করেন নি। জয়ন্তীয়ার পতনের পর পীঠেরও দুরবস্থা ঘটে।

বামজঙ্ঘা পীঠে আঁকড়ে-ধরা মূর্তিকে কেউ কেউ ক্রমদীশ্বর ভৈরব বলেন। মতান্তরে রূপনাথ শিবই উক্ত ক্রমদীশ্বর। রূপনাথ মহাপীঠ থেকে অল্প উত্তরে। বাঁশ ও পাতা দিয়ে রূপনাথের কুটির খাসিয়া রমণীরা তৈরি করে থাকে।

রূপনাথের সন্নিকটে প্রসিদ্ধ রূপনাথ গুহা—পূর্বাঞ্চলের এক অত্যাশ্চর্য দর্শনীয় স্থান। পর্বতমূল থেকে ক্রমোর্ধ্ব বক্রগতিতে প্রায় দুই মাইল রূপনাথের কুটিরের উপরে গুহা। গুহাভ্যন্তর গাঢ় তিমিরে চির সমাচ্ছন্ন খাসিয়ারা আলোক ও পথপ্রদর্শন কার্যে যাত্রীদের সহায়তা করে। সে চিরসঞ্চিত অন্ধকার মানব কল্পনার অতীত। অল্প একটু অগ্রসর হলে দর্শকের দৃষ্টি উর্ধ্বে বিস্তৃত একটি কিংখাপের ঝালরের উপর হঠাৎ পড়ে। অকৃত্রিম স্বাভাবিক আর্দ্র প্রস্তরখণ্ডের উপর আলোকের প্রভা প্রতিফলিত হলে বস্ত্র ঝালরবৎ প্রতীয়মান হয়।

আরো কিছু অগ্রসর হলে 'নক্ষত্রমণ্ডল' দৃষ্টিগোচর হয়। বিন্দু বিন্দু জল চুইয়ে উপরের ছাদে ঝুলতে থাকে। যাত্রীদের দীপালোকে তা বিচিত্র প্রোজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে অনুভূত হয়। স্থলান্তরে স্থূলাকার এক অপূর্ব শিবলিঙ্গ, তাতে অগণ্য স্বর্ণরেণু ঝিক্‌মিক্ করছে। একস্থানে স্তম্ভাকার পাঁচটি

পাথর, এর নাম 'পঞ্চপাণ্ডব'। অন্যস্থানে বটগাছের শিকড়ের মতো চারিটি বৃহত্তর পাথর নেমেছে—একে 'চারযুগের খাম্বা' বলে। অতঃপর একটি গভীর গর্ত দেখা যায়, এ 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। তৎপর স্বর্গদ্বার।

স্বর্গদ্বার স্থানটি শান্ত ভাবোদ্দীপক, অতি মনোরম ও তৃপ্তিপ্রদ। নিবিড়তম অন্ধকারে গুহাভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে ঊর্ধ্ব থেকে সামান্য মিটিমিটি আলোক ভিতরে আসছে—তাতে যেন কত শোভা ফুটে উঠছে। লোকের বিশ্বাস যে, স্বর্গদ্বার দেখলে, স্বর্গগমনে আর বাধা থাকে না।

আরো কিছু দূরে একটি অন্তগহ্বর বা গর্ত। অতি সতর্ক না হলে সে গর্তপথে প্রবেশের সাধ্য নেই। এর ভিতর ক-টি পাথরের ত্রিশূল প্রোথিত রয়েছে; এই স্থানের নাম 'যোগনিদ্রা'। সাধারণতঃ যোগনিদ্রা থেকে দর্শকগণ প্রত্যাবৃত্ত হয়। এরপর 'পাতাল বা নাগপুরী'— ভীষণ সর্পগণের আবাস। প্রবেশদ্বার থেকে যোগনিদ্রা যেতে প্রায় আধঘন্টা সময় লাগে। গুহাটি এত বৃহৎ যে একসঙ্গে দু-তিনশ লোক প্রবেশ করলেও পরস্পর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

গুহা থেকে বার হয়ে এর কাছাকাছি 'সাতহাতপানি' নামক এক কুণ্ডে স্নান তর্পণ করতে হয়। এর অল্প উত্তরে 'পাতাল গঙ্গায়'ও তর্পণাদি করতে হয়। আরো উত্তরে একটি অতি বৃহৎ ও উঁচু পাথর আছে। ঐ পাথরের নিচে একটি গভীর কূপ। একটি গুপ্ত জলস্রোত সোঁ সোঁ শব্দে অদৃশ্যভাবে ঐ কূপে পতিত হয়ে একদিক দিয়ে বার হয়ে যাচ্ছে—এরই নাম গুপ্তগঙ্গা। এখানে স্নান করা যায় না। ঘটি দিয়ে জল নিয়ে লোকে মাথায় দেয়।

রূপনাথ শিব পূজার্থে যাত্রীদের অর্চনার দ্রব্য ও নিজের পুরোহিত সঙ্গে নিতে হয়। গুহাভ্যন্তরে কোনো দেবতার পূজা নাই। শিবরাত্রি ও বারুণী উপলক্ষে এইস্থানে বহুলোকের সমাগম হয়।

গ্রীবাপীঠ

গ্রীবাপীঠে ভৈরবীর নাম মহালক্ষ্মী ও ভৈরব সর্বানন্দ। এই মহাপীঠ যে শ্রীহট্ট সহরে বা তন্নিকটে বিরাজিত, তা সকলেরই মনের ধারণা। কিন্তু কোথায় যে সে পুণ্যস্থান অবস্থিত, তার যথার্থ নির্দেশ সাহস সহকারে করা যেত না। কেউ কেউ মনে করতেন দরগামহল্লায় এই মহাপীঠ ছিল, পরে বিলুপ্ত হয়েছে। কেউ কেউ বা দুর্গাবাড়িতেই এই পীঠের অবস্থিতিস্থান কল্পনা করতেন। পরে প্রচারিত হয় শ্রীহট্ট সহর থেকে মাত্র দেড় মাইল দক্ষিণে গোটাটিকরের জৈনপুরে প্রসিদ্ধ গ্রীবাপীঠ অবস্থিত। বিরজানাথ ন্যায়বাগীশ তাঁর দুই ছাত্র কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য ও কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহায়তায় মাটি খনন করে শিবমূর্তি আবিষ্কার করেন। তারাকিশোর চৌধুরী (তখন হাইকোর্টের উকিল) ও রায়বাহাদুর প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীহট্টের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার) এখানে পূজা দেন এবং শরচ্চন্দ্র চৌধুরীও এইস্থানকে পীঠ বলে স্বীকার করেন। খননকালে শিবলিঙ্গসমীপে মাটির তলায় একটি প্রদীপের মুছি ও তিন চারটি মাটির পাত্র পাওয়া গিয়েছিল। এদেশে কোনো সময়ে বিজাতীয়ের আক্রমণে দেবনিগ্রহ ঘটেছিল; প্রসিদ্ধ ঊনকোটি এবং ভুবনেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে ছিন্নহস্তপদবিশিষ্ট দেবদেবী দর্শন করলে একথা অসঙ্গত বোধ হয় না।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উৎসাহে শিবরাত্রি ও অশোকাষ্টমীযোগে এখানে মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(দেশ বিভাগের অল্প কিছুকাল পূর্বে কোনো কোনো ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করেন শ্রীহট্ট শিলং সড়কের ধারে অবস্থিত কালাগুল চা বাগানের কাছে প্রকৃত গ্রীবাপীঠ অবস্থিত ছিল)।

ঠাকুরবাড়ী ও গোপেশ্বর শিব

বিশ্বকোষ মতে ঢাকা দক্ষিণ শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ও গুপ্তবৃন্দাবন বলে কথিত। ঢাকা দক্ষিণ শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জন্মস্থান ও তাঁর পিত্রালয়। উপেন্দ্র মিশ্রের বাসভবনই এখন বৈষ্ণব তীর্থরূপে পরিগণিত। জগন্নাথ মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রদ্যুম্ন মিশ্রের প্রণীত 'কৃষ্ণচৈতন্যো-দয়াবলী' গ্রন্থে লিখিত আছে যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর পিতামহীর আগ্রহে ঢাকাদক্ষিণে আগমন করে তাঁর বাসনা পূর্ণ করেন ও তাঁকে দুটি মূর্তি দেন—একটি কৃষ্ণমূর্তি, অপরটি তাঁর নিজের।

ঢাকা দক্ষিণে রথযাত্রা ও ঝুলনোৎসব জাঁকজমকের সঙ্গে হয়ে থাকে।

এছাড়া ঢাকা দক্ষিণে প্রসিদ্ধ 'গোপেশ্বর শিব' আছেন—ঠাকুরবাড়ি থেকে তা প্রায় দুই ক্রোশ দূরে। কৈলাস নামে ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর শিবালয়। চৈতন্যদেব এই শিবদর্শনে গিয়েছিলেন বলে গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কৈলাসের পাশে অমৃতকুণ্ড ছিল, বর্তমানে বিলুপ্ত।

পণাতীর্থ ও শ্রীঅদ্বৈতের আখড়া

অদ্বৈতাচার্যের জন্মস্থানের সন্নিধানে পণাতীর্থ বিরাজিত। সুনামগঞ্জ থেকে পণাতীর্থ যাওয়া সুবিধাজনক। 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থে লিখিত আছে যে একদা অদ্বৈত জননী নাভা দেবী স্বপ্নে দর্শন করেন যে তিনি নানা তীর্থজলে স্নান করছেন। অদ্বৈতাচার্য যোগবলে তীর্থসমূহকে আকর্ষণ করে লাউড়ের একটি ক্ষুদ্র শৈলের উপরে আনয়ন করেন। ঐ শৈলখণ্ডের একটি ঝরণা তীর্থবারিতে পূর্ণ হয়ে ঝর ঝর করে পড়তে লাগল। অদ্বৈত জননী তাতে স্নান করে পবিত্রা হলেন। অদ্বৈতের মতো তীর্থসমূহও পণ করেছিল যে, প্রতি বারুণীতে এস্থলে তাদের আগমন হবে। 'পণ' শব্দ থেকে পণাতীর্থ নাম হয়েছে। পণাতীর্থে বারুণীযোগে বহুলোকেব সমাগম হয়। আশ্চর্য এই যে, শঙ্খধ্বনি বা উলুধ্বনি করলে বা করতালি দিলে পাহাড় থেকে তীব্রবেগে জলরাশি পড়ে।

প্রভু কহে—দেখ মাতা সদা জল ঝরে
শঙ্খ আদি ধ্বনি কৈলে বহুজল পড়ে।

একটি প্রচীন গৃহের ধ্বংসাবশেষ অদ্বৈতের বাড়িরূপে নির্দেশিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে অদ্বৈতের আখড়া স্থাপিত হয়েছে, বারুণীপর্বে বহুলোক সেখানে যায়।

নির্মাই শিব

বালিশিরা পরগণায় এই শিব অবস্থিত—নাম বাণেশ্বর শিব, কিন্তু সাধারণতঃ নির্মাই শিব নামে পরিচিত। কথিত আছে নির্মাই ও হর্মাই নামে ত্রিপুরার রাজবংশীয় দুই রূপবতী কন্যা পিতার আদেশে বিবাহে সম্মত না হওয়ায় তিরস্কৃত হন। নিরাশ্রয়া ভগ্নীরা বালিশিরা পাহাড়ে আসেন। এখানে বাস করে শিবস্থাপনা পূর্বক তার অর্চনায় জীবনপাত করেন। জ্যেষ্ঠা নির্মাইর নামানুসারে তৎপূজিত শিব নির্মাই শিব নামে খ্যাত। সাতগাঁও রেলস্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে নির্মাই দিঘির তীরে শিবমন্দির। কয়েকমাইল দূরে 'হর্মাই দিঘি' নামে একটি জঙ্গলাবৃত দিঘি আছে। বারুণী ও অশোকাষ্টমীযোগে এখানে প্রচুর লোক সমাগম ঘটে।

ঊনকোটি তীর্থ

ঊনকোটি পার্বত্য ত্রিপুরার অন্তর্গত—এই তীর্থ ও শ্রীহট্টবাসীর তীর্থ। টিলাগাও স্টেশন থেকে কয়েক মাইল দূরে ঊনকোটি।

ঊনকোটি তীর্থে কোনরূপ পূজার প্রথা নাই—কারণ দেবতাগণও পূর্ণাঙ্গ নয়। রাজমালায় লিখিত আছে যে ত্রিপুরার মহারাজ বিজয়মাণিক্য ঊনকোটি দর্শনে গমন করেছিলেন।

সিদ্ধেশ্বর শিব

চাপঘাট পরগণার অন্তর্গত শ্রীগৌরী মৌজার তিনমাইল পূর্বে শ্রীহট্ট কাছাড়ের সীমামধ্যে এই শিব স্থাপিত। বারুণী উপলক্ষে এখানে পনেরো দিন ধরে মেলা হয়ে থাকে। বদরপুর স্টেশন থেকে শিবের বাড়ি যাওয়ার বিশেষ সুবিধা। ঊনকোটি তীর্থমাহাত্ম্য নামক হস্তলিখিত গ্রন্থের মতে এই শিব কপিলমুনি কর্তৃক স্থাপিত ও পূজিত হয়। বায়ুপুরাণের মতেও এস্থান কপিলতীর্থ ও শিবপূজিত। বায়ুপুরাণে 'বরবক্র মাহাত্ম্য' নামে একটি অধ্যায়ে ঐ পুণ্যদ নদীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। মনু নদীর মাহাত্ম্যও শাস্ত্রে কথিত হয়। যে স্থানে বরবক্রের সঙ্গে মনু মিলিত হয়েছে সে স্থান বহু পুণ্যদ বলে খ্যাত।

হাটকেশ্বর শিব

মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রোক্ত শিবের শতনামে লিখিত হয়েছে—নকুলেশঃ কালীপীঠে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ। দেবীপুরাণোক্ত পীঠপূজায় আছে 'শ্রীহট্টে হট্টবাসিন্যৈ নমঃ'।

শ্রীহট্টের রাজা গৌড়গোবিন্দ হাটকেশ্বর শিবের পূজা করতেন। মিনারের টিলা বা কাছাকাছি কোনো টিলাতে হাটকেশ্বর স্থাপিত ছিলেন। শাহজলালের আক্রমণের সময় যখন প্রসিদ্ধ গ্রীবাপীঠ সংগোপন করা হয় তখন রাজপূজিত হাটকেশ্বর জঙ্গলে নীত হন। বহুকাল হাটকেশ্বর জয়ন্তীয়ায় ছিলেন; সেখান থেকে চূড়খাই পরগণার সেনগ্রামে নীত হন। বারুণী উপলক্ষে এখানে একটি মেলা হয়ে থাকে।

তুঙ্গেশ্বর মহাদেব

খোয়াই নদীর তীরে এই বৃহৎকায় শিব বিরাজিত। শায়েস্তাগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে এখানে যাওয়া যায়। কথিত হয় যে দেবীর নয়টি অঙ্গুরীয়ক এখানে পড়েছিল এবং এজন্য তুঙ্গেশ্বর নবরত্ন উপপীঠ বলে খ্যাত।

প্রায় নশো বছর আগে রাঢ়দেশ থেকে শম্ভুনাথ বাচস্পতি সপরিবারে তবফে এসে বাস করেন। তাঁর একটি কপিলা গাভী প্রতিরাত্রে একটি মৃত্তিকা স্তূপের উপর দুগ্ধবর্ষণ করতো। ওইস্থান খুঁড়ে একটি অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত শিবলিঙ্গ পাওয়া গেলে বাচস্পতি সেই শিব ও প্রস্তরপীঠ নিজ বাড়ির সন্নিকটে স্থাপন করেন। তুঙ্গনাথ বর্ধনশীল শিবলিঙ্গ, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে। বর্তমানে এই শিবলিঙ্গ প্রায় তিনহাত উঁচু ও পাঁচহাত পরিধিবিশিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

ব্রহ্মকুণ্ড ও তপ্তকুণ্ড

ব্রহ্মকুণ্ড পার্বত্য ত্রিপুরার অন্তর্নিবিষ্ট হলেও শ্রীহট্টের লোকেরই তীর্থ। মনতলা স্টেশন থেকে এস্থানে যাওয়া যায়। ব্রহ্মকুণ্ড একটি পার্বত্য উৎস। আসামের সদিয়ার পূর্বে ব্রহ্মকুণ্ডে পরশুরামেব হাতের কুঠার পরিত্যক্ত হয়। পথে এইস্থানে এসে তিনি মাটিতে কুঠারাঘাত করেছিলেন, এবং তাতে এই কুণ্ডের উৎপত্তি হয় বলে কথিত আছে।

কুণ্ডের আকৃতি ক্ষেপনী বা প্যারাবোলার ন্যায়। কুণ্ডের পশ্চিম সীমা সরলরেখা বিশিষ্ট। পূর্ব তীর দিয়ে এক সংকীর্ণকায় জলপ্রণালী কলকল রবে ব্রহ্মকুণ্ডে আত্মসমর্পণ করছে। এর তীরভূমি আন্দাজ ২০ ফিট এবং জলভাগের পরিমাণ অন্যূন ২৫৩০ বর্গফিট হবে। চৈত্রমাসের শুক্ল অষ্টমীতে লোকে এই কুণ্ডে স্নান কবে। স্নানান্তে যাত্রীগণ কৃষ্ণপুরের মন্দিবে যায়। ব্রহ্মকুণ্ডে যাত্রী কবুতর, ছাগ ও ফলমূলাদি অর্পণ করে থাকে।

জয়ন্তীয়ার পাঁচভাগ পরগণাস্থিত তপ্তকুণ্ডে মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী যোগে অনেক লোক তর্পণাদি করতে সমাগত হয়। এই কুণ্ডের ভূমি অতি উচ্চ।

মাধবতীর্থ ও শিবলিঙ্গ তীর্থ

পূর্বে মাধবপ্রপাতের উল্লেখ করা হয়েছে। মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশীযোগে এখানে ৮।৯ হাজার লোক স্নানতর্পণ করে থাকে। মাধব পাথারিয়া পরগণার অন্তর্গত। বড়লিখা স্টেশন থেকে তিন মাইলের বেশি দূর নয়।

আদম আইল পাহাড়ের মাধবছড়া পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হযে, হঠাৎ উঁচু পাহাড় থেকে নিচে পড়ে যাওয়ায় এক বৃহৎ কুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। মাধবকুণ্ড থেকে প্রায় এক মাইল উপরে এক সুবৃহৎ পাষাণখণ্ড আছে—তার এক পাশ দিয়ে জল ভয়ে ভয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে ও

একেবারে সজোরে সেই পাথরের সম্মুখে এসে এক কুণ্ড প্রস্তুত করেছে। এর পরিসর বৃহৎ না হলেও গভীর। এরকম ছ-টি শিলা ও তার নিচে ছ-টি কুণ্ড সেই স্রোতবক্ষে দেখা যায়— ছ-টি কুণ্ডই পাহাড়ের উপরে। এরপর সপ্তম কুণ্ড— যাত্রীরা এখানে স্নানাদি করে থাকে। সেই পূর্বোক্ত স্রোত বা ছড়াটি শৈলগাত্রে পাথরের উপর দিয়ে চলে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে হঠাৎ উঁচু পাহাড় থেকে একেবারে নিচে পড়ে গেছে, পাহাড়ের গা বেয়ে পড়েনি। যেখানে জলরাশি পড়ছে তার চারিদিকে উঁচু পাহাড় শ্রেণী, মধ্যদেশ একটি গুহা বিশেষ। দৈর্ঘ্যে সিকি মাইলের বেশী হবে না। এরমধ্যে কতকটা স্থানব্যাপী এক বৃহৎ কুণ্ড— জল ভাগ প্রায় ৫০০০ বর্গফিট হবে। এরই নাম মাধবকুণ্ড— মধ্যদেশ অতি গভীর। ধারাটির জলপতনবেগ প্রচন্ড, এর একপাশে একটি গহ্বর আছে— যেন একটি একচালা ঘর, বৃষ্টির সময় প্রায় দুশ লোকের সমাবেশ হতে পারে এখানে।

প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে শিবলিঙ্গ তীর্থ বিশেষ দর্শনীয় স্থান। এটিও আদম আইল পাহাড়ে অবস্থিত, বড়লিখার সন্নিকটবর্ত্তী। এস্থানের প্রধান দৃশ্য 'শিবের জটা'। প্রস্তরময় পর্বতগাত্র থেকে প্রকৃত জটার ন্যায় ৩|৪টি জটা বার হয়েছে, এবং ঐ নিরেট প্রস্তরময় জটা থেকে বিন্দু বিন্দু জল ক্ষরিত হয়। এখানে উপস্থিত হয়ে বম্ বম্ শব্দ করে লোকে হাততালি দেয় এবং তাতে অধিক পরিমাণে জল বার হয়। যাত্রিকেরা সেই জল ভক্তিভরে শিরে ধাবণ করে।

বাসুদেবের বাড়ি

হিন্দু রাজত্বের সময়ে পঞ্চখণ্ডের সুপাতলা গ্রামে দুর্গা দলই নামে জয়ন্তীয়া রাজের এক কর্মচারী বাস করতেন। তাঁর বাড়ির সামনে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী খনন কবার সময মাটির নিচে বাসুদেবের প্রস্তরময় মূর্তির সঙ্গে একখানা দুর্গামূর্তি পাওয়া গেল। কথিত আছে দুর্গা দলই এই দেবীমূর্তিকে জয়ন্তীয়ায় পাঠিয়ে দেন এবং বৈষ্ণবধর্মে রাজাদের আস্থা নেই বলে বাসুদেবমূর্তি বিজয়কৃষ্ণ পাঠক নামক এক ব্রাহ্মণকে দেন। বাসুদেবের নামে ঐ স্থানকে বাসুদেবপুর বলা হয়। লাতু স্টেশন থেকে এই স্থান প্রায় ছয় মাইল দূরবর্ত্তী।

কৃষ্ণবর্ণ পাথরের অতি সুন্দর বাসুদেব মূর্তি দুপাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জগন্নাথপুরের বাসুদেব মূর্তি ও পঞ্চখণ্ডের বাসুদেবমূর্তি ঠিক এক রকম। জগন্নাথপুরের বাসুদেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জগন্নাথ বিপ্র কর্তৃক পরিপূজিত হন।

আখড়া

শ্রীহট্ট জেলার সকল আখড়ার মধ্যে জগন্মোহন সম্প্রদায়ের বিথঙ্গলের আখড়াই বৃহৎ। কিন্তু সেখানে কোনোরূপ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত নেই। শ্রীহট্ট শহরের উপকণ্ঠে যুগলটিলা নামে আর একটি প্রসিদ্ধ আখড়া আছে। প্রায় তিনশ বছর আগে ঠাকুর যুগল নামক সিদ্ধপুরুষের দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দেশ্বর পরগণার পাণিশালির আখড়াও বিশেষ বিখ্যাত। এ দুটি আখড়ায় ঝুলন উৎসবে ঘটা হয়।

মুসলমান তীর্থ

মুসলমান তীর্থ মধ্যে শ্রীহট্ট সহরের দরগামহল্লাস্থিত প্রসিদ্ধ শাহজালালের দরগাই উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দরগা ও মোকামের মধ্যে আছে—লাউড়ে শাহ আরপীনের মোকাম বা বড় দরগা; ফতেপুরে ফতেগাজীর মোকাম (ইনিও শাহজালালের সঙ্গী ছিলেন, দরগার পীরোত্তর ভূমি আছে এবং অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিনে মেলা বসে); গিয়াসনগরে গিয়াসউদ্দিন সাহেবের দরগা, বদরপুরে শাহবদরের মোকাম, চাপঘাটে গয়ভীর মোকাম, লস্করপুরের দরগা প্রভৃতি। প্রতাপগড় পরগণায় জঙ্গলের ভিতর ছাগলমোহার মোকাম বিশেষ বিখ্যাত। এটি বাদশাহব মোকাম বলেও কথিত হয়। সহিজা বাদশাহকে বনের অধিষ্ঠাতা দেবতা বলে লোকে মনে করে। পাহাড়ের লাকড়ি ব্যবসায়ী হিন্দুমুসলমান সবাইকে প্রথমে এই মোকামে গিয়ে বাদশাহকে প্রণাম করতে হয়।

দ্বিতীয় ভাগ

ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত

প্রথম খণ্ড—হিন্দু প্রভাব
(প্রাচীনত্ব)

অধ্যায় ১. প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য
২. ভাটেরার তাম্রশাসন
৩. বৈদেশিক উল্লেখ
৪. ত্রিপুর বংশীয় রাজগণ
৫. শ্রীহট্টে সাম্প্রদায়িকগণ
৬. মুসলমান আক্রমণ

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম খণ্ড— হিন্দু প্রভাব

(প্রাচীনত্ব)

ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত

১. প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য

শ্রীহট্টের ভূতত্ত্ব বিচার করলে প্রতীয়মান হয় শ্রীহট্ট অতি প্রাচিন দেশ। পূর্বকালে শ্রীহট্টের সমস্ত পশ্চিমার্ধভাগ গভীর জলতলে নিমজ্জিত ছিল। এই নদীগুলির দ্বারা প্রবাহিত মৃত্তিকায় কতকালে তা উচ্চভূমিতে পরিণত হয়েছে কে জানে?

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "এক সময়ে কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্বে করতোয়া ইহার সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্তীয়া, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল।

জাতিতত্ত্ববারিধি গ্রন্থের ২৬০ পৃষ্ঠাতে লিখিত হয়েছে 'ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশের এবং ত্রিপুরা প্রভৃতি কিরাত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; এক্ষণে এই সকল স্থানও পূর্ববঙ্গ বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছে।"

যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, শ্রীহট্ট কামরূপেরই অন্তর্গত ছিল এবং শ্রীহট্টের যে সীমা লিখিত হয়েছে তাতে সেকালে শ্রীহট্ট স্বল্পায়ত ছিল এমন বলা যায় না। কামাখ্যাতন্ত্রে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত যে সপ্ত পর্বতের উল্লেখ আছে তাতে জয়ন্তী, কাছাড়, মণিপুর, মগধ ইত্যাদি নাম দেখা যায়। প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি ভগদত্ত এই বিশাল দেশ শাসন করতেন। যুগবিপর্যয় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ভগদত্ত রাজার নাম আজো শ্রীহট্টে জনশ্রুতি মুখে শোনা যায়। শ্রীহট্টের লাউড় পর্বতে তাঁর (এ দেশ শাসনের জন্য) রাজধানী ছিল।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ ত্রিপুরার ইতিহাসে লিখেছেন 'তরফ, শ্রীহট্ট, লাউড় প্রভৃতি স্থানে, যে সকল রাজবংশ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন, তাহারা অপ্রাচিন নহেন।'

২. ভাটেরার তাম্রশাসন

শ্রীহট্টের প্রাচীনত্বের একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন ভাটেরার তাম্রশাসন।

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত ভাটেরা নামক স্থানের একটি টিলা 'হোমের টিলা' বলে কথিত হয়। পবম্পরাগত ঐ নাম চলে আসছে। ১২৭৯ বাংলায় ওখানকার জমিদার জগচ্চন্দ্র দেবচৌধুরীব অনুমতি মতে কোনো কার্যবশতঃ শেখ কটাই নামক এক ব্যক্তি ঐ স্থান খনন করায় এক ইষ্টকমন্দিরেব ভিত্তি ও আটফিট মাটির নিচে দুখানা তাম্রপত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীহট্টের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার মিঃ লটমন জনসন সাহেব প্রথমে এগুলি পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে প্রদর্শন কবেন। এই মহাবাষ্ট্রীয় পণ্ডিত তখন শ্রীহট্টে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই প্রথম পাঠোদ্ধার করেন।

উভয় প্রশস্তিই উপরে ছিদ্র বিশিষ্ট সমচতুষ্কোণ তাম্র ফলকে খোদিত। কেশবদেবের প্রশস্তি ১২$\frac{১}{২}$ × ১১ ইঞ্চি ও ঈশানদেবের প্রশস্তি ৮ × ৬$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি আকার বিশিষ্ট এবং যথাক্রমে উভয় তাম্রপত্রে ২৭ + ২৮ ছত্র এবং ১৬ + ১৬ ছত্র অক্ষর অঙ্কিত আছে। প্রশস্তিদ্বয়ের অক্ষর দেবনাগরী।

এই প্রশস্তিদ্বয়ে এক রাজবংশের উল্লেখ ও পাঁচজন মাত্র রাজার গুণকীর্তি কথিত হয়েছে। প্রশস্তিদ্বয় পাঠে এমন বোধ হয় না যে এঁরা কোন সম্রাটকল্প নৃপতির অধীনে করপ্রদ রাজা ছিলেন। এঁবা ক্ষমতায় নিজ রাজ্যে স্বপ্রাধান্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং পার্শ্ববর্তী কোন কোন ক্ষুদ্র রাজ্যকে পরাভূত করে আপনাদের অধীনে রেখেছিলেন বলে জানা যায়।

উভয় প্রশস্তি আলোচনায় নিম্নলিখিতরূপ বংশ তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে।

প্রথম— নবগীর্বান
|
তৎপুত্র — গোকুল দেব
|
তৎপুত্র — নাবায়ণদেব
|
তৎপুত্র — কেশবদেব
|
তৎপুত্র — (৩য় পুত্র) ঈশানদেব

এই রাজগণ চন্দ্রবংশীয় ছিলেন, এদের পূর্বে কে বাজা ছিলেন, এবং পরেই বা কারা তাঁদের সিংহাসন গ্রহণ করেছিলেন তা জানবার কিছুমাত্র উপায় নেই। সুতরাং এই প্রশস্তিদ্বয় 'শ্রীহট্ট ইতিহাসের একটি ছিন্ন পৃষ্ঠা' বলে উল্লেখ করলে অসঙ্গত হয় না। যা হোক, প্রশস্তিদ্বয়ের সাবমর্ম সংক্ষেপে নিম্নে একত্র করা গেল।

রাজশ্রেষ্ঠ নবগীর্বান প্রভাবশালী ও ধনুর্বিদ্যা বিশারদ ছিলেন, তার প্রতি কমলার বিশেষ অনুকম্পা ছিল।

বর্তমান রাজার পিতামহ গোকুল দেব তাঁরই পুত্র। গোকুলদেবের বীরত্ব গৌরব শত্রুদের উৎসাহ শিথিল ও জড়ভাবাপন্ন করেছিল।

তৎপুত্র নারায়ণ দেব। মন্দরমথিত সমুদ্র হতে যেমন লক্ষ্মী উদ্ভূতা হয়েছিলেন, তদীয় শরমথিত প্রতিপক্ষ নৃপতিসমুদ্রের মধ্যে হতে তিনিও উন্নতমস্তকে বার হয়ে আসতেন।

তৎপুত্র কেশবদেব। তিনি অশেষ গুণকীর্তিযুক্ত; তাঁর পাদপীঠ রাজগণের মুকুটমণি দ্বারা শোভিত, তিনি রাজগণের মধ্যে ভূষণস্বরূপ এবং কংস-বিজেতা গোবিন্দের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী বিনাশক।

তিনি মনুষ্যত্বের সীমাভূমি-স্বরূপ, যশের আবাসস্থান স্বরূপ, সৌন্দর্যের আশ্রয় স্বরূপ, সর্বপ্রকার সুশিক্ষার আধার স্বরূপ, এবং ন্যায়ের আশ্রয় ও বদান্যতা, বাগ্মিতা, ভদ্রতা প্রভৃতি সর্বসদগুণের আকর বা প্রতিমূর্তি স্বরূপ।

তিনি অস্ত্র সাহায্যে অধীন নৃপতিবর্গকে রক্ষা করেন। এবং শত্রুকে চক্রান্তে বিঘূর্ণিত করেন।

তিনি (নিকটে) রাজ্যান্তর-দর্শনে অনিচ্ছুক হয়ে অস্ত্রসাহায্যে পৃথিবীকে একছত্রাধীন করেছিলেন।

তদীয় কর কল্পপাদপের, শৌর্য সূর্যের, যশ চন্দ্রের এবং বাহুবল পৃথিবীর পুনঃস্থাপনে নিযুক্ত; তাঁর চক্ষু আকর্ণ-বিস্তৃত।

তদীয় তরবারি দ্বারা চতুর্দিক বিজিত হয়েছে, প্রাচ্য রাজগণের মধ্যে তিনিই প্রধান।

তদর্জিত চন্দ্রকরোজ্জ্বল যশে পৃথিবী শুভ্র, শত্রুরূপী পদ্ম মুদ্রিত ও সুভোগরূপী কুমুদ প্রফুল্লিত হয়েছে।

তদীয় তেজ নির্ধূম বহ্নির ন্যায় প্রোজ্জ্বল,— শত্রুর নয়নবারিতে তা নির্বাপিত হবার নয়। এই অগ্নি পৃথিবীর চতুর্থাংশ আচ্ছাদিত করেছে।

এই রাজা কোন যুদ্ধে দুই শ্রেষ্ঠ নৃপতিমধ্যে একজনকে ধনুর্গুণে ও অপরকে স্বীয় মহিমায় বশীভূত করেন।

ফুল্ল চন্দ্রকিরণের ন্যায় তদীয় গৌরব পৃথিবী প্লাবিত করে' সমুদ্র পার হয়ে গেছে।

তাঁর ভক্তিতে অনাদি লিঙ্গরূপী ভগবান বটেশ্বর কৈলাস পরিত্যাগ করে হট্টপাঠকে বাস করছেন।

পার্শ্ববর্তী নৃপতিগণের মুকুট-চুম্বিত-পাদপীঠ, রাজচূড়ামণি কেশবদেব তাঁর প্রীত্যর্থে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হতে ৩৭৫ হাল ভূমি ও ২৯৬ বাড়ী দান করেন।

তিনি শিবানুরক্ত এবং শ্রীহট্টনাথ শিবকে বহুতর ক্রীতদাস এবং নানা জাতীয় ভৃত্য দিয়েছেন। এই ভূমি ২৩২৮ পাণ্ডব কুলাধিপালাব্দে প্রদত্ত হয়।

দ্বিতীয় প্রশস্তিখানা ঈশানদেবের ভূদান সম্বন্ধীয়। তাতে গোকুল দেব থেকে বংশাবলী আরম্ভ হয়েছে এবং প্রথমে নারায়ণের স্তুতিগান আছে। দ্বিতীয় প্রশস্তির সারমর্ম—

চন্দ্রবংশাবতংস গোকুল দেবের জন্ম জন্য তদ্বংশ উজ্জ্বল হয়েছিল; তিনি প্রার্থীর পক্ষে কল্পপাদপসদৃশ ও পৃথিবীর শান্তিদাতা সংরক্ষক ছিলেন। নারায়ণদেব তাঁর পুত্র। শস্ত্রসাগরে মন্দর ভূধরের ন্যায় তিনি গর্বোন্নত ছিলেন; তাঁর আকৃতি মাধুর্যময় ছিল।

তিনি কলাবিদ্যানিপুণ ও ধীর, বিনীত ও শৌর্যশালী, সভ্য ও সাহসী এবং ভব্য ও বিশ্বভূষণ স্বরূপ ছিলেন।

সাহসের প্রতিমূর্তি কেশবদেব তাঁর পুত্র। তিনি গোবিন্দের (কৃষ্ণের) ন্যায় শত্রু বিমর্দক ছিলেন, তাঁর পাদপীঠ রাজগণের মুকুটরত্নে ভূষিত হত।

তাঁর গুণকীর্তি শ্রবণে যেসব বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ আগমন করতেন অভীষ্ট লাভে কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁরা নিজেদের জন্মস্থান ভুলে যেতেন।

তাঁর শাসনকালে পার্শ্ববর্তী রাজগণ নিজ ধনরত্ন কখন তাঁকে উপহার দিতে পারবেন, এই চিন্তায় বিনিদ্র থাকতেন।

অসংখ্য পদাতিক, সমর তরি, তুরঙ্গ সেনা ও রণমাতঙ্গের অধিপতি সেই মহারাজের কুন্দকুসুমশুভ্র যশে পৃথিবী গৌরবান্বিত হয়েছিল।

তিনি কংসনিসূদনকে এক আকাশস্পর্শী মেঘবিদারী উচ্চচূড় প্রস্তর মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

তিনি 'তুলাপুরুষ' দান করেছিলেন; তাতে ব্রাহ্মণেরা এত ধন লাভ করেছিলেন যে, তাঁরা সুবর্ণ ও রত্নাদিতে আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় তিনি কল্পবৃক্ষের সদৃশতা প্রাপ্ত হন।

শম্ভুনন্দন কার্ত্তিকেয়ের ন্যায়, রাজ-কুল-শশী ঈশানদেব তাঁর পুত্র।

যখন তাঁর পদাতিক, তুরঙ্গ সেনা ও রণমাতঙ্গ জয়ার্থ বহির্গত হয়, তখন ধূলিরাশিতে সূর্যরশ্মি আচ্ছাদিত হয়ে থাকে।

(জলপথে) পালভরে প্রধাবিত তদীয় (সসৈন্য) সমর তরির গতিবেগে উত্থিত জলরাশি চারদিকে (স্থলদেশ পর্যন্ত) এতদূর বিকীর্ণ হয় যে (তা শরীরে সংলিপ্ত হওয়ায় তীরস্থিত) রৌদ্রতপ্ত তদীয় রথাশ্বগণ ক্লান্তি দূর করে থাকে। (অর্থাৎ উৎক্ষিপ্ত বারিকণা তীরস্থিত অশ্বগুলির দেহস্পর্শ করায় তারা স্নিগ্ধতা অনুভব করে।)

এই গৌরবান্বিত রাজা মধুকৈটভারির জন্য অভ্রভেদী যে এক মন্দির নির্মাণ করেছেন, এর ধ্বজা কোন বায়বীয় বৃক্ষের কুসুমের ন্যায় বোধ হয়।

বৈদ্যকুলপ্রদীপ বনমালী কর তাঁর মন্ত্রী।

এঁরই সুমন্ত্রণায় গৃহ ও শস্যশোভিত দুই হাল ভূমি রাজকর্তৃক (মধুকৈটভারির তুষ্টির জন্য) প্রদত্ত হয়।

এই সম্প্রদান, পুত্রহীন স্থবির রাজপুত্র এবং মৃত রাজপুত্রের কুলপালিকা পত্নী ও বালক তনয় কর্তৃক স্বীকৃত হয়।

যাঁর যশ পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছে, সেই ক্লেশ সহিষ্ণু, সাহসী, সমরপ্রবীণ সেনাপতি বীরদত্ত কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়।

দাস বংশাবতংস সুবিদ্বান মাধব ১৭ সংবতীয় ১ বৈশাখে এই প্রশস্তি রচনা করেন।

প্রশস্তিদ্বয়ে দাতব্য ভূমির সীমাদি নির্দেশ উপলক্ষে বহুতর অধুনালুপ্ত প্রাচীন গ্রাম ও নদী ইত্যাদির নাম কথিত হয়েছে; কয়েকটি নাম দেওয়া হল—

অথিন হাটকে, অনীকাথী, অনিঘনাকোণার্ক, অথনাটভবিক, আখানিকৃত, আথাবী, আয়তনীক, উগডাট, উপপথ, কডডিয়া, কাটাবাঙ্গুতে, কানিয়ানী (নদী), কতীমুত্তাক, কৈবাম, গৃড্ডভাটপড়া, গুড়াবয়ী, গোবামী, গোপথ, গোস্যয়া, ঘটীভূ, চাটপড়াদেবসত্র, জোগাবনিয়া, থাগন, দেগিগান, ধনকুণ্ডটী, নবভাট, নডকুটীগ্রাম, নবছাদি, নবপঞ্চাল, নাটয়ান নেন্‌বতাগ, পাছানিয়া অথানি, পাকাদি, পিস্ত্রাপিনগর, ববণী, বরপঞ্চ, বদবমা, বডগ্রাম, বাঙ্গুত, বাড্ডা, বালুসীগাম, বেদাম্বুদি, বোবতুছানি, বোংবাকটায়ি, ভাটপড়া, ভাস্কর টেঙ্করী, ভোগডত্তাকনি, মহবাপুর, বিথাযীনগর, যোড়াতিথার্ক, শবগানদী, শিড্ডব, সনাগজদাক, সিহাডবগ্রাম, হট্টবর, হটীথানক, হট্টপাঠক, হড্ডিপগৃহ, হুহুকমহাসাহ।

প্রশস্তিদ্বয় থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জ্ঞাত হওয়া যায়;

১. প্রশস্তিবর্ণিত রাজবংশাবলীর রাজগণ চন্দ্রবংশসম্ভূত ছিলেন।

২. এঁরা সকলেই, বীর, দাতা ও যশস্বী।

৩. নবগীর্বান নামটি পৌরাণিক যুগেরও পূর্ববর্তী বোধ হয়। তাঁর ও গোকুলদেবের শাসনকাল শান্তিপূর্ণ হলেও নারায়ণদেবের শাসনকালে শত্রুগণের উৎপাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি শত্রুসাগরে মন্দরগিরির ন্যায় অটল ছিলেন।

৪. কেশবদেব পার্শ্ববর্তী রাজগণকে পরাস্ত করে করপ্রদ করেন।

৫. শ্রীহট্টে সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজ্য ছিল— তিনি তার মধ্যে সার্বভৌম নৃপতিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৬. তিনি ভগবান গোবিন্দের ন্যায় শত্রু-বিমর্দক ছিলেন।

৭. তাঁর সৈন্য বাহিনী পুরাকালীন চতুরঙ্গ বিশিষ্ট ছিল।

৮. তিনি শিবভক্ত হলেও প্রস্তরময় বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

৯. তিনি শাস্ত্রোক্ত 'তুলাপুরুষ' দান করেছিলেন।

১০. দূরদেশ থেকে ব্রাহ্মণগণ তাঁর সভায় সমবেত হতেন।

১১. এই রাজাদের সমর তরি ছিল অর্থাৎ জলযুদ্ধ করতে হত।

১২. ঈশানদেবের সময়েও প্রাচীন যুদ্ধরথ ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩. ঈশানদেব বিষ্ণু উপাসক ছিলেন।

১৪. বৈদ্যবংশীয় বনমালী কর ঈশান দেবের মন্ত্রী ছিলেন। বৈদ্য প্রাচীন জাতি— কর উপাধিও আধুনিক নয়। সেনাপতি ছিলেন বীরদত্ত। শূদ্রজাতীয় মাধবদাস তাঁর প্রশস্তি রচনা করেন। দেবদত্ত, বীরদত্ত, মাধব, গোবিন্দ, নারায়ণ ইত্যাদি নাম যেমন প্রাচীন পৌরাণিক যুগে দৃষ্ট হয় বনমালী নাম আপাততঃ সেরকম বোধ হয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের 'বনমালী' নামটি আধুনিক নয়। ঈশানদেবের সময়ে শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র জাতীয় লোকের বিদ্যমানতা দেখা যায়।

১৫. ঈশানদেবকে কেশবদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র বিবেচনা করা যায় না। ভূদান কালে তাঁর সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্থবির ও পুত্রহীন ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করেন।

১৬. দ্বিতীয় প্রশস্তি লিখিত ভূদান কালে কেশবদেবের মধ্যম পুত্রও জীবিত ছিলেন না— তিনি বিধবা পত্নী ও শিশুপুত্র রেখে পরলোকবাসী হন।

১৭. এঁর মৃত্যুর পরে সর্বকনিষ্ঠ ঈশানদেব রাজকার্য চালাচ্ছিলেন।

১৮. এসময় পিতৃহীন বালকই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন বোধ করা অসঙ্গত নয়। এজন্যই বিধবা মহিষী 'কুল পালিকা' শব্দে বিশেষিতা হয়েছেন; এবং এজন্যই দুই হাল মাত্র ভূমি দান করতেও ঈশানদেবকে স্থবির ভ্রাতা, বিধবা মহিষী ও বালকের অভিমত গ্রহণ-পূর্বক সেনাপতির অনুমোদন কার্য সম্পাদন করতে হয়েছিল।

১৯. প্রশস্তিদ্বয়ে লিখিত ভূমি ভাটেরার চতুষ্পার্শ্ববর্তী ভূমি হওয়াই সম্ভব। প্রথম প্রশস্তিতে প্রায় শতাবধি গ্রাম ও নদী ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সেই প্রাচীন নামগুলির মধ্যে একটি নামের সঙ্গেও ঐ অঞ্চলের গ্রামাদির বর্তমান নামের মিল নেই। অনেকে অনুমান করেন হট্টপাঠক ভাটেরারই প্রাচীন নাম। দক্ষিণ শ্রীহট্টের 'মহরাপুরই' (মৌরাপুর) বোধ হয় প্রশস্তি লিখিত মহরাপুর। 'নবপঞ্চাল' বর্তমান বরমচাল বলে অনুমিত। 'ভাস্কর টেঙ্করী' বর্তমান টেঙ্গরা গ্রামের প্রাচীন নাম কিনা বিবেচ্য। 'গুড়াবয়ী' বর্তমান গুড়াভই হবে বোধ হয়। কানিয়ানী নদী, নাগাই নদী প্রভৃতি নামও বিলুপ্ত। 'ভাটপড়া' গ্রামের উল্লেখ একাধিকবার আছে, সম্ভবতঃ এই গ্রামটি বৃহত্তর ছিল, এটি ভাটেরার পূর্ব নাম কিনা কে জানে? 'গ্রাম' এই গ্রাম্য শব্দেরও ভূরি ব্যবহার পাওয়া যায়। জয়ন্তীয়া পরগণায় গাম শব্দের বহুল প্রচলন।

একস্থানে 'সাগরপশ্চিমে' এইরূপ সীমা নির্দেশ আছে। হাইল হাওর ঘুঙ্গিয়াজুড়ী, কাগাপাশা প্রভৃতি উক্ত সাগরেরই শেষ নিদর্শন। 'সাগর' শব্দ থেকে 'সায়র' হয়ে 'হাওর'।

২০. প্রথম প্রশস্তিতে ২৩২৮ যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং দ্বিতীয় প্রশস্তিতে ১৭ সংবৎ অঙ্কিত হয়েছে। এই প্রশস্তিদ্বয় যে খৃষ্ট জন্মের পূর্বেকার একথা কি বলা যেতে পারে না? প্রায় শতাবধি গ্রামের নামের মধ্যে প্রায় সবকটিই অশ্রুতনামা ও অপরিচিত, এ অল্প আশ্চর্যের বিষয় নয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দানপত্রের লিখিত নামগুলির সঙ্গে বর্তমান কালীয় গ্রামাদির বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। এই প্রশস্তিদ্বয় যে তৎপূর্ব সময়ের তা বলতে আপত্তি কি?

প্রাগুক্ত তাম্রপত্র আট ফিট মাটির নিচে পাওয়া যায়। পাহাড়ের শীর্ষদেশে আট ফিট মাটির স্তর পড়া সহজ কথা নয়।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রশস্তিদ্বয়ের দ্বিতীয় পাঠোদ্ধারক। তিনি শহাজলাল পরাজিত গোবিন্দের সঙ্গে উক্ত রাজা কেশবদেবকে অভিন্ন কল্পনা করে প্রশস্তির কাল নির্ণয় করেন ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ। সেই গোবিন্দেব সঙ্গে কেশবদেবকে অভিন্ন কল্পনা করা ডাক্তার মিত্রের ভ্রম।

নগেন্দ্রনাথ বসু একটি পত্রে লিখেছেন, প্রশস্তিদ্বয়ের অক্ষর খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর অক্ষরের অনুরূপ। প্রশস্তিদ্বয় নাগরাক্ষরে অঙ্কিত হলেও কোন কোন অক্ষর যে বঙ্গাক্ষরের আদিরূপ তা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বঙ্গাক্ষরও নিতান্ত আধুনিক বলতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।

কেশবদেব যে সুদৃঢ় প্রস্তরময় বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তার চিহ্ন কোথায়? শ্রীহট্টনাথের প্রস্তর মন্দিবের ভগ্নাবশেষ কোথায়? শাহজলালের সময়ের অব্যবহিত পরবর্তী মসজিদাদি এখনো ভগ্নস্তূপে পরিণত হয় নি। এ কি প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ নয়?

৩. বৈদেশিক উল্লেখ

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে একজন গ্রীক বণিক সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তার বিষয়ে গ্রন্থ লেখেন। তাতে 'কিরাদিয়া' নামক দেশের উল্লেখ আছে। এই কিরাদিয়া বিষ্ণুপুরাণবর্ণিত পূর্বদিগ্‌বর্তী 'কিরাতভূমি'। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কিরাদিয়া দেশের সীমাস্থানে একটি মেলা হত। ঐ মেলায় উত্তর দেশের তেজপত্র আমদানী হত। চীন দেশবাসীরা রেশমীবস্ত্রের পরিবর্তে তেজপত্র ক্রয় করতো। আরো বর্ণিত আছে যে তারা নতুন দ্রাক্ষাপত্রেব ন্যায় পাটি বিস্তার করে দ্রব্যাদি তাতে রক্ষা করতো।

প্রাচীন কিরাত রাজ্যের সীমাস্থলেই শ্রীহট্টভূমি। অতএব ঐ মেলা প্রধানতঃ শ্রীহট্ট ও কিরাতভূমির লোক নিয়ে বসতো এবং শ্রীহট্টের তেজপত্র বহুল পরিমাণে ঐ মেলায় যেত বলে জানা যাচ্ছে। চীন দেশীয়দের ব্যবহৃত নতুন দ্রাক্ষাপত্রের ন্যায় পাটি সম্ভবতঃ শ্রীহট্টের শীতল পাটি।

হিউএন্‌থসাঙ্‌ ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থান পরিভ্রমণান্তর কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মা কর্তৃক আহূত হয়ে তদীয় রাজ্যে গমন করেন। তিনি লিখেছেন যে, 'সমতট থেকে উত্তর-পূর্বদিকে সাগরপার্শ্বে

পর্বত ও উপত্যকার পরপারে শিলিচটল দেশে আমরা পৌঁছেছিলাম।' হিউএন্থসাঙ্গ এই শিলিচটল পথে কামরূপ গমন করেন। শিলিচটলই শ্রীহট্ট।

ঐতিহাসিক হন্টার সাহেব বলেন, 'শ্রীহট্টের উত্তরদিগবর্তী পর্বতের পাদদেশে সামুদ্রিক শামুকের নিদর্শন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অতি পূর্বকালে ঐ পর্বতের নিচে সমুদ্রবারি প্রবাহিত হত।'

নিঃসংশয়িতরূপে বলা যেতে পারে যে অতি প্রাচীন কাল থেকে শ্রীহট্ট আর্য জাতির শাসনে ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত শ্রীহট্ট যে কামরূপ রাজ্যের অঙ্গ ছিল তা বিদেশীয় ভ্রমণকারীর বর্ণনায় জ্ঞাত হওয়া যায়।

৪. ত্রিপুরবংশীয় রাজগণ

শ্রীহট্টের প্রাচীনত্ব প্রমাণ হলেও বর্তমানে এ জেলা যতদূর বিস্তৃত পূর্বকালে ভূপরিমাণ ততদূর ছিল না। শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ বরবক্র নদের সীমা পর্যন্ত দেশ বহুকাল ত্রৈপুর রাজবংশীয়েব শাসনাধীন ছিল।

প্রাচীন পৌরাণিক যুগে দ্রুহ্যবংশাবতংস ত্রিপুর কিরাতভূমে স্বীয় রাজপাট স্থাপন কবেন। তাঁদের রাজধানী পূর্বকালে কামরূপেব সন্নিকটে 'কোপল' নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। সে প্রাচীন রাজ্যের রাজধানীর নাম ত্রিবেগ। ত্রিলোচন-তনয় দক্ষিণ কোপল বা কপিলা তীববর্তী বাজপাট ত্যাগ করে বরবক্রতীরে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। উক্ত খলংসা রাজধানী মনোমত না হওয়ায় এটিও পরিত্যাগের পরিকল্পনা করা হয। জুজারু ফা রাঙ্গামাটি জয় করে সেখানে এক নতুন রাজবাটী স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু পূর্ব রাজধানী পরিত্যক্ত হওয়ার প্রমাণ নেই। সে রাজধানী কৈলাসহরে নীত হয়েছিল। কৈলাসহরেব প্রাচীন নাম কৈলারগড় ; মুসলমান ঐতিহাসিকেরা একে জাজিনগর নামে আখ্যাত করেছেন।

ত্রিপুর রাজগণের রাজধানী শ্রীহট্টের সমতল ক্ষেত্রেও একস্থানে ছিল না। ত্রিপুরার ইতিহাস প্রণেতা কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখেছেন— 'শ্রীহট্ট জিলার পূর্বপ্রান্তস্থিত বিবিধ স্থানে ইঁহাদেব বাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।' প্রাচীনকালে শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ ত্রিপুর বাজছত্রের ছায়াতলে অবস্থিত ছিল। বরবক্রের দক্ষিণ তীরবর্তী সমগ্র ভূভাগ তাঁদের অধিকারে ছিল বলে জানা যায়। বস্তুতঃ করিমগঞ্জ মহকুমাব অধিকাংশ স্থানই একসময়ে ঐ রাজবংশের বাজ্যান্তর্গত ছিল।

ত্রিপুর রাজবংশের এক প্রধান কীর্তি— পূর্বাঞ্চলে বৈদিক ব্রাহ্মণদের আনয়ন করা। ডুঙ্গুর ফা বা আদিধর্মপা পূর্বপুরুষদের মতো বৈদিক যজ্ঞ করতে কৃত সংকল্প হন। কিন্তু সদ্‌ব্রাহ্মণের অভাব এই সদনুষ্ঠানের প্রধান অন্তরায় হল। সেই সময় গৌড়ভূমিতেই ব্রাহ্মণের অভাব ছিল। বৈদিক সংবাদিনী নামক কুলগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে আদি ধর্মপা স্বীয় মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে মিথিলাধিপতিব কাছে অতি বিনীতভাবে এক পত্র প্রেরণ করে যজ্ঞার্থে পাঁচজন ব্রাহ্মণ প্রেরণের অনুরোধ করেন। মিথিলাধিপ সম্মানিত 'পঞ্চ গৌড়াধিপ' উপাধিব অধিকারী ছিলেন। তিনি পাঁচজন

বেদজ্ঞ বিপ্রকে তদীয় রাজ্যে গমন করতে অনুরোধ করেন। বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর এই পঞ্চগোত্রোৎপন্ন পাঁচজন তপস্বী, যথাক্রমে— শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুষোত্তম, এদেশে আগমন করলেন।

যজ্ঞ সমাপন হলে মহারাজা আদিধর্মপার বিনীত অনুরোধে পঞ্চ তপস্বী তাঁর রাজ্যে বাস করতে স্বীকৃত হন। মহারাজ তাঁদের নিজ রাজ্যে ব্রহ্মত্র ভূমি দান করেন। ঐ ভূভাগের উত্তর ও পশ্চিমে বক্রগামিনী কুশিয়ারা নদী এবং পূর্ব ও দক্ষিণে যথাক্রমে হাঙ্কলা কুকিদের বাসস্থান ছিল; টেঙ্করী নামক কুকি সম্প্রদায় ঐ স্থানে জুম চাষ করতো। ঐ স্থান ব্রাহ্মণদের দান করায় কুকিরা দূর পর্বতে চলে যায় এবং তাদেব পরিত্যক্ত স্থানটি পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় পঞ্চখণ্ড নামে খ্যাত হয়।

তাঁরা এক বছর এদেশে বাস করার পর নিজ নিজ স্ত্রীপুত্রাদিকে আনয়নের জন্য রাজাভিপ্রায় মতে পুনবায় স্বদেশে গমন করেন। তাঁদের বিশেষ অনুরোধে অপর পঞ্চগোত্রীয় অর্থাৎ কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্গুল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম গোত্রীয় সপরিকর পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্যাদিও নাপিতাদি সহ পঞ্চখণ্ডে প্রত্যাবর্তন করলেন।

সমস্ত বঙ্গদেশে রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের স্মৃতি সম্মানিত, সমস্ত বঙ্গদেশ রঘুনন্দনের মতে পরিচালিত, কিন্তু শ্রীহট্টের শাস্ত্রীয় 'ক্রিয়া' মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের মতে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এতেই উপলব্ধ হবে শ্রীহট্টে মৈথিল দ্বিজদের প্রভাব কতদূব বিস্তৃত হয়েছিল এবং কিবকম বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক বিপ্রেরা কান্যকুব্জাগত— এই বিতর্কেব প্রতিকূলে একথাটা প্রবলরূপে দণ্ডায়মান।

৫. শ্রীহট্টে সাম্প্রদায়িকগণ

ধর্মধব (স্বধর্মপা বা ছেংফাচাণ) যখন কৈলাড়গড়ের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বাৎস্যগোত্রীয় নিধিপতি তাঁর সভায় আগমন করেন। ঐ সময় পশ্চিমে নানা উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায় তিনি পূর্বাঞ্চলীয় এই ক্ষমতাশালী রাজার আশ্রয়ে থেকে শান্তিতে স্বধর্ম প্রতিপালনপূর্বক বাস করতে পারবেন এই কল্পনায় এদেশে এসে থাকবেন।

সম্ভবতঃ নিধিপতির উপদেশে মহারাজ ধর্মধর বা স্বধর্মপা পূর্বপুরুষগণের মতো বিশেষ আড়ম্বর সহকারে একটি বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করেন। যজ্ঞ সম্পাদনে নিধিপতির অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকটিত হয়। যজ্ঞান্তে স্বধর্মপা তাঁকে এক বিশাল জনপদ ব্রহ্মত্রস্বরূপ দান করেন। এটি সেকালে মনুকূল প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান ইন্দানগর, ইন্দেশ্বর, ছয়চিরি, ভানুগাছ, বরমচাল, চৌয়ালিশ, সাতগাঁও ও বালিশিরা এই কটি পরগণা মনুকূলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

স্বধর্মপার এই যজ্ঞস্থান কৈলাড়গড়ের রাজবাড়ীর জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশে দেখা যেত— লোকে একে 'হোমের গাত' বলে পবিচিত করে।

নিধিপতি বিস্তৃত ভূখণ্ড প্রাপ্ত হওয়ায় প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। অতঃপর তিনি নিজ ব্রহ্মত্রপ্রাপ্ত ভূমিতে বাস করতে ইচ্ছা করে পঞ্চখণ্ডবাসী বৎস, বাৎস্যাদি অপর ব্রাহ্মণদের ওখানে বাসবাটী প্রস্তুত করতে অনুরোধ করলেন। অনেকে সে অনুরোধে সম্মত হলেন। নিধিপতি তুষ্ট হয়ে তাঁদের সঙ্গে স্বয়ং ওখানে বাড়ি প্রস্তুত করলেন। নিধিপতি ইটোয়া নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। জন্মভূমির নামানুক্রমে তিনি নববসতি স্থানের 'ইটা' নাম রাখেন।

কথিত আছে বাৎস্য গোত্রীয় বিদ্যাবিনোদ নামক জনৈক তপস্বী তাঁর পুরোহিত ছিলেন। তাঁকেও তিনি নবাধিকৃত ইটা দেশে নিয়ে যান। নিধিপতির প্রযত্নে পঞ্চখণ্ড থেকে বহুতর দশগোত্রীয় প্রধান দ্বিজ সে সময় ইটায় গিয়ে বাস করেন। এতে অচিরকালের মধ্যে ইটা সৌষ্ঠবশালী জনপদে পরিণত হয়। এই সময় থেকে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রতিপত্তি হয়। নিধিপতি যে ভূভাগ দান প্রাপ্ত হন তা এক সুবিস্তৃত জমিদারী। সুতরাং নিধিপতি থেকে ইটায় এক ক্ষুদ্র রাজ্যের সূত্রপাত।

৬. মুসলমান আক্রমণ

মহারাজ ধর্মধরের পুত্রের নাম কীর্তিধর (ছেংতুম ফা)। হীরাবন্ত নামে তাঁর জনৈক সামন্ত তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। তাকে ধৃত করবার জন্য সৈন্য প্রেরিত হলে হীরাবন্ত ভয়াতুর হয়ে গৌড়েশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গৌড়াধিপতি আশ্রিতের সাহায্যে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেন। সেই সৈন্যের আধিক্যদর্শনে মহারাজ কীর্তিধর ভীত হয়ে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। পরদিন রাজ্ঞী স্বয়ং গজারোহণে রণসাজে সৈন্যগণ সহ উপস্থিত হলেন। ভীষণ সংগ্রামে শত্রুপক্ষ পরাজিত হল। এই সংগ্রামে রাজ-জামাতা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন বলে তিনি প্রধান সেনাপতির পদে বৃত হন। সেই থেকে ত্রিপুর রাজবংশে রাজজামাতাকে সেনানায়কত্ব প্রদান করার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে।

হীরাবন্তের কাহিনী হীরানন্দের উপাখ্যান স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। হীরানন্দের উপাখ্যান বাবাম্বর নামক প্রাচীন পুস্তকে লিখিত আছে। ১. সে যা হোক, কীর্তিধর মহিষীর উদ্যমে হীরাবন্তের

---

(১) বাবাম্বর একখানি পাঁচালী। শ্রীহট্টবাসী রঘুনাথ নামে কোন কবি এটি রচনা করেন। এর ভাষায় এমন বহু শব্দ আছে যা শ্রীহট্ট ভিন্ন অন্যত্র প্রচলিত নেই। এই গ্রন্থকারও নানা অপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ করেছেন। শ্রীব্রজগোপাল বন্দ্যঘাটী উড়িষ্যাদেশে তালপত্রে লিখিত এই পুথি পেয়ে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত করেন।

শ্রীহট্ট নগরে বাস মগধ নৃপতি
চিরকাল করি তাব রাজ্যের বসতি॥
মোর নাম হীরানন্দ শুন নৃপবর
বাজার ভাণ্ডারে নাই চন্দন চামর॥
আমারে পাঠাইলা রাজা তোমাব এদেশে
চন্দন চামব লইয়া যাইব বিশেষে॥

আশ্রয়দাতা পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু অতি সত্বর গৌড়পতি এর প্রতিশোধ নিতে দ্বিতীয় আয়োজন করেন। এই গৌড় নরপতির নাম গিয়াসউদ্দীন। শ্রীহট্টের পুণ্যভূমি গিয়াসউদ্দীনের সময়েই মুসলমানগণ কর্তৃক স্পৃষ্ট হয়। কেউ কেউ বলেন এই যুদ্ধের পর থেকে রাজপাট কৈলাড়গড় থেকে আধুনিক কসবা নামক স্থানে নীত হয়।

সম্রাট নসিরউদ্দীন কর্তৃক ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এক্তিয়ারউদ্দীন তুগ্রল খাঁ মালিক ইয়াজ বেগ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি উড়িষ্যার রাজার সঙ্গে প্রথম যুদ্ধে কতক কৃতকার্য হলেও তৃতীয় যুদ্ধে ঘোরতর পরাজিত ও পলায়নপরায়ণ হন। তখন আর দক্ষিণদিকে কোন সুযোগ না দেখে তৎপর বর্ষে সসৈন্যে শ্রীহট্টাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর অগণ্য পাঠান সৈন্যের পক্ষে শ্রীহট্টের খণ্ডরাজ্য বিশেষ জয় করা আয়াসসাধ্য হয়নি। জয়ান্তে নগরী বিলুণ্ঠনে তিনি বহু হস্তী ও অর্থলাভ করেন। স্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসে আছে যে, ইয়াজবেগ এই উদ্যমে শ্রীহট্টের আজ্‌মরদন নামক স্থানের অধিপতিকে পরাজিত করেন এবং স্টুয়ার্ট আজ্‌মরদন নগরীকে আজমরগঞ্জ (বর্তমান আজমীবিগঞ্জ) বলে অনুমান করেন। যদিও ইয়াজবেগের সময় শ্রীহট্টের অন্যতম খণ্ডরাজ্য বিনষ্ট হয়েছিল তবু একে শ্রীহট্ট বিজয় বলা যেতে পারে না। পূর্বোক্ত মুসলমান রাজগণ ক্ষণকালের জন্য শ্রীহট্ট আক্রমণ করে কেউ বা পরাভূত কেউ বা দস্যুর মত ধনরত্ন লুণ্ঠন করে চলে গেছেন মাত্র। এই সময় পর্যন্তই গৌরবান্বিত হিন্দুরাজত্বের কাল বলে আমরা নির্দেশ করতে পারি।

দ্বিতীয় ভাগ

দ্বিতীয় খণ্ড— মুসলমান প্রভাব
(গৌড়)

দ্বিতীয় ভাগ

দ্বিতীয় খণ্ড— মুসলমান প্রভাব

(গৌড়)

১. রাজা গোবিন্দ

পূর্বকালে শ্রীহট্ট কয়েকটি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ত্রিপুর রাজবংশের অধিকার একসময়ে বরবক্রের সমস্ত বাম তীর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। তাদের অধিকারের বাইরে শ্রীহট্ট তিনটি প্রধান খণ্ডে বিভক্ত হয়েছিল; ঐ তিন ভাগই তিন পৃথক নৃপতি কর্তৃক শাসিত হত। এঁদের অধীনে আরো অনেক ছোট ছোট ভূম্যধিকারী ছিলেন। পশ্চিমের প্রসিদ্ধ মগধ রাজ্যের নামানুকরণে শ্রীহট্টে যেমন এক ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যের নাম মগধ ছিল, তেমনি স্বনাম প্রসিদ্ধ গৌড় নগরের সাদৃশ্যে শ্রীহট্টেও এক গৌড় রাজ্য ছিল। প্রধান রাজ্য তিনটি হল—

১ — **গৌড়**। বর্তমান শ্রীহট্ট সহ উত্তর শ্রীহট্ট এবং পূর্বে ও দক্ষিণে অনেক দূর ব্যেপে গৌড় রাজ্য ছিল। গৌড়ের রাজা প্রায়শঃ শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতেন।

২ — **লাউড়**। গৌড়ের পশ্চিমে অর্থাৎ শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিমাংশ জুড়ে লাউড় রাজ্য ছিল। একসময় এ রাজ্য ময়মনসিংহ জেলার কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান হবিগঞ্জের কিছু অংশ ও প্রায় সমুদয় সুনামগঞ্জ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩ — **জয়ন্তীয়া**। এই রাজ্য শ্রীহট্টের উত্তর ও পূর্বাংশ ব্যাপী ছিল। দক্ষিণে সুরমা নদী রাজ্যের সীমারক্ষা করতো। এর সীমারেখা দক্ষিণ পূর্বাংশে ত্রিপুরা রাজ্য স্পর্শ করেছিল। সমতলাংশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র পার্বত্য জয়ন্তীয়া জেলা এ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

শ্রীহট্ট তিন ভাগে বিভক্ত হলেও 'তরফ' প্রাচিন কাল থেকে পৃথকভাবে শাসিত হত। অধিকাংশ সময় ত্রিপুরার আধিপত্য স্বীকার করলেও তরফ গৌড় রাজ্যের অংশ বিশেষ বলে সাধারণতঃ বিবেচিত হত এবং মুসলমান বিজয়ের পরে গৌড়ের অংশ বলে গণ্য হয়।

তরফের মতো 'ইটা' এবং 'প্রতাপগড়' রাজ্যও মুসলমান বিজয়ের পর থেকে গৌড়ের অংশ বলে পরিগণিত হয়েছিল।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে শ্রীহট্টের গৌড় রাজ্য প্রসিদ্ধনামা গোবিন্দের শাসনাধীনে ছিল। সাধারণতঃ ইনি 'গৌড়-গোবিন্দ' নামে অভিহিত হতেন। কিংবদন্তী মতে তিনি সমুদ্রের তনয়।

পুর বংশীয় কোনো রাজার শত মহিষী ছিলেন। সমুদ্রদেব তার মধ্যে কোনো এক মহিষীর সঙ্গে মনুষ্যাকারে মিলিত হন। এই গর্ভের কথা প্রকাশ পেলে রাজা সেই রাণীকে নির্বাসিত করেন। সমুদ্র তখন আবির্ভূত হয়ে রাণীকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, তাঁর অভিপ্রায়ে সমুদ্রের জল সরে যতদূর চড়া পড়বে নবজাত শিশুপুত্র ততদূর পর্যন্ত রাজ্যাধিকার করতে পারবে। নির্বাসিত মহিষীপুত্রই গোবিন্দ।

গোবিন্দ হয় ত্রিপুর রাজমহিষীর সন্তান অথবা শ্রীহট্ট জেলার কোনো হাওরের পরপার থেকে গৌড়ে এসে রাজ্যাধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর কীর্তি ও জনশ্রুতি তাঁকে সভ্য হিন্দু নৃপতি বলে প্রচার করছে। তাঁর নামানুক্রমে 'গৌড় গোবিন্দ' বলে ক্ষুদ্র এক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে যিনি রাজত্ব করেন, শ্রীহট্টের সেই শেষ হিন্দু নৃপতি গৌড় গোবিন্দ বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি দূর থেকে শব্দমাত্র শুনতে পেয়ে অন্তরাল থেকে লক্ষ্যবেধ করতে পারতেন। তাঁর নানাবিধ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, এইজন্য মুসলমানগণ তাকে যাদুবিদ্যা-বিশারদ বলেছেন। কিন্তু তিনি কুসংস্কারগ্রস্ত ছিলেন।

সহরের উত্তরাংশে 'গড়দুয়ার' মহল্লায় রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষের নিদর্শন দেখা যায়। সহরের উত্তরে টিলাগড়ে অসভ্য জাতীয়ের আক্রমণ রোধার্থ আর একটি গড় বা দুর্গ ছিল। মিনারের টিলা বা মনারায়ের টিলাতে রাজার এক বাড়ি ছিল। পাশের কাজি টোলা ও দরগামহল্লায়ও গৌড় গোবিন্দ রাজার বাড়ি ও দেবালয় ছিল বলে কথিত হয়। মিনারের টিলাস্থিত বাড়িতে রাজা কোন কোন সময় সাধু সন্ন্যাসী সহ সুখে বাস করতেন। হাটকেশ্বর নামে যে প্রসিদ্ধ শিবের জন্য শ্রীহট্ট গৌরবান্বিত এইখানে তিনি রাজকর্তৃক পূজিত হতেন।

গৌড় গোবিন্দ রাজার সময়ে এদেশে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আগমন করেন। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ চক্রপাণিদত্তের পুত্র মহীপতি দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। চক্রপাণিদত্তের শ্রীহট্টে আগমন কাল সন্দেহাবৃত হলেও গল্পাংশটি সুন্দর।

একবার গৌড় গোবিন্দের পেটের ভিতর কঠিন ব্যাধি হয়েছিল। সুশ্রুতের টীকাকার ও 'চক্রদত্ত' প্রণেতা চক্রপাণি দত্তের সুখ্যাতিতে দেশ তখন পূর্ণ। গৌড় গোবিন্দ চক্রপাণি দত্তকে আনার জন্য তার কাছে দূত প্রেরণ করলেন। কিন্তু অতিবৃদ্ধ জরাগ্রস্ত চক্রপাণি 'গঙ্গাহীন' শ্রীহট্টে যেতে রাজি হন নি। অবশেষে গোবিন্দের রাণীর কাতর অনুরোধে তিনি সম্মত হন ও প্রাণাধিক পুত্রগণসহ শ্রীহট্টে আসেন।

আরোগ্যলাভের পর রাজা তাঁকে এক বিশাল জনপদ দান করে সেখানে বাসের জন্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু কিছুতে ফল হল না। তবে রাজার নিতান্ত নির্বন্ধাতিশয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্রমদীশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন ; মধ্যম ও কনিষ্ঠপুত্র মহীপতি ও মুকুন্দ এদেশে রইলেন। রাজা মহাসম্মানে এঁদের সেই সম্পত্তি দান করেন। এঁরাই সাতগাঁও ও লাখাই প্রভৃতি স্থানের দত্তবংশের আদিপুরুষ।

রাজা গৌড় গোবিন্দ আরোগ্য লাভ করলেন বটে, কিন্তু বেশি দিন শান্তিতে রাজ্য ভোগ করতে পারেন নি। এরপরই তাঁকে ভীষণ মুসলমান বিদ্রোহে বিব্রত হতে হয়।

মহম্মদ তুঘলকের আমলে বঙ্গদেশে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুলতান শামসউদ্দীন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অবস্থিত ছিলেন। তিনি রাজ্যপ্রাপ্তির চার বৎসর পরে—(১৩৪৭ খ্রীঃ) জাজিনগর (কসবা) আক্রমণ করেন। তখন প্রতাপ মাণিক্য ত্রিপুরার রাজা। শামসউদ্দীনের এই আক্রমণ ও প্রভাব এ অঞ্চলে তাবৎ নৃপতির আশঙ্কার কারণ হয়েছিল।

শাহজলাল নামে জনৈক পশ্চিম দেশীয় দরবেশ শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু নৃপতি গোবিন্দকে পরাভূত করেন। যখন শাহজলাল শ্রীহট্টে আগমন করেন তখন এদেশে মুসলমান সংখ্যা ছিল না বললেই হয়। তরফে তখন নুরউদ্দীন নামে এক মুসলমান সপরিবারে বাস করতেন এবং বুরহানউদ্দীন নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীহট্টের টুলটিকর নামক স্থানে সপরিবারে ছিলেন বলে জানা যায়।

উক্ত বুরহানউদ্দীন একদা নিজপুত্রের জন্মোপলক্ষে একটি গোহত্যা করেন। তাঁর দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা চিল একখণ্ড মাংস এনে জনৈক ব্রাহ্মণ গৃহে (মতান্তরে রাজগৃহে) নিক্ষেপ করে। এ বিষয় রাজার গোচরীভূত হলে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বুরহানউদ্দীনের হস্ত ছেদন ও তার শিশুপুত্রকে নিহত করেন। সেই মুসলমান প্রভাবের কালে এই ঘটনাটি সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে অপমানসূচক হয়েছিল।

তখন সুবর্ণগ্রামে প্রবল প্রতাপান্বিত শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ শাসনদণ্ড পরিচালনা করছিলেন। তিনি বুরহানউদ্দীনের নির্যাতনবার্তা শ্রবণে নিজ তনয় সিকান্দর শাহকে গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। রাজা গোবিন্দের কৌশলে যুদ্ধে পরাজিত ও অপমানিত হয়ে সিকান্দর শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। পিতার মৃত্যুর পর ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান সিকান্দর শাহ সিংহাসনারোহণ করেন। সুচতুর গৌড় গোবিন্দ সম্ভবতঃ ওই সময় তাঁর সঙ্গে কোনো প্রকার সন্ধি স্থাপন করে থাকবেন। ১৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে সিকান্দর শাহ বিখ্যাত আদিনা মসজিদ প্রস্তুত করেন। তোয়ারিখে-জলালি-তে লিখিত আছে যে, অন্য এক আদিনা মসজিদ প্রস্তুত করতে গৌড় গোবিন্দ অনেক মাল মশলা প্রেরণ করেছিলেন। স্পষ্টতঃ জানা যাচ্ছে ওই শেষোক্ত আদিনা মসজিদ শ্রীহট্টে ছিল;

যে সময়ে রাজা গোবিন্দ গৌড়ে শাসন করছিলেন, তখন তরফে একজন হিন্দু নৃপতি ছিলেন, এঁর রাজ্যাধিকার মধ্যে কাজি নুরউদ্দীন নামে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক বাস করতেন। তিনি নিজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে একটি গোবধ করায়, রাজকর্তৃক স্বয়ং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই নুরউদ্দীনের ভ্রাতা কিছুদিন দিল্লীতে ছিলেন। উক্ত ঘটনার পর তিনি পুনরায় সেখানে গিয়ে নিজ দুঃখ কাহিনী সম্রাটের গোচর করবার চেষ্টায় ছিলেন।

এই সময়ে তুঘলক বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ দিল্লী সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। বুরহানউদ্দীন ও নুরউদ্দীন ঘটিত বিবরণ একরূপ, অভিযোগ একরূপ, প্রার্থনাও একরূপ। সম্রাট তাঁদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করেছিলেন। তিনি এই অভিযোগ শুনে পূর্বাঞ্চলে মুসলমান প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য আপন ভাগিনেয় সিকান্দর শাহ গাজীর অধীনে একদল সৈন্য দিয়ে তাঁকে শ্রীহট্টে পাঠান।

বুরহানউদ্দীনের অপমানকারী গৌড় গোবিন্দকে আগে পরাভূত করা সাব্যস্ত হল। সে অনুসারে সিকান্দর সসৈন্যে শ্রীহট্টে উপস্থিত হলেন। তখন বর্ষা সমাগত হওয়ায় হিন্দুস্থানের সৈন্য সকল রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কুসংস্কার সম্পন্ন সৈন্যরা এটি সেই রাজার যাদুবিদ্যার প্রভাব জনিত উপদ্রব জ্ঞান করে নিতান্ত ভীত ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। সুতরাং সিকান্দরের ভাগ্যেও শ্রীহট্ট বিজয়ের যশোলাভ ঘটে নি।

এই ঘটনায় বুরহানউদ্দীন ভগ্নমনে দেশত্যাগ করে মদিনাতীর্থে গমন করতে মনস্থ করলেন। যখন দিল্লীতে বুরহানউদ্দীন উপস্থিত হলেন ঘটনাক্রমে প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহজলালের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ঘটনার বিবরণ শুনে শাহজলাল এর প্রতিকার করবেন বলে তাঁকে আশ্বাসিত করেন। তখন বুরহানউদ্দীন নবোৎসাহে পথপ্রদর্শকরূপে তাঁকে নিয়ে শ্রীহট্টাভিমুখে পুনর্বার চললেন।

২. দরবেশ শাহজলাল

শাহজলালের জন্মভূমি আরবের পবিত্রভূমি হেজাজের সংলগ্ন দক্ষিণভূভাগ ইয়েমেন। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভে শাহজলাল জন্মগ্রহণ করেন। হজরত মোহাম্মদ যে বংশে জন্মেছিলেন সেই কুরেশিবংশীয় এব্রাহিমের পুত্র মাহমুদ শাহজলালের জনক ছিলেন। জননী সৈয়দবংশীয়া ও সাতিশয় ধর্মপরায়ণা ছিলেন। শাহজলালের তিনমাস বয়সের সময় তাঁর মা স্বর্গগামিনী হন; পিতা মাহমুদও ধর্মযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করেন।

অনাথ শিশুর প্রতিপালন ভার নেন তাঁর মাতুল সৈয়দ আহমদ কবীর। তিনিই আবার শাহজলালের বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁর ধর্মজীবনের ভার গ্রহণ করে তাঁর দীক্ষাগুরুর পদে সমাসীন হয়েছিলেন।

একদা এক হরিণ সহসা সন্ত্রস্তভাবে কবীরের কুটির দ্বারে এসে উপস্থিত হল। এক দুর্দান্ত বাঘ তাকে আক্রমণ করেছিল। শাহজলাল তা দেখে আতঙ্কিত হরিণকে আশ্রয় দিলেন ও চপেটাঘাতপূর্বক বাঘকে বিতাড়িত করলেন। এই কার্যে গুরু তার প্রিয় শিষ্যের সিদ্ধির পরিমাণ বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁকে হিন্দুস্থানে যেতে বললেন এবং স্বীয় সাধনার স্থান থেকে একমুষ্টি মৃত্তিকা এনে শাহজলালের হাতে দিয়ে বললেন—এই মাটি অতি যত্নে রাখবে যেন এর বর্ণ গন্ধ বা স্বাদ বিকৃত না হয়। এরকম মাটি যেখানে পাবে সেখানে সতত অবস্থান করবে।

শাহজলালের সঙ্গে প্রথম যে বারজন চেলা ছিলেন তাঁদের একজন ওই মাটির তহবিলদার হলেন। তাঁর উপর ভার রইল তিনি পথিমধ্যে যত জনপদ দেখতে পাবেন সমস্তেরই মাটি পরীক্ষা করে (চেখে) দেখবেন। এই ব্যক্তির নাম চাষনি পীর।

শাহ্জলাল দলবল সহ দিল্লীতে এলেন। সেখানে তখন নিজামউদ্দীন আউলিয়া নামে এক প্রসিদ্ধ পীর থাকতেন। তার সঙ্গে শাহ্জলালের দেখা হয়েছিল। শাহ্জলালের চরিত্র অতি অদ্ভুত। তিনি স্ত্রী-সঙ্গ বর্জিত ছিলেন এবং সর্বদা চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে চলতেন।

বুরহানউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীহট্ট অভিমুখে যাবার পথে এলাহাবাদে শাহ্জলালের সঙ্গে নসিরউদ্দীন নামক একজন সেনাপতির ও পরাজিত সিকান্দর গাজীর দেখা হয়। এঁরাও শাহ্জলালের শিষ্য হন। শ্রীহট্ট পৌঁছাবার পূর্বে শাহ্জলালের শিষ্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩৬০ জন।

শাহ্জলাল ব্রহ্মপুত্রপারে পৌঁছেছেন জেনে গৌড় গোবিন্দ নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেন। শাহ্জলাল স্বীয় প্রভাবে, উপাসনার্থ ব্যবহৃত নিজ নিজ চর্মাসন জলে ভাসিয়ে তা অবলম্বনে নদী পার হলেন। এরপর তিনি শ্রীহট্ট সীমাদেশে চৌকি নামক স্থানে (দিনারপুর পরগণায়) উপস্থিত হন। গৌড় গোবিন্দ ওই স্থানের পূর্বোত্তর বরাক নদীতে খেয়া নৌকা বা অপর নৌকার চলাচল নিষেধ করে দিলেন। হজরত সেখান থেকে সসৈন্যে সতরসতী উপস্থিত হন এবং বাহাদুরপুরের ফতেগড় নামক স্থানে সে রাত্রি অতিবাহিত করেন। বাহাদুরপুরের কাছে বেগবান বরবক্র নদ। শাহ্জলাল নদীপার হবার কোনো নৌকা না পেয়ে পূর্বের মতো স্বীয় প্রভাবে বরবক্র নদও পার হলেন।

গোবিন্দ তখন এক ফিকির উদ্ভাবিত করলেন। এক লৌহধনু নির্মাণ করিয়ে শাহ্জলালের কাছে পাঠিয়ে জানালেন যে, এতে গুণ আরোপ করা হলে তিনি শ্রীহট্ট ছেড়ে যাবেন। শাহ্জলালের আদেশে নসিরউদ্দীন লৌহধনুতে গুণ আরোপ করে দিলেন। ধনু গোবিন্দের কাছে নীত হলে তিনি জয়ের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন।

অতঃপর গোবিন্দ পলায়ন করা সঙ্গত বোধ করলেন। গোবিন্দ শেষ উপায় সুরমা নদীতেও নৌকাচলাচল বন্ধ করেন। শাহ্জলাল পূর্বের মতন চর্মাসন জলে ভাসিয়ে সুরমা নদীও অবহেলায় পার হলেন। যে স্থান দিয়ে শাহ্জাদা শেখ আলী প্রমুখ পীরগণ নদী পার হয়েছিলেন তা শেখঘাট নামে পরিচিত হল।

ভীত গৌড় গোবিন্দ অনতিবিলম্বে গড়দুয়ারস্থিত রাজবাড়ি পরিত্যাগ করে পেঁচাগড় পর্বতস্থ গুপ্ত গিরিদুর্গে পালিয়ে গেলেন। এইভাবে বিনা রক্তপাতে শ্রীহট্ট বিজিত হল। গৌড় গোবিন্দের পতনও লক্ষ্মণসেনের পতনের অনুরূপ।

শাহ্জলাল স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন নি। সিকান্দর গাজীর উপর শ্রীহট্টের শাসনভার অর্পিত হল।

চাষনি পীর যখন শ্রীহট্টের ভূমি পরীক্ষা করলেন তখন দেখা গেল পীর আহমদ কবীর প্রদত্ত মাটির বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ মিলে যায়। এস্থানই তাঁর কর্মক্ষেত্র বুঝতে পেরে শাহ্জলাল একটি মনোরম স্থানের উপর নিজ উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

শাহ্জলাল তরফ বিজয়ে নসিরউদ্দীনকে প্রেরণ করেন। কাণিহাটীতে শাহ্ হেলিমউদ্দীন প্রেরিত হন এবং জিয়াউদ্দীনকে বুন্দাশিল পাঠিয়ে দেন। শ্রীহট্ট আগমনের পর তিনি ত্রিশ

বছর জীবিত ছিলেন। বাষট্টি বছর বয়সে শুক্রবার তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর নিজকৃত উপাসনাগৃহের পাশে তাঁর দেহের সমাধি দেওয়া হয়। শাহজলালের দরগা হিন্দু-মুসলমান সবারই কাছে মান্য।

শাহজলালের দরগার মসজিদে কয়েকটি প্রস্তরলিপি দেখা যায়। একটি প্রস্তর লিপিতে লিখিত আছে যে, শামস্উদ্দীন ইউসুফ শাহের সময়ে এটি নির্মিত হয়। ইউসুফ শাহের শাসনকাল ১৪৭৪ থেকে ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। দরগার বৃহৎ মসজিদটি সম্রাট আওরঙজেবের রাজত্ব সময়ে নির্মিত হয়েছিল। দরগায় শাহজলালের আনা উটপাখির ডিম, 'জুলফিকার' নামক তরবারি, তদীয় নমাজের 'মোসল্লা' (মৃগচর্মের আসন), তাঁর ব্যবহৃত দুটি তামার পেয়ালা, কাঠের পাদুকা এবং একটি প্রকাণ্ড তামার 'ডেগ' রক্ষিত ছিল।

বিদেশীয় মুসলমানেরা শ্রীহট্টকে 'তিন শ ষাট আউলিয়ার মুলুক' বলেন।

৩. নবাবি আমল

শ্রীহট্টের শাসনকর্তৃগণ সাধারণতঃ নবাব বলে আখ্যাত হতেন।

সিকান্দর গাজীর মৃত্যুর পর শাহজলালের অপর অনুচর হায়দার গাজী শ্রীহট্টের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ঐতিহাসিক হান্টার বলেন যে, শাহজলালের পর শ্রীহট্ট বঙ্গসাম্রাজ্যসংভুক্ত হয়ে নবাব পদাভিষিক্ত শাসনকর্তাদের শাসনাধীন হয়। সিকান্দর ও হায়দর গাজী শাহজলাল জীবিত থাকা কালেই গৌড় (শ্রীহট্ট) শাসন করেন। কারো কারো মতে এরপর ইসপেন্দিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইনি আদিনা মসজিদেব মালমসলা এনে দরগার সম্মুখবর্তী (অপূর্ণ) মসজিদটি প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। শাহজলালের মৃত্যুকাল পর্যন্ত হায়দর গাজীর শাসনকাল অনুমান করলে ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি শ্রীহট্টের শাসনদণ্ড পরিচালন করেছিলেন বলা যেতে পারে। তারপর শ্রীহট্টের শাসনকার্য কিভাবে চলেছিল জানা যায় না।

এই সময়ের মধ্যে দিল্লীর রাজসিংহাসন তুঘলক বংশীয়দের হাত থেকে লোদীবংশীয়ের অধিকারে আসে। বহলুল লোদী ছাব্বিশ বছর যুদ্ধের পর জোয়ানপুর অধিকার করেন। জোয়ানপুরের অধিপতি হুসেন শাহ সুরকি (মতান্তরে হুসাঙ্গ) পলায়নপূর্বক বঙ্গদেশে আগমন করেন। যখন বাঙ্গলাদেশ হাবসী ও খোজা দাসগণের হস্ত থেকে হস্তান্তরে যাচ্ছিল তখন সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ গৌড় সিংহাসন করায়ত্ত করেন। তিনি অসাধারণ, বীর, কর্মকুশল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। পূর্বাঞ্চলে তিনি ত্রিপুরাধিপতি ধন্যমাণিক্যেব সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

সৈয়দ হুসেন শাহের সময়ে (অধুনালুপ্ত মুয়াজ্জমাবাদের সঙ্গে) শ্রীহট্টও তাঁর শাসনাধীন হয়। এর আগে শ্রীহট্টে বিদেশাগত কোনো শাসনকর্তার খবর পাওয়া যায় না। হুসেন শাহের শাসন সময়ে (১৪৯৬-১৫২০) মন্ত্রী রুকণ খাঁ শ্রীহট্টের শাসনজন্য প্রেরিত হন। রুকণ খাঁর মৃত্যুর পর গহর খাঁ আসোয়ারি তাঁর পদে নিযুক্ত হন। এঁরও কানুনগো উপাধি ছিল, সর্বোচ্চ শাসনভারপ্রাপ্ত কর্মচারীই সেকালে কানুনগো উপাধির অধিকারী ছিলেন। গহর খাঁর নামে

শ্রীহট্টের গহরপুর পরগণায় নামকরণ হয়। এঁর প্রধান কর্মচারীর নাম সুবিদরাম ও রামদাস ছিল। গহর খাঁর পর মোহাম্মদ খাঁ কানুনগো নিযুক্ত হন।

আধুনিক শ্রীহট্ট সহরের তিন-চার মাইল উত্তরে গৌড়ের প্রাচীন রাজধানী 'গড়দুয়ার' অবস্থিত। এর কাছে প্রাচীন বরশালা বস্তি। বরশালাতে রাজকর্মচারীদের বাসভবন থাকায় তা এক সৌষ্ঠবশালী গ্রামে পরিণত হয়। শাহজলালের আগমনে গড়দুয়ারের সঙ্গে সঙ্গে বরশালারও অধঃপতন ঘটে, সহর আরো দক্ষিণে সরে আসে। মুসলমান শাসনকর্তাদের সময়ে পশ্চিমে আখালিয়া ও শেখ ঘাট থেকে পূর্বে রায়নগরের উচ্চতর স্থানসমূহ নিয়ে শ্রীহট্ট সহর ছিল। বরশালা প্রভৃতি স্থান ক্রমে জঙ্গলপূর্ণ হতে থাকে।

জোয়ানপুরে যখন হুসেনশাহ সুরকি রাজত্ব করছিলেন, তখন শ্রীহট্টস্থ বরশালাবাসী সর্বানন্দ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জোয়ানপুরে রাজকুমারদের শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে একদা তিনি মুসলমানের আহারীয় দ্রব্যের আঘ্রাণ পাওয়ায় আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করেন। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সর্বানন্দ হুসাঙ্গের সহকারী মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। এই সর্বানন্দ ও শ্রীহট্টের দস্তিদার পরিবারের পূর্বপুরুষ একই বংশোদ্ভূত।

ইসলামধর্মে দীক্ষিত হলে সর্বানন্দ সরওয়ার খাঁ নাম প্রাপ্ত হন। প্রভুর রাজ্যচ্যুতিতে সরওয়ার খাঁ গৌড়াধিপতির আশ্রয়ে এলে তাঁর নিয়োগানুসারে তিনি শ্রীহট্টে প্রেরিত হন। ঐসময় শ্রীহট্টের কোনো কোনো ভূম্যধিকারী বিদ্রোহভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। ভূতপূর্ব কানুনগো গহর খাঁর কর্মচারী সুবিদরাম ও রামদাস বহু অর্থ আত্মসাৎ করে প্রতাপগড়ের অধিকারী ব্যক্তিদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ইটার জমিদার শ্রী শিকদার, কানিহাটীর জমিদার ইসলাম রায়, জঙ্গলবাড়ীর জমিদার প্রভৃতি বিদ্রোহ উপস্থিত করেন।

সরওয়ার খাঁ শ্রীহট্টে আগমনপূর্বক কিছুকাল মধ্যেই বিদ্রোহ দমন করেন। হুসেন শাহ তুষ্ট হয়ে মোহাম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর সরওয়ার খাঁর পুত্র মীর খাঁকে শ্রীহট্টের শাসনকর্তা (কানুন গো) নিযুক্ত করেন। তিনি স্বীয় কৃতকার্যতার জন্য মজুমদার (অর্থ-'সর্বাধিকারী') উপাধি পান। মীর খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্টপুত্র ইউসুফ খাঁ ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে কানুনগো নিযুক্ত হন। হুসেন শাহের রাজত্বকালে বিচার ও রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারীগণ 'দেওয়ান' নামে অভিহিত হতেন। শ্রীহট্টে সেকালে আনন্দ নারায়ণ গুপ্ত নামক এক ব্যক্তি দেওয়ান হন।

১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হুসেনী সৈয়দ বংশ বিলুপ্ত হয়, পরবর্তীকালে শের সাহের সময়ে বঙ্গদেশ সুশাসিত হয়, কিন্তু তাঁর ও হুমায়ুনের বিগ্রহের সময়ে পূর্ববঙ্গের অনেক জমিদার স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করছিলেন। এঁদের মধ্যে খোয়াজ ওসমান খাঁ, মসনদ আলী, সোনাগাজী, কেদার রায়, প্রভৃতি প্রধান। আফগান জাতীয় খোয়াজ ওসমান কোনো কারণে ইটা পরগণায় গৃহ, গড় ও দীঘি প্রভৃতি প্রস্তুত করে বাস করছিলেন। পূর্বে তিনি দেওয়ান আনন্দরামের সহায়তায় ইটার রাজা সুবিদনারায়ণকে পরাভূত করেন ও পরে এই বিদ্রোহী দলের নায়ক স্বরূপ একদল আফগান অশ্বারোহীসহ তরফ ও ইটা অধিকার করেন। এরপর শ্রীহট্টের (গৌড় রাজধানীর) শাসনকর্তা ইউসুফ খাঁকে পরাভূত করে দৃঢ়ভাবে ওখানে অবস্থিতি করেন। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন পূর্বকথিত কানুনগো গহর খাঁ আসোয়ারির কর্মচারী সুবিদরামের ভ্রাতুষ্পুত্র যদুরাম।

শ্রীহট্টের শাসনকর্তা ইউসুফ খাঁ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলে তার ভাই লোদী খাঁ শেরশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শেরশাহ বিদ্রোহীদমনের জন্য লোদী খাঁকেই নিয়োজিত করেন। বাঙ্গলার নাজিম ইসলাম খাঁ ও সফেত খাঁ এবং মুনশী কামাল খাঁর সহায়তায় খোয়াজ ওসমান প্রভৃতিকে দমন করে লোদী খাঁ কানুনগো পদের সনন্দ প্রাপ্ত হন এবং শ্রীহট্টে আদায়ী রাজস্বের টাকা প্রতি পাঁচ পাই লোদী খাঁর প্রাপ্য নির্ধারিত হয়।

লোদী খাঁর পরে তাঁর পুত্র জাহান খাঁ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকায় পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের তহশীলদার রাজেন্দ্র ও বসুদাস, রুদ্রদাস এবং তরফের দস্তিদার—সুবিদরামকে তার সহকারী নিযুক্ত করেন।

আকবরের রাজত্বকালের প্রথম সময়ে জাহান খাঁ শ্রীহট্টের কানুনগো ছিলেন। আকবরের গৌরবময় কালে কানুনগোদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। কানুনগোদের জেলা শাসনের ক্ষমতা রহিত করে তাঁদের দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের প্রথা প্রবর্তিত হয়।

সম্রাট আকবরের সময়ে সুবা বাঙ্গলার ১৯টি সরকার মধ্যে শ্রীহট্ট একতম সরকার (জেলা) রূপে গণ্য হয়। টোডরমল্ল শ্রীহট্টকে আটটি মহলে বিভক্ত করে প্রতি মহলের রাজস্ব নির্দিষ্ট করেন। সে অনুসারে শ্রীহট্টের রাজস্ব ১৬৭০৪০, টাকা নিরূপিত হয়।

সম্রাট আকবরের সময় থেকে শ্রীহট্ট শাসনের ভার 'আমিল' উপাধিধারী কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত হয়। এঁরাই পরে ফৌজদার নামে অভিহিত হতেন। সর্বসাধারণে তাঁদের নবাব বলে জানতো ; এইজন্য তাঁদের প্রদত্ত সনদ ইত্যাদিতেও তাঁদের নবাব উপাধি লিখিত রয়েছে দেখা যায়। এঁরা ঢাকার নবাবের অধীনরূপে গণ্য হতেন, ঢাকাতে তাঁদের আদায়ী রাজস্ব প্রেরণ করা হতো ; কিন্তু শাসন বিষয়ে পরে তাঁদের মুর্শিদাবাদের অধীনে কাজ করতে হত। এঁদের সহকারীদের নাম নায়েব ফৌজদার।

কামরূপের কোচ বংশীয় নৃপতি—নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৩৫ থেকে ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর ভ্রাতা শুক্লধ্বজ (চিলারায়) তাঁর সেনাপতি ছিলেন। চিলারায় কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তীয়া জয়ান্তে শ্রীহট্টাভিমুখে ধাবিত হন। শ্রীহট্টের প্রথম আমিল তখন শাসনকর্তা। ওই যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তাঁর ভাই বন্দী অবস্থায় নরনারায়ণের কাছে নীত হলে ২০০ ঘোড়া, ১০০ হাতী, ৩০০,০০০ টাকা এবং ১০,০০০ মোহর করস্বরূপ দিতে অঙ্গীকার করে আত্মমোচন করেন।

চিলারায়ের অভিযানের পর যিনি শ্রীহট্টের শাসনকর্তা ছিলেন তাঁকেও ত্রিপুরাধিপতির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল। ত্রিপুরার অধিপতি বিজয় মাণিক্যের ভ্রাতা অমরমাণিক্য ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করে ত্রিপুরার সামন্ত নৃপতিগণকে একটি দীর্ঘিকা খননের জন্য মজুর দিতে আদেশ দেন। তরফপতি সে আদেশ গ্রাহ্য করেন নি। ত্রিপুরাধিপতি তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলে তিনি পালিয়ে শ্রীহট্টের আমিলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অমরমাণিক্য কালবিলম্ব

না করে শ্রীহট্টের শাসনকর্তার প্রতিকূলে ধাবিত হন ও যুদ্ধে তাঁকে পরাস্ত করেন। সম্ভবতঃ ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৯ খ্রী.) এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

শ্রীহট্টের পরবর্তী আমিল বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন ও বিশেষ কৌশলে শ্রীহট্টে পুনরায় অধিকার বিস্তরে সমর্থ হন। ফলতঃ শ্রীহট্টের আমিলগণের কোনোরূপ ত্রুটি থাকলে তাঁরা পদচ্যুত হতেন।

৪. নবাবি আমল

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে ও তারপরে শ্রীহট্টে যেসব আমিল আগমন করেন তাদের মধ্যে নবাব ফরহাদ খাঁর সময়ে অনেক মসজিদ সেতু, ইমারত প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। শ্রীহট্টের পূর্বপ্রান্তবর্তী গোয়ালিছড়ার সেতু এঁর কীর্তি। শাহজলালের দরগাব বড় মসজিদ তৎকর্তৃক ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। ফরহাদ খাঁ, গুণীর আদর করতেন, তিনি অনেক ব্যক্তিকে ভূমি দান করেন।

ফররুখশিয়ারের পরে দিল্লীর সম্রাট মোহম্মদ শাহব রাজত্বকালে নবাব শুকুর উল্লা খাঁ শ্রীহট্টের ফৌজদার ছিলেন। তিনি ঢাকার নায়েব নাজিমের নিকটসম্পর্কিত লোক ছিলেন বটে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে সুখ্যাতিভাজন হতে পারেন নি, এবং পদচ্যুত হন। তাঁর স্থানে একজন হিন্দু এই উচ্চতম পদে আরোহণ করেন, তিনিই শ্রীহট্টের মুখোজ্জ্বলকারী নবাব হরকৃষ্ণ দাস (হরকিষুণ দাস) মনসুর উল্‌মুলুক বাহাদুর।

ইতিপূর্বে সর্বানন্দের উল্লেখ করা হয়েছে। যে বংশে সর্বানন্দের উদ্ভব হয়েছিল, সেই বংশে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিবল্লভ নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ফার্সি ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট তাঁকে রায় উপাধি দেন; তিনি শ্রীহট্টের কানুনগো ও দস্তিদার পদে নিযুক্ত হন। কোনো সনদ বা সরকারী দলিল পত্রাদি বাহাল সাব্যস্তে রাজকীয় মোহর করার জন্য উপস্থিত করা হলে, পরীক্ষান্তে তাতে মোহর করার অনুমতি দেওয়া দস্তিদারের কাজ ছিল। ফারসি 'দস্ত' শব্দের অর্থ হাত। ভূমি পরিমাণে দস্তিদারের হস্তের পরিমাণ প্রামাণ্য গণ্য হত। আজ পর্যন্ত শ্রীহট্টে দস্তিদারী নলে ভূমি মাপের রীতি প্রচলিত আছে। ১৮ ইঞ্চি হাতের ১৪$\frac{১}{৩}$ হাতে দস্তিদারী এক নল হয়।

কবিবল্লভের পুত্রের নাম সুবিদ রায় ও শ্যাম দাস। সুবিদ রায় পিতৃপদ পান। তাঁর বাসস্থান 'সুবিদরায়ের গৃধা' নামে কথিত হয়। সুবিদরায়ের পুত্রের নাম সম্পদ রায় এবং তাঁর পুত্র যাদব রায়। এঁরাও শ্রীহট্টের কানুনগো ও দস্তিদার ছিলেন। নিঃসন্তান অবস্থায় যাদবরায়ের মৃত্যু হয়। শ্যাম দাসের পুত্রের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ, তৎপুত্র কৃষ্ণরায় ও হরকৃষ্ণ। এই হরকৃষ্ণই শ্রীহট্টের আমিল পদ পেয়ে নবাব হরকিষণ দাস মনসুর-উল্‌-মুলুক বাহাদুর নামে খ্যাত হন।

কথিত আছে, হরকৃষ্ণের জননী কোন কারণে এক ফকিরের কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন যে শিশুকে তাঁর হাতে সমর্পণ করবেন। ফকির শিশুকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যান এবং ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় নিয়োজিত করেন। হরকৃষ্ণ ফার্সিতে সুশিক্ষিত হয়ে উঠলেন; তাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্মতায় সকলেই বিস্মিত হল। কোন সুযোগে ঢাকার নবাব নোয়াজিস মোহাম্মদের অধীনস্থ রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন ও পূর্ববঙ্গের রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত কালে তাঁর বিশেষ সহায়তা করেন। হরকৃষ্ণের কার্যতৎপরতায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজবল্লভ মুর্শিদাবাদের নবাবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। পূর্ববঙ্গের হিসাব প্রস্তুত সূত্রে নবাব তাঁকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। হরকৃষ্ণ এই টাকা ফকিরকে দিয়ে আত্মস্বাধীনতা অর্জন করেন। হরকৃষ্ণ কিছুকাল মুর্শিদাবাদে কাজ করেন এবং পরে নবাবের অনুগ্রহে শ্রীহট্টের আমিল পদে নিযুক্ত হন।

হরকৃষ্ণের নবাবি প্রাপ্তিতে শুকুর উল্লা ক্রুদ্ধ হয়ে নানা অছিলায় শ্রীহট্ট থেকে গুপ্তভাবে হরকৃষ্ণের সর্বনাশের সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। অনেক গোলমালের পর শুকুর উল্লা তাঁকে শাসনভার ছেড়ে দিলেন বটে কিন্তু সংগৃহীত যে রাজস্ব তহবিলে ছিল তা ছেড়ে দিলেন না। শ্রীহট্ট রাজকোষের অধ্যক্ষ সাহা-বংশীয় এক ব্যক্তিও শুকুর উল্লার ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

ষড়যন্ত্র ও স্থানীয় বিশৃঙ্খলার ফলে নতুন রাজস্ব রীতিমত আদায় করাও হরকৃষ্ণের পক্ষে সুকঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুযোগ বুঝে শুকুর উল্লা ঢাকার দরবারে মিথ্যা রটিয়ে দিলেন, হরকৃষ্ণ রাজস্ব সংগ্রহ করে আত্মসাৎ করেছেন। শুকুর উল্লা গোপনে ঢাকার নবাবকেও হাত করে ফেলেছিলেন। ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হয়ে উঠতে থাকে। শ্রীহট্টে হিন্দু-মুসলমান বিবাদের আগুন জ্বলে উঠল। হরকৃষ্ণের দেহরক্ষক সৈনিকগণেব এক ব্যক্তি শুকুর উল্লার নিকট গোপনে স্বধর্ম বিক্রয় করে তাঁকে গুপ্ত হত্যার ভার নেয়। শোনা যায়, কাজলসারের নিকটবর্তী মালিনীর তীরবর্তী প্রান্তরে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধের দিনেও যথাসময়ে স্নানাদি করে হরকৃষ্ণ ঠাকুর ঘরে ইষ্টপূজাতে বসেছিলেন। এরূপ অবস্থায় ধ্যাননিমগ্ন হরকৃষ্ণকে দুরাত্মা দেহরক্ষক তরবারির গুপ্ত আঘাতে হত্যা করলো এবং তাঁর ছিন্নমুণ্ড শূলাগ্রে উত্তোলন করে উন্মত্ত উল্লাসে শেখঘাটের একাংশে অবস্থিত শুকুর উল্লার বাড়ির দিকে ছুটল। হরকৃষ্ণের বিশ্বস্ত সেনাপতি রাধানাথ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে শোকে তিনিও আত্মঘাতী হন।

হরকৃষ্ণের শাসনকাল অতি অল্প হলেও এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রভূত দানশক্তিব পরিচয় দিয়ে গেছেন। শ্রীহট্ট কালেক্টরীতে নবাবী আমলের যে সকল দানপত্র রক্ষিত আছে তার অর্ধেকই 'নবাব হরকিষণ' প্রদত্ত। এই সকল সনদে, তারিখ স্থলে দুই থেকে চার জলুস পর্যন্ত পাওয়া যায়। 'জলুস' অর্থে রাজ্যাভিষেক কাল। প্রত্যেক দিল্লী সম্রাটের রাজ্যাভিষেক কাল থেকে 'জলুস' গণনা আরম্ভ হয়। অতএব সম্রাট মোহাম্মদ শাহের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত হরকৃষ্ণের শাসন সময়।

হরকৃষ্ণের সেনাপতি রাধানাথ ব্যতীত মাধব খাঁ (মহতাব খাঁ) নামে আর এক সেনাপতির নাম শোনা যায়। হরদয়াল নামে এক বিচক্ষণ ব্যক্তি ফৌজদারী সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। হরকৃষ্ণ নবাবের মীরমুনসীর নাম ছিল বিশ্বনাথ।

হরকৃষ্ণ নবাবি পাওয়ার পর মালিনী নামক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তীরে এক বিস্তৃত দীর্ঘিকা খনন করিয়ে তার তীরে ১০৮টি কালীপূজা করিয়েছিলেন। তাঁর পূজিত ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পরেও দেখা যেত।

হরকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন। ক-বছর পরে কর্তৃপক্ষ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জয়কৃষ্ণকে শ্রীহট্টের কানুনগো ও দস্তিদার পদ প্রদান করেন।১ জয়কৃষ্ণের এক পুত্র, তাঁর নাম জীবনকৃষ্ণ। তিনি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা ছিলেন। এঁর দুই ছেলে—দয়ালকৃষ্ণ ও গোপালকৃষ্ণ। জ্যেষ্ঠ দয়ালকৃষ্ণ সাহিত্য ও জ্যোতির্বিদ্যাচর্চায় কাল কাটাতেন, বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতেন না। দুই ভ্রাতায় বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় বহু আয়ের ভূ-সম্পত্তি এদের হস্তচ্যুত হয়। কনিষ্ঠ গোপালকৃষ্ণের পুত্রের নাম নবকৃষ্ণ—এর পাঁচ ছেলে, নলিনীকান্ত, যামিনীকান্ত, রজনীকান্ত, ধরণীকান্ত প্রভৃতি।

শুকুর উল্লা কর্তৃক নবাব হরকৃষ্ণ নিহত হলেও, শুকুর উল্লাকে হরকৃষ্ণের পদে তৎক্ষণাৎ নিয়োজিত করা হয়নি। দিল্লী থেকে নূতন ফরমান আনাতে তাঁর এক বছর লেগেছিল। এই এক বছর কাল শ্রীহট্টের শাসনভার নায়েব ফৌজদার, সেনাধ্যক্ষ ও দেওয়ানের উপর সমানভাবে অর্পিত হয়। এঁরা তিনজন একযোগে কাজ করতেন। তাঁদের যুক্ত নামের মোহরাঙ্কিত সনদ এখনও শ্রীহট্টের কালেক্টরীতে দেখতে পাওয়া যায়—সেই মোহরে 'সাদেকুল হরমাণিক' লিখিত আছে। সাদেক উল্লা, হরদয়াল ও মাণিক চাঁদ, এই তিন নামের আদি শব্দ উক্ত মোহরে গ্রথিত হয়েছে। দেওয়ান মাণিকচাঁদই শ্রীহট্টের স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা গিরীশচন্দ্র রায়ের পূর্বপুরুষ।

(১) জয়কৃষ্ণের দস্তিদারী সনন্দের বাংলা অনুবাদটি কৌতূহলযোগ্য :

'বৈকুণ্ঠতুল্য সুবেবাংলার অন্তঃপাতি শ্রীহট্ট চাকলার কানুনগো, চৌধুরী, ভদ্রলোক, জমিদার ও প্রজাবর্গ জানিবা—জানা গেল যে, সুবিদ রায়ের পুত্র সম্পদ রায়ের পুত্র যাদব রায় উক্ত চাকলার কানুনগো ও দস্তিদার নিঃসন্তান মরিয়াছেন। সুবিদ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র লক্ষ্মী দাসের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দাসের বেটা জয়কৃষ্ণ দাস সরকারের উপকারের জন্য এই কার্যের প্রার্থক। অতএব উপরোক্ত যাদব রায়ের মরণ তারিখ অবধি কানুনগো দস্তখত ও দস্তিদারী পদে উপরোক্ত জয়কৃষ্ণ দাসকে নিযুক্ত করা গেল। তোমাদিগের উচিত যে জয়কৃষ্ণ দাসকে উক্ত চাকলার কানুনগো ও দস্তিদারী কর্মে স্থিরতর জানিবা, বাহাল তারিখ অবধি তাহার সদুপদেশ ও আদেশ মতে কার্য করা ও তাহা অমান্য না করা। কাগজাতে উহার দস্তখত ও জরিপে উহার হাতের মাপ সদর ও মহালমৎ ও অন্যান্য কার্যালয়ে সকলে উহার দস্তখৎ বলবৎ জানিবা। এই সম্বন্ধে খুব তাগিদ্ জানিবা তাহার হুকুম মত কার্য করিবা।' তাং ২২ রজব ১৮ জলুস।

মোহর—মোহাম্মদখাঁ বাদশাহ গাজী। ১১৪২ জলুস। ফিদ্দবি। সমশের খাঁ বাহাদুর।

পরবর্তী কালের একজন আমিল নবাব শমশের খাঁ নবাব সরফরাজ খাঁর পক্ষে প্রসিদ্ধ গিরিয়ার যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

শ্রীহট্টের পূর্বাঞ্চলে পার্বত্য লোক কর্তৃক নানারূপ উৎপাত ঘটতো। এসব নিবারণের জন্য একজন নূতন নায়েব ফৌজদার নিযুক্ত হন। সেই নবনিয়োজিত নবাব মিরাট থেকে আগমন কালে একদল মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ান গোলন্দাজ সৈন্য সীমান্ত রক্ষার জন্য আনয়ন করেন। শ্রীহট্টের সীমান্তবর্তী বুন্দাশিল নামক স্থানে তিনি একটি দুর্গ প্রস্তুত করেছিলেন, সেই দুর্গই বদরপুরের কেল্লা বলে খ্যাত। বুন্দাশিলের রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানেরা পূর্বোক্ত গোলন্দাজদের বংশধর।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। তখনও পূর্ব প্রথামত মুসলমান ফৌজদার শ্রীহট্টের শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীহট্টের শেষ নবাব গণর খাঁ বাহাদুর। ইনি অবশ্য বৃত্তিভোগীমাত্র ছিলেন।

নবাবি আমলে দেশের অবস্থা

নবাবি আমলে অন্যান্য দেশ যেমন শাসিত হয় শ্রীহট্ট অঞ্চল শাসনেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। আমিল বা ফৌজদারগণ পূর্বে দিল্লীর অধীনে ছিলেন, পরে রাজস্ব বিষয়ে ঢাকারও শাসন বিষয়ে মুর্শিদাবাদের অধীনে কার্য করতে হত। এঁরা সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও সুশিক্ষিত ছিলেন। প্রধানতঃ সীমান্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁদের অধীনে একাধিক 'নায়েব' থাকতেন। ফৌজদার পরিবর্তনে কখনো কখনো সংঘর্ষ উপস্থিত হত। দিল্লী থেকে নিযুক্ত হতেন রাজস্ব বিভাগের উচ্চ কর্মচারী 'দেওয়ান'। সম্রাট শেরশাহের সময়ে শ্রীহট্টে আনন্দ নারায়ণ নামে এক দেওয়ান ছিলেন। ওই বংশে দেওয়ান মুক্তারাম, দেওয়ান মানিকচাঁদ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। এতে বোধ হয় ঐ পদ উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে প্রদত্ত হত। দেওয়ানী পদের ন্যায় কানুনগো পদও উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে প্রদত্ত হত। আমিল পদ সৃষ্টির পূর্বে কানুনগো-রা দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, পরে তাঁদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। রাজস্ব ও জমির বন্দোবস্তের জন্য স্থানে স্থানে কানুনগো কার্যালয় স্থাপিত হয়; সদর শ্রীহট্ট, ইটা, লংলা, তরফ প্রভৃতি স্থানে কানুনগো কার্যালয় ছিল। পাটওয়ারিরা এঁদের সাহায্যকারী ছিলেন। দস্তিদারদের ক্ষমতাও অল্প ছিল না। রাজকীয় দলিল ও দানপত্রাদি মোহরাঙ্কিত করে তাঁরাই বহাল করে দিতেন। ভূ-পরিমাপে তাঁদের নল ব্যবহৃত হবার বিধান ছিল। কাজিগণ শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কর্মচারী ছিলেন, এঁদের অধীনে কিছু কিছু সৈন্যও থাকতো, তরফ প্রভৃতি স্থানে কাজীর কার্যালয় ছিল। বিচার বিভাগে মুফতিগণ মুসলমানী আইনের ব্যাখ্যা করতেন এবং হিন্দু ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য রাজপণ্ডিত নিয়োজিত থাকতেন। রাজপণ্ডিতেরা ভরণপোষণার্থ ভূমিদান পেতেন।

সামরিক বিভাগে বক্সী, জমাদার, হাজারী প্রভৃতি পদ ছিল। দেওয়ানী সেরেস্তায় মুস্তফী বা সেরেস্তাদার, আমীন, পেশকার, মুনশী প্রভৃতি বহুবিধ কর্মচারী ছিল। খাজাঞ্চির উপর তহবিলের ভার ছিল। পোদ্দার মুদ্রাপরীক্ষা করতেন। সেনানায়কগণ বেতনের পরিবর্তে জায়গীর ভোগ করতেন।

রাজস্ব সংগ্রহে বৈকুণ্ঠ-বাস

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর পূর্বে প্রধানতঃ ইজারাদাররাই দেশের বড়লোক ছিলেন, মুর্শিদকুলি খাঁ ইজারাপ্রথা রহিত করে জমিদার সৃষ্টি করেন, জমিদাররা রাজস্বের টাকা কিস্তিবন্দীক্রমে দেওয়ানখানায় দিতেন। রাজস্ব বাকি পড়লে স্থানীয় কর্মচারীর রিপোর্ট মতে জমিদারদিগকে কখনো কখনো ঢাকা বা মুর্শিদাবাদে আহ্বান করা হত, নিমন্ত্রিতেরা ভাগ্যানুসারে সেখানে বিবিধ যন্ত্রণার আস্বাদ পেতেন। এই অকথ্য অত্যাচার মুর্শিদকুলি ও রেজাখাঁর নামের কলঙ্ক স্বরূপ হয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রয়েছে। কাউকে শিঙ্গীমাছে পূর্ণ বিষ্ঠাগর্তে নামিয়ে দেওয়া হত, কারো ঢিলা পায়জামার মধ্যে বিছা বা বেড়াল ছেড়ে দেওয়া হত, কাউকে লবণমিশ্রিত মহিষদুগ্ধ পান করিয়ে উদরাময়ে ভোগাবার ব্যবস্থা করা হতো। হিন্দুর প্রতি বিদ্রূপচ্ছলে যেন এ অত্যাচার বৈকুণ্ঠবাস বলে কথিত হতো। কিন্তু 'বৈকুণ্ঠে' যে মুসলমান জমিদারদের প্রবেশ নিষেধ তা নয়।

রায় ও রায়বাহাদুর খেতাব

নবাবি আমলে সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীরা 'চৌধুরী' খেতাব পেতেন। খেতাবের মধ্যে রায় খেতাব খুব উঁচু ছিল। রায়দের সহস্র সৈন্যের (তারমধ্যে ৫০০ অশ্বারোহী) এবং রায়বাহাদুরদের তিন সহস্র সৈন্যের (তারমধ্যে ২০০০ অশ্বারোহী) অধিপতির মর্যাদা দেওয়া হত।

চৌধুরী খেতাব

হিন্দু রাজত্বে প্রজার কাছ থেকে করস্বরূপ উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ গৃহীত হত। সম্রাট আকবরের পূর্ব পর্যন্ত করস্বরূপ আয়ের চতুর্থাংশ সংগৃহীত হত, যাঁরা এই সংগ্রহকাজে নিযুক্ত হতেন তাঁরাই চৌধুরী (সংস্কৃত চতুর্ধারী বা চতুর্ধুরীণ) উপাধি পেতেন। কিন্তু সেকালে এ উপাধি কচিৎ কাউকে দেওয়া হত। পূর্বে এটি রাজস্ব আদায়ের কর্মচারীর উপাধি ছিল, পরে ভূম্যধিকারীদের স্থায়ী উপাধিরূপে পরিণত হয়। কিন্তু নতুন জমিদাররা এই খেতাব পেতেন না, কেননা জমিদার ও চৌধুরী একার্থবোধক নয়। জমিদারী পূর্বে একটি পদ স্বরূপ ছিল ; জমিদারগণ আদায়কারী 'মারফৎদার' স্বরূপ নিয়োজিত হতেন। এঁদের একসময় রাজস্ব আদায়ের হিসাব দিতে হতো। পক্ষান্তরে চৌধুরী বংশানুক্রমিক উপাধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুতঃ জমিদার ও চৌধুরী অথবা ক্রোড়ী ভিন্নার্থবোধক শব্দ। দশসনা বন্দোবস্তকালে কোনো কোনো নতুন জমিদারকে ঐ প্রাচীন উপাধিতে ভূষিত করা হয় ; চৌধুরী খেতাব ও 'ইজ্জত' ও 'রিয়াসত' ইত্যাদি বিক্রয় কবারও উদাহরণ পাওয়া যায়।

দ্রব্যের মূল্যাদি

নবাবি আমলে অপরাধীদিগকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হত, কিন্তু দূরতরস্থানে অপরাধীদের ধরবার কোনো সুবন্দোবস্ত ছিল না, এজন্য দেশে চুরি ডাকাতি অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। চালের মণ চার আনা ছয় আনায় বিক্রয় হতো ; দুই শতাব্দী পূর্বে ধানের কাঠার (আট মণে এক কাঠা) মূল্য দুটাকা আড়াই টাকার বেশি ছিল না। বার্ষিক এক টাকা কি বার আনা বেতনে বলবান কর্মক্ষম চাকর পাওয়া যেত।

খোজা

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থোক্ত দ্বাদশ সুবার ইতিহাস প্রকরণে লিখিত হয়েছে যে, 'শ্রীহট্টে অনেক খোজা ও ক্রীতদাসদাসী পাওয়া যায়'। কৃত্রিম উপায়ে মুসলমান বালকদের পুরুষত্ব নষ্ট করতো। এই খোজারা দিল্লী প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হতো। এরা কখনো কখনো প্রভূত ধন উপার্জন করে দেশে এসে সৎকীর্তি করতো। করিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ জায়গীরদার বংশের সমৃদ্ধি তাদের বংশের জনৈক খোজা থেকে এই সময় হয়েছিল। পণ্য দ্রব্যের মতো বাজারে দাসদাসী বিক্রী হতো, তবে এদের ক্রয়বিক্রয়ে লিখিত দলিলের ব্যবহার ছিল।

সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার

শ্রীহট্টে পূর্ব থেকে মৈথিল ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য থাকায় সংস্কৃতের বহুল চর্চা ছিল। শাহজলালের সময় থেকে এদেশের কথাবার্তায় উর্দুভাষার অনেক শব্দ মিশ্রিত হলেও সংস্কৃতের প্রভাব হিন্দু সমাজ থেকে দূরীভূত হয় নি। নবাবি আমলেও অধিকাংশ স্থলে দলিলপত্র সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হতো। পণ্ডিতগণ সংস্কৃতে গ্রন্থাদি লিখতে যত্ন করতেন। পরবর্তী কালে বাংলা মিশ্রিত সংস্কৃত শব্দে দলিল লেখা হত। শ্রীহট্টের কথ্যভাষায় অনেক অবিমিশ্র সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যায়। একটি সংস্কৃত দলিলের প্রতিলিপি—

"শ্রীনকল পাট্টা অজ করার মাহে ২৫ আসাড় সন ১০৯২ সাল স্বস্তি দ্বিনবত্যুত্তর-সহস্রতমাব্দে আসাড়স্য পঞ্চবিংশতি দিবসে শ্রী শ্রীমতাং সুলতান আরঙ্গসাহ পাদপদ্মানামভ্যুদায়িনি রাজ্যে বঙ্গানামধীশ্বরেষু শ্রীযুত সাহাইস্থাখাঁন মহোগ্রপ্রতাপেষু শ্রীহট্টাধিকারিনি শ্রীযুত আবদুল রহেম খান মহাসয়ে শ্রীযুত হাজি সাহাবাজকস্য পঞ্চখণ্ডাধিকারিত্বে বিলসতি সাহস্রির পঞ্চখণ্ডচত্তরকান্তর্গত খাসাপাটকস্থ শ্রীসুদাম দাস শ্রীগোবিন্দ দাস সকাসাত সপ্তমুদাং গৃহীত্বা শ্রীমধুসূদন পাল শ্রীকৃষ্ণবল্লভ পালাভ্যাং দক্ষিণে শ্রীবংসিকায়াব্বর্বাটিকা পশ্চিমে পূর্ব্ব রাজমার্গ চ উত্তরে পুষ্করিণ্যুত্তরপারং পূর্ব্বে ইসান কোণাবধিক প্রমাণেন গোলক আর ফলাইর গোলে চ জুরিয়ার ত্রিসিমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্না শ্রীমণিপত্তনবাটিকা মৌজে খেসরা সম্বন্ধিনী বিক্রীতেতি তন্মূল্যং সাততঙ্কা দ্রব্য একবাড়ী চতুঃসীমাএ সন-তারিখ-সদর—"

এই দলিলের শীর্ষদেশে এক পাশে একটি ফার্সি মোহর এবং অপর পার্শ্ব দেশে 'শ্রীমধুসুদন পাল,সম্মত শ্রীকৃষ্ণবল্লভ পাল সম্মত' এবং তার নিচে 'উভয়ানুমত্যা শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য' লিখিত রয়েছে।

সাধারণ অবস্থা

নবাবি আমলে দেশের অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল। বিচার কার্য সূক্ষ্মভাবে সম্পাদিত না হলেও দেশের লোক অনেক পরিমাণে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্বাহ করতো। লোকের ধর্মভয় প্রবল ছিল। ঐ সময়ে দেশের মুখোজ্জ্বলকারী অনেক মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়।

যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের নামে বঙ্গদেশের নাম চিরউজ্জ্বল হয়েছে শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণে এই সময়েই তাঁর পিতামহ উপেন্দ্র ও পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জন্ম হয়। যে নীলাম্বর চক্রবর্তী জ্যোতির্বিদ্যায় বঙ্গবিখ্যাত ছিলেন, শ্রীচৈতন্যের মাতামহ সেই বিখ্যাত পণ্ডিত তরফের জয়পুরে এই সময়েই জন্ম পরিগ্রহ করেন, জয়পুরে জাত এঁরই তনয়া শচীদেবী শ্রীচৈতন্যের জননী। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন শ্রীহট্ট এক ভীষণ অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষে পীড়িত হয়, যখন বহুব্যক্তি শ্রীহট্ট ত্যাগ করে ভিন্নদেশে গমন করেন সেই সময়েই নীলাম্বর চক্রবর্তী সপরিবারে জয়পুর থেকে নদীয়ায় গমন করেছিলেন।

শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল
ডাকা চুরি অনাবৃষ্টি মড়ক পড়িল।
উচ্ছিন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিয়া
নানা দেশে সর্বলোক গেল পলাইয়া। (জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল)

শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ শ্রীবাসাচার্য, শ্রীচৈতন্য লীলার আদি লেখক পার্ষদ কবি মুরারি গুপ্ত, প্রাচীন পদকর্তা যদুনাথ, প্রসিদ্ধ পাঠক রত্নগর্ভাচার্য, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন, এঁরা এই নবাবি আমলেই শ্রীহট্টে এককালে উদিত হয়েছিলেন।

এই সময় কত প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করে শ্রীহট্টের নাম চিরগৌরবান্বিত করে গেছেন। প্রসঙ্গত; বঙ্গ গৌরব রঘুনাথ শিরোমণি, সময়-প্রদীপ প্রণেতা জ্যোতির্বিদ হরিহরাচার্য, দীপিকাপ্রভা রচয়িতা গোবিন্দাচার্য, ফারসি গ্রন্থকার রেয়াজউদ্দীন 'বুলবুলে বাঙ্গালা' ও পীর বাদশাহের কথা বলা কর্তব্য। শ্রীহট্টের অন্যতম ফার্সি কবি মৌলবী মোহাম্মদ আরসদ্ প্রায় তিনশ বছর পূর্বে 'জরুর-উল-মোকল্লাফ' নামক গ্রন্থ লিখে প্রসিদ্ধ হন।

ইটাবাসী পদ্মপুরাণের প্রসিদ্ধ কবি ষষ্ঠীবর প্রভৃতি, বিখ্যাত অষ্টবিংশতি প্রদীপ প্রণেতা পঞ্চখণ্ডবাসী মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, ত্রিপুর রাজবংশের ইতিহাস 'রাজমালা-কার শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর প্রভৃতি এসময়ে আবির্ভূত হয়ে শ্রীহট্টের মুখোজ্জ্বল করেন। শ্রীহট্টে যেমন মনসাপূজার বাহুল্য লক্ষিত হয় তেমনি চার পাঁচ জন পদ্মপুরাণ রচয়িতা এদেশে এসময় জন্মগ্রহণ করেন।

নবাবি আমলেই শ্রীচৈতন্যের এই পিতৃভূমিতে নবধর্ম প্রবর্তক রামকৃষ্ণ গোসাঞির উদ্ভব হয়। ঠাকুর বাণী, পাগল শঙ্কর, বঞ্চিত ঘোষ, ঠাকুর জীবন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধার্মিক মহাত্মাগণ শ্রীহট্টের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন।

৫. তরফের কথা

গৌড়, লাউড় ও জয়ন্তীয়ার মতো তরফও শ্রীহট্টের অন্যতম প্রাচীন রাজ্য। তরফের শেষ হিন্দু রাজার নাম আচাকনারায়ণ। কথিত আছে, উত্তরে বরাক নদী, পূর্বে ভানুগাছের পাহাড়,

দক্ষিণে বেজোড়া পরগণা, পশ্চিমে উত্তর লাখাই, এই চতুঃসীমার অন্তর্গত (আঠার মুড়ার) রাজপুর নামক স্থানে এঁর রাজধানী ছিল। ইনি বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে জনশ্রুতি। তাঁর সম্বন্ধে একটি গল্প এই, বরাক নদ তাঁর রাজধানী থেকে অনেক দূরে থাকলেও তিনি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্বক সেই নদে স্নান করতে যেতেন। যে পথ দিয়ে তিনি যেতেন তা 'ত্রিপুরার জাঙ্গাল' নামে অভিহিত হয়।

রাজা আচাকনারায়ণ ত্রিপুর বংশীয় নৃপতি হলেও হতে পারেন।

আচাকনারায়ণ প্রসিদ্ধ রাজা গৌড় গোবিন্দের সমসাময়িক ছিলেন। রাজা আচাক নারায়ণের অধিকারে তখন কাজি নুরউদ্দীন নিজ পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে গোহত্যা করায় রাজাদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। শ্রীহট্ট জয়ের পর শাহজলালের নির্দেশানুসারে সেনাপতি নাসিরউদ্দীন রাজা আচাক নারায়ণকে পরাভূত করতে ধাবিত হন। গৌড় গোবিন্দের পরাভব সংবাদে আচাক নারায়ণ ভীত হয়েছিলেন। এ অবস্থায় তিনি সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্তু, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ অথবা যুদ্ধ করতে হবে, এই প্রত্যুত্তর পেয়ে নিরাশচিত্তে রাজধানী পরিত্যাগ করে তিনি পরিবারবর্গ-সহ ত্রিপুরাধিপতির আশ্রয়ে চলে যান। ত্রিপুরেশ্বর বিপন্ন আচাক নারায়ণকে আশ্রয় দান করলেও তাঁর পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেন নি। জনশ্রুতি আছে যে ত্রিপুরায় অবস্থান করা নিরাপদ হবে না ভেবে তিনি মথুরাতীর্থ চলে যান—সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রীহট্টের পশ্চিমাংশ তখন বর্তমান কালাপেক্ষা অনেক নিম্ন ছিল। শ্রীহট্ট থেকে যাত্রা করে নাসিরউদ্দীনের সৈন্য বাহিনী প্রথম যেখানে উচ্চভূমি দেখে, উচ্চ আইল বলে সে জায়গার নাম 'উচাইল' রাখা হয়। রাজার পলায়নবার্তা শুনে নাসিরউদ্দীন সগর্বে রাজধানীতে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু সেখানকার জলবায়ু পাঠান সৈনিকদের পক্ষে বিষতুল্য হল। তিনি সসৈন্যে এর প্রায় কুড়ি মাইল দূরবর্তী এক স্বাস্থ্যকর স্থানে চলে যান। লস্কর বা সৈন্যের অবস্থানের জন্য সে স্থান লস্করপুর নামে খ্যাত হয়। বিষবৎ প্রাণনাশক সেই অস্বাস্থ্যকর ও পরিত্যক্ত রাজধানী সেই থেকে বিষগ্রাম বা বিষগাঁও নাম পায়।

বিজয় সংবাদ পেয়ে হৃষ্ট সম্রাট আলাউদ্দীন ফিরোজশাহ সেনাপতি নাসিরউদ্দীনকে তরফ রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন।

নাসিরউদ্দীনের সঙ্গে যে বারজন আউলিয়া তরফে আসেন ধর্মপ্রচারার্থ তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যান, তাঁদের অধ্যুষিত স্থানে এক একটি দরগা স্থাপিত হয়—

১. শাহগাজী-বিষগ্রাম—গাজীপুর।

২. শাহ্ মজলিস্ আমীন—উচাইল।

৩. শাহফতেগাজী—ফতেপুর।

৪. সৈয়দ শাহ সয়েক খিলাতউদ্দীন—লস্করপুর।

৫. শাহ তাজউদ্দীন কুরেশি— চৌকি পরগণা।

৬. শাহ্ আরফিন—লাউড়।

৭. শাহ্ রুকণউদ্দীন আসোয়ারি — সরাইল শাহজাদপুর।

৮. শাহ্মাহমুদ—লস্করপুর-উর্দুবাজার।

৯. শাহ্ বদর—বদরপুর।

১০. শাহ্ সুলতান—ময়মনসিংহ মদনপুর।

১১. শাহ্ বদরউদ্দীন—চট্টগ্রাম।

১২. নাম অজ্ঞাত—কুমিল্লা খড়মপুর।

নাসিরউদ্দীনের সৈন্যরা উর্দু ভাষায় কথা বলতো—সেজন্য লস্করপুরের কাছে সৈন্যদের জন্য যে বাজার বসেছিল তার নাম উর্দুবাজার।

নাসিরউদ্দীনের স্থাপিত রাজবংশে বেশ কিছু পন্ডিতব্যক্তির আবির্ভাব হয়। সৈয়দ শাহ্ ইস্রাইল বিদ্যাবত্তার জন্য 'মুল্ক্-উল-উলামা' উপাধি লাভ করেছিলেন। ৯৪১ হিজরীতে (১৫২৩ খ্রী.) এর রচিত গ্রন্থ 'মদানেল ফওয়ায়েদ' শ্রীহট্টবাসী রচিত প্রথম বিখ্যাত ফার্সিগ্রন্থ। আরেক জন, সৈয়দ মুসা আরাকানের রাজার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন—মাঝে মাঝে তিনি আরাকান যেতেন। আরাকানের মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে কবি আলাওল 'পদ্মাবতী' কাব্য লিখেছিলেন। সৈয়দ মুসার অনুরোধে আলাওল 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল' নামক ফার্সিগ্রন্থের বাংলা অনুবাদে প্রবৃত্ত হন।

শাহ্ আসান উদ্দীন নামক জনৈক কৃতবিদ্য দিল্লী থেকে আগত ব্যক্তি এই পরিবারে বিবাহ করেন। তাঁর বংশে শাহ্ রেহানউদ্দীনের জন্ম হয়। তাঁর ফার্সি কবিতা শুনে দিল্লীশ্বর তাঁকে 'বুলবুলে বাংলা' উপাধি দেন।

৬. তরফের অবশিষ্ট কথা

তরফের রামশ্রীবাসী সৈয়দগণ ভিন্নবংশীয় হলেও এঁদেরও যথেষ্ট সম্মান ছিল দেশে। এই পরিবারের মোতিওর রহমান খোন্দকার অতি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর গুণে ত্রিপুরেশ্বর মোহিত ছিলেন। সৈয়দ আলী রজা নামক এক আশ্রিতকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি সপরিবারে নিহত হন।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য রাজ্যচ্যুত হন। তাঁর বক্সী উপাধিক বিশ্বস্ত কর্মচারী ও সহচর রামহরি ঘোষ বিশ্বাস বিজগাও মধ্যে এক জমিদারি কিনে সেখানে বাস করছিলেন। প্রভুর দুরবস্থা দেখে তিনি সেই জমিদারী রামগঙ্গা মাণিক্যকে দান করেন। রামগঙ্গা মাণিক্য পুনর্বার সিংহাসন লাভ করেন। বিজগাও ও বালিশিরার জমিদারী সেই সময় থেকে ত্রিপুরাধিপতির অধিকারভুক্ত।

৭. ইটার রাজা

শ্রীহট্টের ইটা অঞ্চলে পূর্বে ত্রিপুরাধিপতির যথেষ্ট প্রভাব ছিল, পরে ইটা গৌড়ের অধীন হয়। নিধিপতি ইটায় এক ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করে 'ভূমিউড়া এওলাতলি' গ্রামে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। নিধিপতির পুত্র ভূধর ও পৌত্র কন্দর্প। কন্দর্পের পুত্র বৃহস্পতি, তৎপুত্র লক্ষ্মী নাথ, তাঁর পুত্র দেবচন্দ্র। দেবচন্দ্রের ভাস্কর, পুষ্কর ও প্রভাকর নামে তিনপুত্র হয়। প্রভাকরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শুভরাজ। 'খাঁ' উপাধিপ্রাপ্ত শুভরাজের পুত্র বিখ্যাত ভানুনারায়ণ ও ইন্দ্রনারায়ণ। ভানুনারায়ণ বল বিক্রমে অদ্বিতীয় ছিলেন। সে সময় ত্রিপুরাধিপতির অধীন সামন্ত সর্দার রাজা চন্দ্রসিংহ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ভানুনারায়ণ এঁকে যুদ্ধে পরাভূত ও বন্দী করে ত্রিপুরারাজের কাছে প্রেরণ করেন। ত্রিপুরাধিপতি ভানুনারায়ণকে পুরস্কারস্বরূপ চন্দ্রসিংহের অধিকৃত ভূমিব কিছু অংশের শাসনাধিকার প্রদান করেন। তখন থেকে চন্দ্রসিংহের অধিকৃত স্থান এঁরই নামে (ভানুকচ্ছ বা ভানুকাছ, অধুনা ভানুগাছ নামে) খ্যাত হয়। ভানুবিলও ভানু নারায়ণের নাম ঘোষণা করছে।

ভানুনারায়ণ রাজোপাধি পেয়ে এওলাতলির অল্পদূরে নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন-নাম 'রাজনগর'। ভানুনারায়ণই প্রকৃতপক্ষে ইটার প্রথম রাজা। তাঁর পাঁচ পুত্র সুবুদ্ধি নারায়ণ (সুবিদ নারায়ণ), রামচন্দ্র নারায়ণ (নামান্তর ব্রহ্মনারায়ণ), ধর্মনারায়ণ, বীরচন্দ্র নারায়ণ ও রূপ চন্দ্র নারায়ণ। জ্যেষ্ঠ সুবুদ্ধি বা সুবিদ নারায়ণ সিংহাসন পান। সুবিদ নারায়ণ দিল্লীর বহলুল লোদীর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর পিতা ত্রিপুরাধিপতির আশ্রিত হলেও তাঁকে অনেকাংশে দিল্লী সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করে চলতে হত।

সেকালে সুবে বাংলার দূরবর্তী প্রদেশে স্থানে স্থানে দেওয়ান উপাধি-বিশিষ্ট হিন্দু কর্মচারী নিযুক্ত হতেন---রাজস্ব বিভাগে এঁদের পদ সর্বোচ্চ ছিল। রাজস্ব বিষয়ে ভূস্বামীদের কিছু পরিমাণে এই দেওয়ানদের প্রভাবাধীন হয়ে থাকতে হলেও শাসনকর্তাদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল না। নিজ অধিকারমধ্যে তাঁদের সর্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। সুবিদনারায়ণ এই রকম প্রভাবশালী রাজা ছিলেন।

সুবিদনারায়ণের সময়ে 'রায়' উপাধিক বৈদ্যবংশীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আনন্দনারায়ণ শ্রীহট্টের দেওয়ান নিযুক্ত হন—এঁর পূর্ব নিবাস রাঢ় দেশে ছিল। রাজস্ব বিষয়ে কতকটা সম্বন্ধ থাকায় সুবিদনারায়ণকে কিছু পরিমাণে এঁর বাধ্য থাকতে হত। কিন্তু ইটা ত্রিপুরার আশ্রিত রাজ্য বলে কখন কখন সুবিদনারায়ণ স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতেন।

ইটার পূর্বে বাড়ুয়া পাহাড়, এর প্রধান শৃঙ্গ পাগড়ীয়া টিলায় সুবিদনারায়ণের সুদৃঢ় গড় ছিল। তাঁর প্রধান দুর্গ ছিল পর্বতপুরে।

রাজা সুবিদনারায়ণ ধর্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও দাতা ছিলেন। কিন্তু সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হলে বৎস, কৃষ্ণাত্রেয় ও ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটে। রাজা বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। ব্রাহ্মণেরা ঢাকা দক্ষিণ, লংলা, তরফ ও বালিশিরাবাসী

হন। রাজা পঞ্চখন্ড প্রভৃতি স্থান থেকে দশগোত্রীয় সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণদের এনে ইটায় স্থাপিত করেন। তাছাড়া বশিষ্ঠ আত্রেয় প্রভৃতি ভিন্ন গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণদেরও তিনি ভিন্ন দেশ থেকে আনান। পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণেবা আগে থেকেই ইটায় বাস করছিলেন।

সুবিদনারায়ণ মাহারা নামে এক নতুন জাতির সৃষ্টি করেন। তাঁর প্রথমা কন্যার বিবাহ হয় রঘুনাথ শিরোমণির জেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুপতির সঙ্গে। দ্বিতীয়া কন্যা, বাল্যবিধবা বরদাসুন্দরী এক বিশাল দিঘী খনন করান। লোকে বলে বলদাসাগর (বরদাসাগর)। তৃতীয়া কন্যা পরমাসুন্দরী ভানুমতীর দ্বারা নির্মিত হয় পদ্ম দীঘি। বৈদ্যকুলতিলক উমানন্দ সুবিদনারায়ণেব মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর আবাস ছিল ইটাব অন্তর্গত ডলাগ্রামে। বৈদ্যবংশোদ্ভব দেবানন্দ ছিলেন 'পাত্র' (প্রধান শান্তিরক্ষক)। রাজার তহশীল কর্মচারীর উপাধি ছিল মন্ডল। মন্ডল ভূমি পরিমাপ করতেন, গ্রামস্থ লোকদের মধ্যে বিচার করতেন, সকল প্রজার কর একত্র করে রাজকোষে জমা দিতেন, ব্যবসায়ের উপর দৃষ্টি রাখতেন, পথ সংস্কার করতেন। নারায়ণ নামে কায়স্থ কুলোদ্ভব এক ব্যক্তি ছিলেন মন্ডল। কায়স্থ বংশজাত গোবিন্দ ছিলেন প্রধান লেখক 'পুরকায়স্থ'। পরাশর গোত্রীয় ব্রহ্মানন্দ ছিলেন রাজপন্ডিত।

রাজা নতুন বাড়ির সামনে 'সাগর দীঘি' নামে একটি বিরাট দীঘি খনন করেন। এক মহালয়া তিথিতে উমানন্দ প্রভৃতি চারজন রাজকর্মচারী সাগরদীঘির তীর ধরে সভা পন্ডিতেব সঙ্গে রাজবাড়ী অভিমুখে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন একজন মাত্র ব্রাহ্মণ বহু ব্যক্তিকে তর্পণ করাচ্ছেন। যারা তর্পণ করছিল তারা সাহা জাতীয়। অশুদ্ধ মন্ত্রে অবিধি অপ্রণালীতে শাস্ত্রীয় ব্যাপার চলছে দেখে ব্রহ্মানন্দ ক্ষুব্ধ হন। কৌতুকাবিষ্ট মন্ত্রী প্রভৃতিব অভিপ্রায় অনুসারে সেই অজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তিনি তর্পণের সুপ্রণালী বলে দিলেন। মন্ত্রী প্রভৃতির ছিদ্রান্বেষী বিপক্ষগণ এ বিষয়ে প্রতিবাদী হলে রাজা সামাজিক বিচারে মন্ত্রী ও অন্যান্যদের দন্ডিত করেন। মন্ত্রী প্রভৃতি সামাজিক দন্ড অগ্রাহ্য করেন। রাজা এতে কুপিত হয়ে তাঁদেব সমাজচ্যুত ও কর্মচ্যুত করলেন। এই থেকে মুষ্টিমেয় 'সাহু' জাতির উৎপত্তি হয়।

এই ঘটনার তিন বছর পরে একটা ঘটনা উপস্থিত হয়ে রাজা ও রাজমন্ত্রীর বিবাদ চিরস্থায়ী করে তোলে। শ্রীহট্টের দেওয়ান আনন্দ নারায়ণ রায় শিবিকারোহণে কার্যস্থানে যাবার সময় একটি বাড়ির সামনে কোনো সুলক্ষণা সুন্দরী বালিকাকে দেখে মুগ্ধ হন ও তাকে বিবাহ করার সঙ্কল্প করেন। বালিকাটি সেন বংশীয়া। কিন্তু এঁর পিতা রাজা সুবিদনারায়ণ কর্তৃক উমানন্দ ও সাহাবণিক সংসৃষ্ট ঘটনায় পবিত্যক্ত ও সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। রাজার বাধা দান সত্ত্বেও দেওয়ান এ বিবাহে প্রতিনিবৃত্ত হন নি। এতে উমানন্দ প্রভৃতি আনন্দিত ও রাজা আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করলেন।

সুবিদনারায়ণের সঙ্গে দেওয়ানের বিবাদ উপস্থিত হলে, দেওয়ান দিল্লীতে এই অভিযোগ করেন যে, রাজা রাজস্ব আদায়ক্রমে সবই আত্মসাৎ করছেন, দুর্গ সংস্কার ও সৈন্যবৃদ্ধি করছেন ও বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। যখন দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে হুমায়ুন ও শের শাহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল, সেই সময় শ্রীহট্টের বৃদ্ধ রাজা সুবিদনারায়ণ ও যুবক দেওয়ান আনন্দনারায়ণ পরস্পর

পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালেন। অভিযোগ উপস্থিত হলে রাজাকে দমনের জন্য দেওয়ান আদিষ্ট হন। 'রাজ্য পরিদর্শক' খোয়াজ ওসমান সহসা রাজাকে আক্রমণ করতে সাহস করেন নি। দেওয়ানের পুনঃ পুনঃ প্ররোচনায় তিনি অবশেষে রাজবাটী আক্রমণে উদ্যত হন।

যুদ্ধের পঞ্চম দিনে সুবিদনারায়ণ নিহত হলেন। খোয়াজ ওসমান রাণী কমলাসুন্দরীকে জানান যে কন্যা ও পুত্রগণের সহিত স্বেচ্ছাপূর্বক আত্মসমর্পণ করলে তাঁর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হবে না এবং অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ সম্রাটের জন্য কেবল তৃতীয়া কন্যা ভানুমতীকে গ্রহণ করা হবে। কমলা সুন্দরী স্বামীর চিতায় সহমৃতা হন, ভানুমতীও বিষ ভক্ষণে কুলরক্ষা করলেন। দেওয়ানের পরামর্শে খোয়াজ রাজপুত্র চারজনকে দিল্লীতে পাঠান। দিল্লীতে রাজপুত্রেরা বাধ্য হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পান। এই গোলযোগের সময় রাজার তিন ভাই ধর্মনারায়ণ, রামচন্দ্রনারায়ণ ও বীরচন্দ্রনারায়ণ ও অন্যান্য রাজ বংশীয়েরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পলায়ন করেন। এঁদের বংশধরেরা ধর্মপুর, বরমচাল, গুড়াভই প্রভৃতি স্থানে বাস করছেন।

রাজ বাড়ীর অব্যবহিত দক্ষিণপূর্ব দিকে 'পাঠানটোলা' নামে এক পল্লী আছে—ওখানে খোয়াজের শিবির ছিল বলে উক্ত নামে খ্যাত হয়েছে।

রঘুনাথ শিরোমণি

রাজা সুবিদনারায়ণের জ্যেষ্ঠা কন্যা রত্নাবতী খঞ্জ ছিলেন। কাত্যায়ন গোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র রঘুপতি রত্নাবতীকে বিবাহ করে পাঁচটি গ্রাম যৌতুক পান। রঘুপতির মা তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। রঘুপতি তাঁর অনভিমতে বিবাহ করায় দুঃখিত হয়ে এই তেজস্বিনী বিধবা কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথকে সঙ্গে নিয়ে দেশত্যাগ করে নবদ্বীপে চলে যান। এই রঘুনাথই বিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি।

রঘুনাথের মায়ের নাম সীতাদেবী, পিতা গোবিন্দ চক্রবর্তী—ইনি শুদ্ধি দীপিকার 'দীপিকাপ্রভা' নামক টীকা রচয়িতা। রঘুনাথের জন্মস্থান পঞ্চখন্ড। সীতাদেবী সপুত্র নবদ্বীপে এসে প্রথম কিছুদিন বিড়ম্বনা ভোগ করেন। পরে বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় তিনি সদয় হয়ে নিজ বাসস্থানে তাঁদের আশ্রয় দেন। সার্বভৌম মহাশয় কয়েকটি কাজে রঘুনাথের অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির প্রাখর্য এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পেয়ে তাকে ন্যায় শাস্ত্র পড়াতে আরম্ভ করেন।

সার্বভৌমের চতুষ্পাঠী রত্নপ্রসবিনী—এইখানে রঘুনাথ ছাড়া স্মৃতিতত্ত্বকার রঘুনন্দন, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভবানন্দ, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, হরিদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও রঘুনাথের বন্ধু ও সমসাময়িক ছিলেন। নবদ্বীপে সে সময় ঢাকা দক্ষিণ ও এর সন্নিহিত অঞ্চল থেকে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল, যথা—শ্রীবাস পন্ডিত, শ্রীরাম পন্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য, মুরারি গুপ্ত, রত্নগর্ভ আচার্য ও তাঁর তিন পুত্র—কৃষ্ণানন্দ জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র। রত্নগর্ভের ভাগবত ব্যাখ্যা শুনে চৈতন্য একদা ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল হয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন।

রঘুনাথ নবদ্বীপে পাঠ সমাপন করে মিথিলায় মহাপন্ডিত পক্ষধর মিশ্রের কাছে পড়তে যান। তিনি অধ্যয়নচ্ছলে প্রশ্ন করে অনেকবার অধ্যাপক পক্ষধরকে বিচারে পরাস্ত করেন।

মিথিলা থেকে 'শিরোমণি' উপাধি লাভ করে নবদ্বীপে প্রত্যাগমনের পর তিনি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে বাসুদেব সার্বভৌম সপরিবারে উড়িষ্যা চলে গিয়েছিলেন। তখন থেকে মিথিলা বিজয়ী শিরোমণি নবদ্বীপে পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধিদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

রঘুনাথের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার বিষয় যে কেবল শ্রুতিপরম্পরায় চলে আসছে তা নয়,—গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত 'চিন্তামণি' গ্রন্থের 'দীধিতি' নাম্নী টীকা, উদয়নাচার্যের 'গুণকিরণাবলীর' ও বল্লভাচার্যকৃত 'লীলাবতীব' টীকা, 'প্রামাণ্যবাদ', 'নানার্থবাদ, 'ক্ষণভঙ্গুরবাদ' 'আখ্যাতবাদ', 'পদার্থখন্ডন' 'আত্মতত্ত্ব বিবেক' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁর অসামান্য বিদ্যাবত্তা ও ধীশক্তির পরিচয় দিচ্ছে।

পক্ষধর রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোনো শাস্ত্রে তোমার অধিকার আছে?' রঘুনাথ উত্তর দিয়েছিলেন—তর্কে আমার বুদ্ধি কর্কশ হলেও, কাব্যশাস্ত্রালোচনা কালে আমার মতি সুকোমল, তন্ত্রশাস্ত্রে সদা যন্ত্রিত এবং কৃষ্ণতত্ত্বালোচনা কালে সংযত বলে জানবেন:

কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে
তর্কেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে
কৃষ্ণেঽপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে॥

বস্তুতঃ রঘুনাথের কবিত্ব প্রতিভাও ছিল। কিন্তু ন্যায়ের চর্চায় ব্রতী হওয়ায় তিনি কবিতা রচনার অবসর পান নি। এই জন্যই 'নমঃ প্রামাণ্যবাদায় মৎ কবিত্বাপহারিণে' ইত্যাদি শ্লোকে প্রামাণ্যবাদকে নমস্কার করেছেন।

রঘুনাথকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—পুত্রকন্যাব জন্যই বিবাহের প্রয়োজন। ব্যুৎপত্তিবাদ আমার পুত্র, লীলাবতী আমার কন্যা। আমাব বিবাহের প্রয়োজন কি?

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রঘুনাথের মৃত্যু হয়।

৮. ইটার পরবর্তী কথা

খোয়াজ ওসমানের কৃত একটি মসজিদের প্রস্তরলিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি অধুনালুপ্ত মুয়াজ্জমাবাদ থেকে হুসেন শাহের অধীনে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরস্থ তদীয় বিজিত যুক্তরাজ্য শাসন করতেন। মুয়াজ্জমাবাদে তিনি ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে এক মসজিদ প্রস্তুত করেন। দক্ষিণ শ্রীহট্টের অধীন ভুজবল গ্রামেও একটি 'খোয়াজের মসজিদ' আছে।

অসম্ভব নয় যে হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রের সঙ্গে তাঁর বংশ বিলুপ্ত হলে, যখন শেরশাহ রাজ্যাধিকার করেন, তখন খোয়াজ মুয়াজ্জমাবাদ থেকে ইটায় আসেন। এই স্থানে তিনি

শান্তভাবে অবস্থিতি করায় প্রথমতঃ রাজানুগ্রহ লাভে সমর্থ হলেও পরে শেরশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপন করেন। মুয়াজ্জমাবাদের সীমা লাউড় রাজ্য স্পর্শ করেছিল।

খোয়াজের প্ররোচনায় ইতিপূর্বে প্রতাপগড়ের জমিদার বাজিদ, ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ির জমিদার রায়েমত আলী ও মসনদ আলী প্রভৃতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। কেদার রায় প্রমুখ পূর্ববঙ্গের অন্য জমিদাররা এঁদের সঙ্গে যোগ দেন। এঁরা পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে একদল আফগান অশ্বারোহীসহ সম্রাট শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তরফ অধিকারান্তে ইটা, কানিহাটী ও শ্রীহট্ট সহরে সসৈন্যে সুদৃঢ়ভাবে অবস্থিতি করেন।

তখন লোদী খাঁ নামে এক যুদ্ধ বিশারদ ব্যক্তি শ্রীহট্টের শাসনকর্তা ছিলেন। সম্রাট বিদ্রোহ দমনের সম্পূর্ণ ভার এঁদের উপর অর্পণ করেন। ক্রমাগত কয়েকটি যুদ্ধে বিদ্রোহীদের বল ক্ষয়িত হয়। ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এক ভীষণ যুদ্ধে খোয়াজ ওসমান নিহত হন। শ্রীসূর্য মৌজায় খোয়াজ ওসমানের দুর্গ, দীঘি প্রভৃতি দেখে অনুমিত হয় তিনি এদেশে বাড়ি প্রস্তুত করে বাস করছিলেন।

রাজা সুবিদনারায়ণের রাজ্যচ্যুতির পর তাঁর পুত্রেরা দেশে প্রত্যাগমন করে সম্পূর্ণ রাজ্য করায়ত্ত করতে সমর্থ হন নি। কালক্রমে ইটা থেকে আলীনগর প্রভৃতি স্থান খারিজ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের সম্পত্তি বহুপরিমাণে হ্রাস পায়। তখন স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারার্থ এঁরা পঞ্চগ্রাম নিবাসী রাজারাম দাস নামক জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দূত নিযুক্ত করে দিল্লী প্রেরণ করেছিলেন।

রাজারাম ও তাঁর মধ্যম ভ্রাতা প্রজাপতি সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। প্রজাপতি সংস্কৃত ভাষায় চন্ডীর একখানা টীকা রচনা করে যশস্বী হয়েছিলেন। রাজারাম দূতস্বরূপ দিল্লী উপস্থিত হন ; তাঁর দৌত্য মঞ্জুর হলে তিনি বাদশাহের কাছ থেকে একটি সনদ প্রাপ্ত হন।

রাজারাম ধর্মপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ঠাকুরবাণীর শিষ্য হলেও স্বপ্নাদেশ পেয়ে কাত্যায়ন গোত্রীয় জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশের কাছে শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করেন। শ্রীহট্ট সহরের জঙ্গলবাসী জনৈক সন্ন্যাসী তাঁকে একছড়া জপমালা ও এক শালগ্রাম শিলা দিয়েছিলেন। শিলা ও মালা লাভের পরই তিনি দূত নিয়োজিত হন।

রাজারাম শ্রীধর নামে এক দেবতা প্রতিষ্ঠা করে শ্রীধরপুর গ্রামে স্থাপন করেন। তিনি স্বপ্নাদেশে এক শিমুল গাছে কালীর অধিষ্ঠান জানতে পেরে কালীর প্রকাশ করেন।

রাজা সুবিদনারায়ণের বংশীয়গণ মুসলমান ধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দু রীতি-নীতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে চলতেন।

৯. ইটার বিবিধ কথা

ইটার পূর্ব দিগ্‌বর্তী কানিহাটী চতুর্দশ শতাব্দীতে জনৈক হিন্দু রাজার অধিকারে ছিল বলে অবগত হওয়া যায়। এঁর নাম আসম রায়, ইনি ত্রিপুর রাজবংশের এক শাখাভুক্ত ছিলেন। শাহজলালের অন্যতম সঙ্গী সেলিমউদ্দীন আসম রায়ের রাজ্য অধিকার করে নেন।

রাজা সুবিদনারায়ণ ছাড়া ইটার দেওয়ানগণের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুসলমান আমলে উপযুক্ত হিন্দুগণও উচ্চপদে নিযুক্ত হতেন; এমন কি দেশের সর্বপ্রধান শাসনকর্তা ও সেনাপতির পদও হিন্দুগণ লাভ করতে পারতেন—নবাব হরকৃষ্ণ ও সেনাপতি হরদয়াল তার নিদর্শন। মুসলমান আমলে যে সকল শ্রীহট্টবাসী হিন্দু উচ্চপদে আরূঢ় ছিলেন তার মধ্যে ইটাবাসী অর্জুন বংশীয় কানুনগোগণ ও সম্পদ সেন এবং শ্যাম রায় দেওয়ানের নাম করা যেতে পারে।

ইটার কানুনগোদের মধ্যে রতিরাম খ্যাতনামা ব্যক্তি। এঁর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ইটার কানুনগো ছিলেন—বংশানুক্রমে এপদ তাঁরা ভোগ করেন। খোয়াজ ওসমানের দেওয়ান ছিলেন নরসিংহ দাস।

ইটার দেওয়ানদ্বয়ের মধ্যে পঞ্চেশ্বরবাসী সম্পদ সেন ঢাকা-নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত হন। দেওয়ানের যত্নে ইটা থেকে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অনেক ভূমি খারিজ হয়ে যায়। ঐ সময়ে শ্রীহট্টে সমসের খাঁ ফৌজদার ছিলেন, এবং উক্ত খারিজাভূমি তাঁর নামানুক্রমে সমসের নগর নামে আখ্যাত হয়।

ইটার প্রসিদ্ধ দেওয়ান শ্যাম রায় সম্পদ সেনের অব্যবহিত পরবর্তী। দেওয়ানের পূর্বপুরুষ চক্রধর দত্ত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাঢ় দেশ থেকে এসে ইটায় বাস করেন, তাঁর বাসস্থান দত্তগ্রাম নামে খ্যাত হয়। চক্রধর থেকে দশম পুরুষ হরবল্লভ রায়। হরবল্লভ বিজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি দেশের পাটওয়ারী পদে নিযুক্ত হন। পাটওয়ারী কানুনগো থেকে নিম্নপদস্থ রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী। হরবল্লভ দিল্লীতে জনৈক ওমরাহের অনুগ্রহে দিল্লীশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়ে সদর কানুনগোর আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে কানুনগো পদে উন্নীত হন। সদর কানুনগো মহতাব খাঁর প্ররোচনায় শ্রীহট্টের কুখ্যাত নবাব শুকুর উল্লা হরবল্লভ বিনাঅনুমতিতে ইষ্টকালয় নির্মাণ করেছেন এই মিথ্যা অভিযোগে তাঁর উপর প্রচন্ড নির্যাতন চালাতে থাকেন, উপরন্ত হরবল্লভের বিধবা কন্যা মালতীকে তিনি বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হত, সে অবস্থায় চারদিক থেকে তাঁর উপর কাঠের টুকরা নিক্ষিপ্ত হত। অচিরে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

হরবল্লভের পুত্র শ্যাম রায় ও বিনোদ রায় কুল ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ভগ্নী মালতীকে সঙ্গে নিয়ে এই অত্যাচারের প্রতিকারার্থে মুর্শিদাবাদে গমন করলেন। সেখানে বসন্ত রোগে মালতীর মৃত্যু হয়। শ্যামরায় সেখানে খবর পান পিতার মৃত্যু হয়েছে। শ্যামরায় বহুদিন মুর্শিদাবাদে ছিলেন। রাজা রাজবল্লভের সহায়তায় তিনি মুর্শিদাবাদে নবাবের কৃপা লাভ করেন ও নবাবের আদেশে অত্যাচারী শুকুর উল্লা পদচ্যুত হন। শ্যামরায় ভাগলপুরের দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন।

দেশে ফিরে শ্যামরায় বিরাট ভূসম্পত্তির অধিকারী হন ও একটি বৃহৎ দীঘি খনন করেন। দেওয়ানের দীঘির কার্য সমাধা হলে শ্যামরায় পুনরায় মুর্শিদাবাদে গমন করেন। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিসূচিকা রোগে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

১০. প্রতাপগড় রাজবাড়ী

প্রবাদানুসারে প্রতাপগড়ের প্রাচীন নাম ছিল সোনাই কাঞ্চনপুর। প্রতাপগড়ের পূর্বাংশ চরগোলায় জগৎ সিংহের গড় নামে পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এক মৃন্ময় প্রাচীর আছে। প্রতাপ সিংহ ও জগৎ সিংহ এই দুটি প্রাচীন নৃপতির নাম প্রবাদে শোনা যায়, কিন্তু এঁদের পরিচয় অজ্ঞাত। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষভাগে পোড়ারাজা নামে ত্রিপুরার রাজবংশীয় কোনো ব্যক্তি দেওরালির অধিপতি ছিলেন। পারস্য থেকে আগত মৃজা মালিক মোহম্মদ তোরাণী নামক এক বিদেশী কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে পোড়া রাজাকে হঠিয়ে দেওরালির অধিপতি হন। তোরাণীর জনৈক বংশধর মালিক প্রতাব একবার মহিষ শিকার উপলক্ষে প্রতাপগড়ে আমীর আজফর নামক এক ব্যক্তিব গৃহে অতিথি হন। প্রতাপগড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি সেখানেই থেকে যান ও আমীর আজফরের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই প্রতাবের নাম থেকেই সম্ভবতঃ প্রতাপগড় নামের উৎপত্তি। ত্রিপুরার সিংহাসনের জন্য যখন ধন্যমাণিক্য ও প্রতাপমাণিক্যের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। মালিক প্রতাব প্রতাপমাণিক্যকে সাহায্য করেন ও এর স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতাপগড়ের অধিপতি হন।

মালিক প্রতাবের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বাজিদ রাজা হন। কাছাড়ের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে বাজিদ জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীহট্টের ভূতপূর্ব কানুনগো গহর খাঁ সহকারী সুবিদরাম ও রামদাস সংগৃহীত রাজস্ব আত্মসাৎ করে সুলতান বাজিদের আশ্রয় নিলে হুসেন শাহের সঙ্গে তাঁর বিবোধ বাধে। হুসেন শাহের আদেশক্রমে সরওয়ার খাঁ (সর্বানন্দ) বিদ্রোহ দমন করেন, এবং বাজিদের সুলতান উপাধি রহিত করে তাঁকে নিরূপিত রাজস্বপ্রদানে বাধ্য করা হয়। পববর্তীকালে আফতারউদ্দীনের আমলে কাছাড় রাজাদের হাতে পরাভূত হয়ে প্রতাপগড় কাছাড় রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হয়।

১১. প্রতাপগড়ের হিন্দু নবাব

প্রতাপগড়ের জমিদার গোলাম আলী চৌধুরীর আমলে রাধারাম (লালা) নামক জনৈক ব্যক্তি শ্রীহট্টে সহর থেকে এসে তাঁর সম্পত্তির অনেকাংশ গ্রাস করেন। এক সন্ন্যাসীর কৃপায় রাধারাম প্রথম প্রতাপগড়ে আসেন ও জমিদার গোলাম আলীর বাড়ির পাশে এক দোকান স্থাপন করেন। সেই দোকানই তাঁর উন্নতির কারণ। সুচতুর রাধারাম গোলাম আলীর অধিকাংশ ভূসম্পত্তি গ্রাস করেন। কিন্তু গোলাম আলীর পুত্র গোলাম রজা চৌধুরীর বিরুদ্ধে একটি মামলার ফল আশানুরূপ না হওয়ায় রাধারাম ইংরাজদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। চরগোলায় গিয়ে তিনি নতুন বাড়ি প্রস্তুত করে কয়েকটি কুকি সর্দারের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। তিনি কুকি প্রভৃতিকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললেন এবং স্বয়ং স্বাধীন নবাব বলে পরিচয় দিতে লাগলেন। তিনি বাড়ির পাশে বিচারালয়, কয়েদখানা, কেল্লা প্রভৃতি স্থাপন কবলেন। রাধারাম কোম্পানীর রাজস্ব দিতেন না, ত্রিপুরার মহারাজাকেও কিছু দেওয়া আবশ্যক বোধ করেননি।

রাধারাম ক্ষমতার অপব্যবহার আরম্ভ করলেন। ধনজন-সম্পন্ন ব্যক্তিরও নিস্তার ছিল না, বন্য কুকির হস্তে অচিরেই মৃত্যু ঘটতো। রাধারামের বিচারপ্রণালীও ছিল নৃশংস।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাধারাম চরগোলার থানাদারকে আক্রমণ করে প্রকাশ্যে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্থিত হন। ক্রূরমতি রাধারাম একবার কালীপূজায় ছল করে তাঁর বন্ধু কানুরাম চৌধুরীকে নরবলি দেবার চক্রান্ত করেন। গোলাম রজা এসব খবর ব্রিটিশের কর্ণগোচর করায় শ্রীহট্টের রেসিডেন্ট ও কালেকটর লিন্ডসে একদল সৈন্য রাধারামকে দমনের জন্য শণবিল দিয়ে জলপথে প্রেরণ করেন। রাধারাম পার্শ্ববর্তী ঘাঁটি থেকে গুলি চালিয়ে সৈন্যগণের নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। কানুরাম চৌধুরী রাধারামের হাত এড়িয়ে পালাবার পর ব্রিটিশকে চরগোলার গোপন স্থলপথ দেখিয়ে দেন। যুদ্ধে হেরে রাধারাম ছদ্মবেশে কিছুদিন ছিলেন—পরে সিদ্ধেশ্বরের বারুণীতে ধৃত হন। তাঁকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করে শ্রীহট্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাধারাম পথে আত্মহত্যা করে ইংরাজের দন্ড থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। তাঁর পুত্রদেরও বহুদিন কারাগারে বাস করতে হয়।

সমাপ্তি

গৌড় শ্রীহট্টের অন্তর্গত খন্ডরাজ্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। কমলা গজদন্ত ঢাল ইত্যাদি উৎপন্ন দ্রব্য দিল্লী প্রভৃতি স্থানেও সগৌরবে শ্রীহট্টের গৌড়ের নাম ঘোষণা করতো। যখন আধুনিক ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলা গঠিত হয় নি, সুবর্ণগ্রাম পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিল, বঙ্গের পূর্বপ্রান্তে যখন একমাত্র শ্রীহট্ট জেলাই স্বনামখ্যাত ছিল, সেই সময় গৌড়ের সীমারেখা কোনো কোনো স্থানে ঢাকার সীমা স্পর্শ করেছিল।

এই গৌড় রত্নপ্রসবিণী ছিল,—এর এক এক সন্তান গুণে অদ্বিতীয়, ধর্মে অতুলনীয়, জ্ঞানে প্রবীণ, উৎসাহে নবীন, কর্মে কৃতী, বিক্রমে বীর, বিদ্যায় বিপুলযশঃ ছিলেন। এখানকার বিশেষত্ব বিশেষ খ্যাত, এই জন্যই বোধ হয়—

'সর্বত্র ত্রিবিধাঃ লোকাঃ উত্তমাধমমধ্যমাঃ
শ্রীহট্টে মধ্যমো নাস্তি চট্টলে নাস্তি চোত্তমাঃ'॥

ইতিকথার উৎপত্তি হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় ভাগ

তৃতীয় খণ্ড— মুসলমান প্রভাব

(লাউড়)

অধ্যায়— ১. পূর্ববর্তী রাজগণ

২. জগন্নাথপুরের কথা

৩. বাণিয়াচঙ্গের কথা

দ্বিতীয় ভাগ

তৃতীয় খণ্ড— মুসলমান প্রভাব

(লাউড়)

১. পূর্ববর্তী রাজগণ

বর্তমান লাউড় পরগণাতে প্রাচীন লাউড় রাজ্যের প্রধান নগর ছিল। লাউড় প্রকৃতির এক রম্য নিকেতন। অতি প্রাচীনকালে এই স্থান কামরূপের ভগদত্ত রাজার অধীন ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লাউড়ে বিজয় মাণিক্য নামে এক হিন্দু নৃপতি রাজত্ব করতেন। জগন্নাথপুরে 'বিজয় রাজার বাড়ি' বলে যে ভগ্নাবশেষ আছে সেখানে একটি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গেছে। এই মুদ্রায় বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে 'রাজা বিজয় মাণিকা শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেব্যা শক ১১১৩'।

বিজয় মাণিক্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। জগন্নাথ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বিজযমাণিক্যেব আশ্রয়ে এক বাসুদেব বিগ্রহ স্থাপন করেন। দেবসেবা নির্বাহের জন্য রাজা যে ভূমিদান করেন তা ব্রাহ্মণের নামানুসারে জগন্নাথপুর বলে আখ্যাত হয়।

বিজয় মাণিক্যের বহুকাল পবে এদেশে মুসলমানগণের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজা বল্লালসেন কুলীনদের মধ্যে মর্যাদা স্থাপন করেন। ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভাস্কর বৈদান্তিক বল্লালসেনের সভা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর ছেলে আরু ওঝা নাড়ুলী গ্রামে বাস করতেন বলে 'নাড়িয়াল' নামে পরিচিত হন এবং সিদ্ধ শ্রোত্রীয়পদ প্রাপ্ত হন। এঁর বংশজাত শ্রীপতি লাউড়াধিপতির সভাপণ্ডিত হয়ে লাউড়ে এসে বাস করেন। শ্রীপতির অন্বয়জাত নরসিংহ নাড়িয়াল বিদ্যাশিক্ষার জন্য গৌড় সন্নিধানে রামকেলী গ্রামে গমন করেন ও জটাধর সর্বাধিকারীব কাছে সংস্কৃত ও ফার্সিভাষা শিক্ষা করেন। তাঁর গুণগ্রাম জ্ঞাত হয়ে দিনাজপুরের রাজা গণেশ তাঁকে স্বীয় অমাত্য পদে বরণ করেন। ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গণেশ দ্বিতীয় শ্যামসুদ্দীনকে নিহত করে গৌড় অধিকার করেন। নরসিংহের পরামর্শে গণেশ বহুতর দেবমন্দির, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজত্বে হিন্দুধর্ম কিছুকালের জন্য মাথা তুলেছিল।

সামাজিক বিষয়েও নরসিংহের কম আধিপত্য ছিল না ; বারেন্দ্র সমাজে তিনি অগ্রণী ছিলেন। নরসিংহ মধুমৈত্রকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করায় বারেন্দ্র সমাজে 'কাপ' নামে এক মধ্যবর্তী শ্রেণীর উৎপত্তি হয়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লাউড় দেশ কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ নৃপতি দিব্যসিংহ কর্তৃক শাসিত হয়। দিব্যসিংহের রাজধানী লাউড়ের নবগ্রামে ছিল। নবগ্রামবাসী পূর্বোক্ত নরসিংহ নাড়িয়ালের পুত্র কুবের তর্কপঞ্চানন রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন।

কুবের ছিলেন অতি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ধর্মপরায়ণ। কুবেরাচার্য ও নাভাদেবীর পুত্র অদ্বৈতাচার্য ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মাঘমাসে নবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈতের জন্মগ্রহণের পর রাজা দিব্যসিংহেরও একটি নবকুমার জাত হয়। নবগ্রামে এই রাজকুমার অদ্বৈতের খেলার সঙ্গী ছিলেন। অদ্বৈতের পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। তিনি বাল্যকালেই লাউড়ের পণাতীর্থের মহিমা প্রকাশ করেছিলেন।

অদ্বৈত যে ভবিষ্যতে একজন মহাপুরুষ বলে খ্যাত হবেন তখনই তার লক্ষণ ব্যক্ত হয়েছিল। তাঁর সর্বভূতে দয়া ও গুরুজনে একান্ত ভক্তি দেখে সবাই প্রীত হতেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন, তাঁকে শ্রুতিধর বলা হত। কুবেরাচার্য তাঁকে অধিকতর বিদ্যালাভের জন্য শান্তিপুরে প্রেরণ করেন। পূর্ববাটী গ্রামে অধ্যাপক শান্ত দ্বিজের গৃহে বাস করে তিনি দর্শনাদি শাস্ত্র শিক্ষা করেন। কিছুকাল পরে কুবেরাচার্য রাজকার্য ত্যাগ করে গঙ্গাতীরে বাসের জন্য শান্তিপুরে চলে যান। লাউড়বাসী বিজয়পুরী নামক এক সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্রপুরীর সতীর্থ ছিলেন। অদ্বৈতের বাল্যকালীন চরিত্র শুনে মাধবেন্দ্রপুরী তাঁকে দেখতে আগ্রহী হন। মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুরে এলে অদ্বৈত তাঁর কাছে দীক্ষা নেন।

পিতার মৃত্যুর পর অদ্বৈত ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত তীর্থ পর্যটন করেন ও নানাস্থানের সাধু-মহাত্মাদের সঙ্গে সম্মিলিত হন। তীর্থদর্শনের পর তিনি শান্তিপুরে প্রত্যাগমন করে এক আন্দোলন উপস্থিত করেন। এই সময় থেকে তিনি বৈষ্ণব সমাজের নেতা।

শতাব্দজীবী অদ্বৈতাচার্যের পত্নীদ্বয়ের নাম— শ্রী ও সীতাদেবী। তাঁর পাঁচ পুত্র, যথা অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, স্বরূপ, জগদীশ ও বলরাম মিশ্র।

লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত পুত্রের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে কাশী যাবার পথে শান্তিপুরে গমন করেন। অদ্বৈতের সংস্রবে থেকে অদ্বৈতের উপদেশে রাজা শক্তি উপাসনা ত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করলেন। রাজা দিব্যসিংহের বৈষ্ণব অবস্থার নাম কৃষ্ণদাস— সাধারণ্যে 'লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস' নামে খ্যাত। শান্তিপুরের অনতিদূরে গঙ্গাতীরে এক বিস্তৃত পুষ্পোদ্যান নির্মাণ করে কৃষ্ণদাস সেখানে বাস করতে লাগলেন— ঐ স্থানের নাম হয় 'ফুল্লবাটী'। অদ্বৈতাচার্যের বাল্যচরিত যা তিনি নবগ্রামে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেন তা অবলম্বনে কৃষ্ণদাস সংস্কৃত ভাষায় সংক্ষেপে এক গ্রন্থ রচনা করেন, এ গ্রন্থের নাম বাল্যলীলাসূত্র। তাছাড়া তিনি সংস্কৃত 'বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী' গ্রন্থের পয়ার ছন্দে অনুবাদ করেন।

ঈশাননাগর অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য ও অনুচর ছিলেন। ঈশানের জন্মস্থান লাউড়। তাঁর পিতা দরিদ্রব্যক্তি— আত্মীয় বন্ধু বিহীন। স্বামীর মৃত্যুর পর ঈশান জননী শান্তিপুরে গিয়ে অদ্বৈতপ্রভুর আশ্রয় নেন। সে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। অদ্বৈতাচার্যের যত্নে ঈশান নাগর কালক্রমে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তিনি শাস্ত্র চর্চা না করে সর্বদা তাঁর পরিচর্যা করে পরিতৃপ্ত হতেন। ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বৈতপ্রভু অপ্রকট হন। ঈশান স্বীয় গুরুর জীবনকাহিনী লিখে রাখতে ইচ্ছা করলেন। রাজা দিব্যসিংহের গ্রন্থে গুরুর শ্রীহট্টীয় লীলা প্রাপ্ত হলেন এবং অদ্বৈতের আবাল্যসঙ্গী পদ্মনাভ ও শ্যামদাসের নিকট শান্তিপুরে সংঘটিত ঘটনাবলী শুনে লিখে রাখেন। অদ্বৈত একদা ঈশানকে বলেছিলেন তাঁর অবর্তমানে ঈশান যেন লাউড়ে গিয়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। শ্রীহট্টে এসে ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঈশান নিজ সংকল্প অনুযায়ী অদ্বৈতাচার্যের লীলা ঘটিত যে গ্রন্থ রচনা করেন তার নাম ‘অদ্বৈতপ্রকাশ’। গ্রন্থখানি ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়— ঈশানের বয়স তখন সত্তর বছরেরও বেশি।

২. জগন্নাথপুরের কথা

কারো কারো মতে জগন্নাথপুর ও বানিয়াচঙ্গের রাজবংশ একমূলোৎপন্ন। দুই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কেশব— কিন্তু এঁরা দুই ভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে হয়।

জগন্নাথপুরের কেশবের এক বংশধর দুর্বার দিল্লী সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করে খাঁ উপাধিতে ভূষিত হন। দুর্বার খাঁর পুত্র রাজসিংহ বা পণ্ডিত খাঁ; এঁর তিনপুত্র জয়, বিজয় ও পরমানন্দ।

বাণিয়াচঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিত্রের বংশীয় পদ্মনাভ বাণিয়াচঙ্গের সৌষ্ঠব বিশেষরূপে বর্ধিত করেন; সুবৃহৎ সাগরদীঘি তাঁরই কীর্তি। বাণিয়াচঙ্গে তিনি অনেক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা করেন, সুদূর কোটালিপাড়া থেকে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকে বাণিয়াচঙ্গে স্থাপন করেন। পদ্মনাভের একাদশ পুত্রের মধ্যে গোবিন্দ খাঁ সর্বকনিষ্ঠ হলেও রাজ্যাধিকার করেন। এঁর রাজ্যসীমা জগন্নাথপুরের রাজা জয়সিংহ ও বিজয় সিংহের ভূমি স্পর্শ করেছিল। জয় ও বিজয় সিংহ গোবিন্দ খাঁর সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু গোবিন্দের মতো প্রতাপশালী ছিলেন না।

লাউড়ের অধিপতির বংশ বিলোপ ঘটলে লাউড়ের অরক্ষিত প্রজাদের উপর খাসিয়ারা অত্যাচার করতে আরম্ভ করে। প্রজারা এই বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার জন্য গোবিন্দ খাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করে। গোবিন্দ খাঁ খাসিয়াদের বিতাড়িত করে লাউড় রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। সেকালে লাউড় ও জগন্নাথপুরের রাজবংশীয়দের মধ্যে রাজ্য অবিভক্তভাবে ছিল। দিল্লী দরবারে লাউড়পতির নামে এজমালি কর প্রদত্ত হত। বস্তুতঃ সেকালে এজমালি সম্পত্তির উপর সামান্য কর নির্দিষ্ট থাকলেও স্বাধীন লাউড় রাজ্যের উপর কোনোরূপ কর অবধারিত ছিল না। তবে লাউড়াধিপতি মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্তরক্ষক রূপে পরিগণিত হতেন।

গোবিন্দ খাঁ খাসিয়াদের বিতাড়িত করে— লাউড় রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন কিন্তু রাজস্ব পূর্বের মতো জয় ও বিজয় সিংহকে বহন করতে হত। গোবিন্দ খাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস না থাকায় ক্ষুব্ধ জয় ও বিজয় দিল্লীর দরবারে লাউড় রাজ্যের অধিকার প্রাপ্তির প্রার্থনা করলেন।

গোবিন্দ খাঁকে নেওয়ার জন্য দিল্লী থেকে যে আরিন্দা (দূত) আসে গোবিন্দ তাকে পদাঘাতে নিহত করেন। গোবিন্দকে কৌশলে বন্দী করে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হয়। গোবিন্দ প্রাণে বেঁচে গেলেও জাত্যন্তরিত হন, তাঁর নাম হবিব খাঁ রাখা হয়। বাণিয়াচঙ্গের ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজগণ এই সময় থেকে মুসলমান হন।

জয়সিংহ দিল্লী থাকা কালে ভ্রম বশে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বিজয় সিংহ হবিব খাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তে ক্ষান্ত হন নি। কবিবল্লভ নামক প্রতাপশালী দস্তিদারের মধ্যস্থতায় হবিব খাঁ ও বিজয়সিংহের মধ্যে সাময়িকভাবে আপোষ হলেও পরে পুনরায় বিবাদ বাধে ও বিজয়সিংহ নিহত হন। জগন্নাথপুরের পতন ঘটে সেই সঙ্গে।

বিজয় সিংহের সময়ে রাঘব ভট্টাচার্য নামে ভরদ্বাজ গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ মিথিলা থেকে আসেন— বিজয় সিংহ তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাঘব পণ্ডিতের বংশধরেরা শিক সোণাইতা পরগণার সাচায়ণী গ্রামে বাস করছেন।

জয়সিংহ ও বিজয় সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবদ্বীপে বিদ্যার্থীভাবে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এদেশে আগমন করেন। কেশবপুরের প্রসিদ্ধ দত্তবংশীয়গণ তাঁর বশসম্ভূত বলে কথিত। তাঁরা রাজ আশ্রিত ছিলেন; রাজার অবস্থা বিপর্যয়ে অন্যের দ্বারস্থ হতে তাঁদের প্রবৃত্তি হয় নি,— তাঁরা অনন্যচিত্তে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ ক'রেন। এই সময়ে রাধা মাধব দত্ত সংস্কৃত ভাষায় 'গীত গোবিন্দের টীকা', 'ভারতসাবিত্রী', 'ভ্রমরগীতা' এবং বাঙলায় 'কৃষ্ণলীলা' গীতিকাব্য, 'পদ্মপুরাণ' ও 'সূর্যব্রত পাঁচালী' রচনা করেন। পরবর্তীকালে তদ্‌বংশীয় ভক্ত রাধারমণ দত্তের কৃষ্ণলীলা পদাবলী বৈষ্ণব সমাজে আদৃত হয়।

৩. বাণিয়াচঙ্গের কথা

বাণিয়াচঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিত্রকে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে নবাগত বলতে হয়। তিনি বাণিজ্য ব্যপদেশে এদেশে আগমন করেন। কেশবের কর্মচারী জনৈক বণিক বা বাণিয়া ছিল। সেই বাণিয়া ও নৌকাচালক চঙ্গ জাতীয় ব্যক্তির যুগ্ম নামানুসারে 'বাণিয়া চঙ্গ' নামে সেই স্থান খ্যাত হয়। বাণিয়াচঙ্গের জনৈক দেওয়ানের মতে ফার্সি 'বানায়ে জঙ্গ' (যুদ্ধের স্থল) পদ থেকে এই নামের উদ্ভব। নগরের নাম থেকে পরে পরগণার নামকরণ হয়।

বাণিয়াচঙ্গের রাজাদের অধিকৃত ভূপরিমাণ নিতান্ত অল্প ছিল না। এক সময় শ্রীহট্টের উত্তরসীমা থেকে দক্ষিণে ভেড়া মোহনা নদী পর্যন্ত স্থান জুড়ে তাঁদের রাজ্য ছিল। বর্তমানে আয়তন হ্রাস পেলেও এর মতো বৃহৎ পরগণা শ্রীহট্টে অল্পই আছে। ১৯০১ সালের গণনাকালে বাণিয়াচঙ্গের লোক সংখ্যা ছিল ২৮৮৮৩ জন। এতবড় গ্রাম সমস্ত বঙ্গদেশে আছে কিনা সন্দেহ।

কেশবের বংশধর পদ্মনাভ ও গোবিন্দ খাঁর কথা পূর্বে বলা হয়েছে। মুসলমান হবার পর হবিব খাঁ লাউড়ের বাড়িতে অধিক সময় বাস করতেন। হবিব খাঁর পৌত্র আনওয়ার খাঁর আমলে খাসিয়া পাহাড়ের কয়েকটি সর্দার একত্র মিলিত হয়ে লাউড় আক্রমণ করে। তাঁদের পশুবৎ আক্রমণে লাউড় জনহীন হয়ে পড়ে। এই দুর্যোগের কালে আচার্যের পীঠরক্ষক নাগর বংশীয়েরা পালিয়ে গোয়ালন্দের কাছে ঝাকপাল গ্রামে চলে যান। নবগ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হল এবং পার্বত্যভূমি বলে অতি অল্পকাল মধ্যে জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ল। লাউড়ের জঙ্গলে এখনো 'বাণিয়াচঙ্গের হাবিলি' নামে এক দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

আনওয়ার খাঁ মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে 'দেওয়ান' উপাধি পান। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে আহমদ খাঁ খ্যাতনামা। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মগ ও পোর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার দমন করার জন্য ঢাকায় 'নাওরা বিভাগ' স্থাপিত হয়। এর ব্যয় নির্বাহার্থ পূর্ববঙ্গের অনেকগুলি মহাল খারিজ হয়ে ঢাকার নেজামত সেরেস্তাভুক্ত হয়। বাণিয়াচঙ্গ পরগণার কোনো মহাল ঐ জন্য খারিজ না হলেও নবাব আলীবর্দি খাঁর সময়ে বাণিয়াচঙ্গপতির উপর ৪৮টি সুবৃহৎ কোষনৌকা (রণতরি) যোগাবার ভার পড়ে। সে অনুসারে তিনি ৪৮ খানা কোষনৌকা যোগাতেন এবং সেজন্য 'নাওরা জায়গীর' উল্লেখে মহালের তিন চতুর্থাংশ রাজস্ব বাদ পেতেন। এই বাদ-পাওয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬১৯৪৮ টাকা। তাছাড়া দিল্লী রাজদরবারের জন্য শীতল পাটি, তসর বস্ত্র ও হাতী প্রেরণের জন্য আরো কয়েক হাজার টাকা বাদ পাওয়া যেত।

বাণিয়াচঙ্গ কর্মচারীদের মধ্যে 'লস্কর', 'সরদার', 'জমাদার' উপাধিধারী কর্মচারীবর্গ শাসন-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এঁদের অনেকেই কালক্রমে জমিদার শ্রেণীতে গণ্য হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ পাইল গাও জমিদার বংশের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বংশীয় হুলাসরাম চৌধুরী দেওয়ান উমেদ রজার এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। প্রভুর অনুগ্রহে তিনি অনেক ভূমি দান প্রাপ্ত হন। তাঁর আয়ত্তভূমি তখন চাষযোগ্য ছিল না; পরে তা আয়কর হয়ে এক জমিদারীরূপে পরিণত হয়।

বাণিয়াচঙ্গের প্রধান ব্রাহ্মণবংশগুলি ব্যতীত নাগ, নন্দী, দত্ত ও সেন এই কয়েকটি মৌলিক ভদ্র বংশ। দত্ত বংশ এখন নির্বংশ। নবাগতদের মধ্যে জগদীশপুরের দত্ত, চুন্টার সেন, সুঘরের মজুমদার বংশীয়েরা পূর্ব গৌরবে সম্মানিত। সেন বংশীয় শিবচরণ দাতারূপে বিখ্যাত হন। ভট্টদের দ্বারাও বাণিয়াচঙ্গ দূরদূরান্তে পরিচিত হয়েছে। মকরন্দ রায় ও নারায়ণ ভট্ট বিখ্যাত কবিতা রচয়িতা ছিলেন।

৬

দ্বিতীয় ভাগ

চতুর্থ খণ্ড— মুসলমান প্রভাব

(জয়ন্তীয়া)

অধ্যায়— ১. আদি নৃপতিগণ
২. আহোম বিজয়
৩. পরবর্তী কীর্তি
৪. ব্রিটিশাধিকার
৫. রাজস্বাদির কথা
৬. বিবিধ কথা

দ্বিতীয় ভাগ

চতুর্থ খণ্ড— মুসলমান প্রভাব

(জয়ন্তীয়া)

১. আদি নৃপতিগণ

উত্তর শ্রীহট্ট মহকুমার উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত জয়ন্তীয়া পরগণাগুলি প্রাচীন জয়ন্তীয়া রাজ্যের একাংশ মাত্র। জয়ন্তীয়া রাজ্য অতি প্রাচীন। জয়ন্তীয়ার অধিপতিগণ যেরূপ দীর্ঘকাল স্বাধীনতা সম্পদ ভোগ করেছেন বহুস্থানের রাজাদের ভাগ্যে তা ঘটে নি।

আকবরের রাজস্ব সচিব রাজা টোডরমল জয়ন্তীয়াকে 'সরকার শ্রীহট্টের' একটি 'মহল' রূপে নির্ধারণ করে এর রাজস্ব (২৭২০০ দাম) ৬৮০ টাকা স্থির করেন। ত্রিপুরা সম্বন্ধেও এরূপ নির্দেশ আছে। আইন-ই-আকবরির এ নির্দেশ কতদূর যথার্থ তা বলা যায় না। আকবরের রাজত্ব সময়ে জয়ন্তীয়া কি ত্রিপুরা মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয় নি বলে ব্লকমেন সাহেব সিদ্ধান্ত করেছেন। রল্‌ফ্ ফিচের ভ্রমণ বৃত্তান্ত আলোচনা করলেও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। আবার জয়ন্তীয়াবাসীরা আজো শ্রীহট্টের অপরাংশকে মোগলান শব্দে নির্দেশ করে থাকে। মোগলদের অধিকৃত জনপদ 'মোগলান' শব্দের বাচ্য। এতেও মোগল সম্রাটদের শাসনকালে জয়ন্তীয়া স্বাধীন ছিল বলে নিরূপিত হয়। সুতরাং আইন-ই-আকবরির বর্ণনা নিরর্থক হয়ে পড়ছে। তবে এরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে, আকবরের রাজত্ব সময়ে জয়ন্তীয়ার কিছুটা অংশ মোগল সাম্রাজ্যের করদ হয়ে থাকবে। 'সরকার শ্রীহট্টের' আটটি মহলের মধ্যে জয়ন্তীয়ার রাজস্ব সর্বাপেক্ষা অল্প থাকায় সেই অংশের আয়তনের ক্ষুদ্রতাই উপলব্ধ হয়।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জয়ন্তীতে কামদেব নামে জনৈক হিন্দু নরপতি রাজত্ব করতেন। মালব দেশের অন্তর্গত ধারানগর অধিপতি মুঞ্জরাজের কিঞ্চিৎ পরে কামদেবের সময় নির্দেশ করা যেতে পারে। মুঞ্জরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ভোজরাজ। ইতি 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ' গ্রন্থের রচয়িতা এবং ইনিও কামদেবের সমসাময়িক। এঁর রাজত্বকাল একাদশ শতাব্দীর মধ্যে অনুমান করা যেতে পারে।

কবিবাজ নামক কবিকৃত প্রসিদ্ধ 'রাঘব পাণ্ডবীয়' গ্রন্থের প্রথমে মুঞ্জ রাজের নামোল্লেখ আছে। 'রাঘব পাণ্ডবীয়' গ্রন্থের প্রথম সর্গে লিখিত আছে যে, কবিরাজ জয়ন্তীপুর-পতি কামদেবের সভায় ছিলেন এবং তাঁর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তিনি 'রাঘব পাণ্ডবীয়' গ্রন্থ রচনা করেন। অনুমিত হয়, জয়ন্তীপুর-পতির আগ্রহে কবিরাজ ধারানগরী থেকে জয়ন্তীয়ায় আগমন করেছিলেন। কামদেব মধ্যদেশ থেকে ব্রাহ্মণ এনেছিলেন বলে উল্লিখিত আছে।

পবিত্র জয়ন্তীক্ষেত্র পুরাকালে এক সমৃদ্ধ হিন্দুবাজ্য ছিল। জৈমিনি ভারতে যে নারীরাজ্যের উল্লেখ আছে এই জয়ন্তীই সেই নাবীবাজ্য। কহ্লন বাজতরঙ্গিণী গ্রন্থের চতুর্থ তরঙ্গে লিখেছেন— কাশ্মীর রাজ জয়াপীড় দিগবিজয়ে বার হয়ে বিশাল স্ত্রীরাজ্য জয় করেন। বস্তুতঃ বামজঙ্ঘা পীঠ বহুকাল হিন্দু নৃপতি কর্তৃক বক্ষিত হয়ে এসেছিল। কথিত আছে জয়ন্তীয়ার শেষ চারজন হিন্দু রাজা ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন— এঁরা হলেন, কেদাবেশ্বর বায়, ধনেশ্বর বায, কন্দর্প রায, জয়ন্ত বায়।

খস ও সিন্টেঙ্গ জাতীয়দের উৎপাতে জয়ন্তীয়াব প্রাচীন রাজ্যেব বিলোপ ঘটে। কিন্তু এও যে কত পুরাতন ঘটনা তা নির্দেশ করা কঠিন। সেই সময় পার্বত্য জাতীয়েরা জয়ন্তীক্ষেত্রে উপস্থিত হলে তাদের দলপতি বাজপদাভিষিক্ত হয়েছিলেন। প্রাচীন মুদ্রা ও তাম্রফলক থেকে বিশজন স্বাধীন নৃপতির নাম সংগ্রহ করা যেতে পারে, তাঁদের মধ্যে পর্বত রায়ই প্রথম। পববর্তী বাজাদের মধ্যে বড় গোসাঞি ধর্মানুবাগী ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ১৫৪৮ থেকে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জযন্তীয়া রাজ্য শাসন করে গেছেন। যে মহাপীঠের জন্য জয়ন্তীয়া জনসাধারণেব কাছে পবিত্র তীর্থরূপে পূজিত, এই ধর্মানুরাগী রাজার কালে সেই মহাপীঠ পুনঃ প্রকাশিত হয। বড গোসাঞিব পর বিজয় মানিক সম্ভবতঃ ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ কবেন। ঐ সময়ে ত্রিপুরাযও বিজয মাণিক্য নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। এঁর পবাক্রমেব সংবাদ শ্রবণে জয়ন্তীয়াপতি স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন কবেছিলেন। কোচবিহাবের বাজা নবনারায়ণের সেনাপতি চিলা রায় কাছাড় ও মণিপুব জয়ের পর জয়ন্তীয়া আক্রমণ কবেন। যুদ্ধে বিজয মানিক্যের মৃত্যু হয়।

বিজয়মানিক্যের পুত্র প্রতাপরায়কে নরনারায়ণ করদ রাজারূপে জয়ন্তীযাব সিংহাসন প্রদান করেন সত্য কিন্তু তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচারেব অধিকাব থেকে বঞ্চিত হন। প্রতাপ রায়েব মৃত্যুব পব ধনমানিক্য রাজসিংহাসন লাভ কবেন। তিনি ক্ষমতাবান নৃপতি ছিলেন, তবে এক-যুদ্ধেব পব কাছাডপতি শত্রুদমনেব কাছে পবাভূত হযে কব দিতে স্বীকৃত হন।

জয়ন্তীয়া রাজপরিবারের মধ্যে বিবাহপ্রথাব প্রচলন নেই, এজন্য ভাগিনেয়ই বাজসিংহাসনের অধিকারী হতেন। জয়ন্তীয়াপতিগণ হিন্দুধর্মাশ্রিত হলেও তাঁদের পূর্বপুরুষাচরিত পার্বত্যবীতি ত্যাগ করতে পারেন নি।

পরবর্তী রাজা যশোমানিক্য পশ্চিম কোচরাজ্যের অধীশ্বর লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করে প্রত্যাগমন কালে স্ত্রী ও তাম্রনির্মিত এক দেবীমূর্তি নিয়ে দেশে প্রত্যাগমন করেন। এই মূর্তিই জয়ন্তেশ্বরী মূর্তি। যশোমানিক্য বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে এই মূর্তি স্থাপন করে এঁর সেবা পরিচালনের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

২. আহোম বিজয়

ছোট পর্বতরায়ের মৃত্যুর পরে যশোমন্তরায় ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। এই সময় দীর্ঘ আট বছর কাল জয়ন্তীয়ার সঙ্গে আহোমদের বিরোধ চলে। পরবর্তী রাজা বাণসিংহ। এঁর রাজত্বকালের মুদ্রার সামনের দিকে লেখা ছিল 'শ্রীশ্রীজয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শাকে ১৫৯১' এবং বিপরীত দিকে 'শ্রীশ্রীরঘুনাথ পাদপদ্ম পরায়ণস্য'। জয়ন্তীয়ার স্থানীয় ভাষায় এই মুদ্রাকে কাটরা টাকা বলে। টাকার একদিকে তরবারি (কাটারি) মুদ্রিত থাকায় ঐরূপ নামকরণ হয়। কোচরাজ নবনারায়ণের অনুজ্ঞায় জয়ন্তীমুদ্রাতে রাজগণের নাম মুদ্রণের প্রথা রহিত হয়েছিল।

বাণসিংহের পর লক্ষ্মীনারায়ণ, অতঃপর রামসিংহ রাজা হন। রামসিংহের এক দুষ্কর্মের ফলে জয়ন্তীয়া আহোম সৈন্য কর্তৃক বিজিত হয়।

কাছাড়রাজ তাম্রধ্বজ আহোমরাজ রুদ্রসিংহকে কর দেওয়া বন্ধ করলে রুদ্রসিংহ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যত হন। তাম্রধ্বজ জয়ন্তীয়ার রামসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রামসিংহ কিন্তু সাহায্যচ্ছলে তাম্রধ্বজকে বন্দী করেন। তাম্রধ্বজের পত্নী রাণী চন্দ্রপ্রভাবতী তখন জয়ন্তীয়ারাজের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিয়ে স্বর্গদেব রুদ্রসিংহকে অনুরোধ করেন এর বিহিত করতে। সে অনুসারে আহোমরাজ রামসিংহের কাছে দূত পাঠান। রামসিংহ আহোমরাজের বাক্যে কর্ণপাত না করায় রুদ্রসিংহ রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। দীর্ঘকালস্থায়ী রক্তক্ষয়ী প্রচণ্ড যুদ্ধের পর রামসিংহ পরাভূত ও বন্দী হন। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ঘোষিত হয় যে জয়ন্তীয়া ও কাছাড় রাজ্য আহোমরাজ্যের অঙ্গীভূত করা হল। রুদ্রসিংহ এই রাজনৈতিক সংবাদ শ্রীহট্টের তদানীন্তন ফৌজদার মতিউল্লা বাহাদুরকে জ্ঞাপন করেছিলেন। এপ্রিল মাসে রুদ্রসিংহ সেলা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। তাম্রধ্বজ একটি নির্দিষ্ট কর প্রদান করবেন নির্ধারিত হলে তাঁকে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে দেওয়া হল। রামসিংহের সঙ্গে যখন চুক্তি বিষয়ে আলোচনা চলছিল সে সময় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আহোমরাজের এই বিজয় গৌরবে তাঁর অধীন কার্যকারকবৃন্দ বিশেষ স্পর্ধিত হয়ে উঠেছিল। সেসময় শ্রীহট্টের থানাদারের (ফৌজদার) সঙ্গে আহোমরাজের গৌহাটিস্থিত প্রতিনিধি বড়ফুকনের যে পত্র বিনিময় হয়েছিল তাঁর উদাহরণস্বরূপ দুখানা চিঠি উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। প্রথম পত্রখানা ফৌজদার প্রেরিত, দ্বিতীয়টি এর উত্তর। পত্রের সঙ্গে ফৌজদার ক-টি উপহারও পাঠিয়েছিলেন।

প্রথম পত্র

"স্বস্তি সর্ব শাস্ত্রাভ্যাসাতি কুল দমন দলিত যশোরাশি বিরাজিতাশেষ বিবিধ গুণালঙ্কৃত স্বধর্ম নিপুণ স্বকুল কমল প্রভাকর সুহৃজ্জনদন কুমুদ সমুন্মেষণ নৃপবৃন্দার্চিত মহা মহত্তর মহোগ্র প্রতাপেষু।

প্রত্যেভিক্সাদ কোয়ং বর্ণ নিচয়সমিহসাম্যৈকং তৎসভাবতা মনুবেদমিহেতরং।

পরঞ্চ সমাচার এহি। প্রীতিপত্র এথা আমি শুভক্ষণে পৌঁছিল। যেরূপ নিমক হারাম জয়ন্তা ও কাছাড়ীর কারণ লিখিলা সেরূপ হৈব। প্রাচীন আমার পিতা নবাব নাথুল খাঁ চিরাজি (সিরাজি) কোচবেহার ও রঙ্গামাটীর সুবা আছিলা তাতে তোমাঠ ঠাই অধিক প্রীতি আছিল। এখন পত্র পায় আমার অন্তঃকরণে অধিক প্রীতি উৎপন্ন হইল, পরস্পর প্রীতি প্রতিপালন উচিত। আপনি লিখিয়াছিলা রামনিয়াব খাঁর যোগে বঙ্গামাটী পথক্রমে ˜নবাব সঙ্গে প্রীতি হইয়াছে। এবে ৴ কারণ এই ক্রমে আগত অধিক প্রীতি হইবে। অধিক প্রীতিতে অনেকরূপ কার্য হইবে। অল্প দিবস হয় আমি এথা আসিয়াছি। থানার কার্যতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই দিগের থানা দৃঢ় করিয়া সেই দিগের থানাত ফৌজ পাঠাইতেছি। আরু তোমার মানুষর মুখহস্তে সমাচার শুনিয়া প্রত্যুত্তর কহিযাছি শুনিবা। আপনে লিখিছিলা দ্রব্যের কারণ লিখিবার তাতো সকল দ্রব্যই প্রীতির অধীন। এখন যে আমাত উপস্থিত হয়, তানে লিখিয়া পাঠাব। আরু তোমার যে দ্রব্যের কারণ থাকে তাকে লিখিবা। এখনে ভালদ্রব্য উপস্থিত নহয় কারণ উত্তম দ্রব্য না পাঠাইলাম। আর আমার মানুষ পাঠাইতেছি তাহাতে সকল গোচর হইবা। আমার মনুষ্য শীঘ্র বিদায় দিবা। এমত করিবা তোমার আমার মানুষ সর্বদায়ে প্রেমপত্র লৈয়া গতাগত করে কুশলাদি বার্তায় সন্তোষ করে। এ জ্ঞাত করিলাম। কিমধিকং বিজ্ঞবরেষ্বিতি শঁক ১৬২৯ তারিখ ১৫ মাঘ।'

'এই চিঠির লগত সন্দেশ আনিছিল— পটুকা + কাপর— ১, পাগুরি ১, শাল কাপর ১ জোর, গুজরাতি আত্লকঞ্চ + ১, এলচা + ১, আতলঞ্চ + ৫, মুঠত ১০ কাপর।'

দ্বিতীয় পত্র

ফৌজদার মতিউল্লা প্রেরিত হৃদয়রাম সিপাইর হাতে বড়ফুকন প্রত্যুত্তর দেন—

স্বস্তি নিখিল কল্যাণ নিলয় নিজগুণানুরঞ্জিত সকল সজ্জনমানস শ্যামলকুল কমল প্রকাশকারণ শ্রীযুত শ্রীহট্ট স্থানাদার সম্প্রতি লেখনং প্রয়োজনঞ্চ।

পূর্ব সমাচার এহি। তোমার পত্র সমাচার পহুছিল। তাহার শুনিয়া পরম প্রসন্ন হৈলাম। আর তোমার পিতা সমেত পূর্ব প্রীতি স্মরিয়া এইক্রমে অধিক প্রীতি হৈবে হেন যি লিখিছা এ বিশেষ কিন্তু পরস্পর যেমতে প্রীতি হয় তেমন করিবা। আর জয়ন্তা ও কাছারিও আমার ঠাই নিমকহারাম করিলেক। তার কারণে ৴যে তারে যে অবস্থা করিলেন তাহাক তুমি দেখিয়াছ। অতএব তোমার মাঝে যেমন বিগড়ি নয় সেই করিবা। আর তোমার আমার মধ্যে সীমার নিবন্ধ এহি আদ্যাবধি জয়ন্তাত কছারীত অঠিক হৈল তাহাত আমি অনা বঢা ন করিব ও তুমিও সেই সীমাতে রহিবা; প্রীতি বাঢে তাকে করিবা। অতস্পর উভয় তরফের কুশলাদি সমাচার যেমনে গতাগত হুয়া থাকে, সেই করিবা। আর তোমার পত্র মনুষ্য সহিত আমার মনুষ্যে শীঘ্রে বিদায় দিবা। কিমধিকং বিজ্ঞেয়মিতি শঁক ১৬২৯। তারিখ ফাল্গুণ।'

(আসাম বন্তি— ১ম ভাগ ২৬ সংখ্যা।)

৩. পরবর্তী কীর্তি

রামসিংহের উত্তরাধিকারী জয়নারায়ণ রাজকোষে একান্ত অর্থাভাব দর্শনে প্রথমেই টাকা প্রস্তুত করতে মনোনিবেশ করেন।

শ্রীহট্ট চূড়খাইড় পরগণার সেনগ্রাম নিবাসী আগমবাগীশ উপাধিধারী জনৈক ব্রাহ্মণ হাটকেশ্বর মহাদেবকে জয়ন্তীয়ার বড় হাওর নামক স্থান থেকে নিজ গ্রামে এনে স্থাপন করেন। হাটকেশ্বর শিব শ্রীহট্টের হিন্দু রাজা গোবিন্দের পূজিত দেবতা। মুসলমান আক্রমণের কালে এই শিব প্রান্তবর্তী হিন্দুরাজ্য জয়ন্তীয়ার জঙ্গলাচ্ছাদিত প্রান্তরে ব্রাহ্মণগণকর্তৃক আনীত ও রক্ষিত হন। রাজা জয়নারায়ণ ক্রুদ্ধ হয়ে সসৈন্যে সেনগ্রামে আগমন করেন। চূড়খাইড় সম্ভবতঃ সে সময় জয়ন্তীয়া রাজ্যের অধীন করা হয়। জয়ন্তীয়ার শেষ রাজা রাজেন্দ্র সিংহের সময় পর্যন্ত এটি জয়ন্তীয়ার অধীন ছিল। অবশ্য শিব আর স্থানান্তরিত হলেন না,— আগমবাগীশকে তাঁর সেবায়েত নিযুক্ত করা হল।

জয়নারায়ণেব এক ভ্রাতা 'স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীর কলুষিত প্রণয়ে মুগ্ধ' হযে তাকে নিয়ে পলায়ন করেন। কাছাড়পতি তাদের আশ্রয় দেওয়ায় কাছাড় ও জয়ন্তীয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধলে জয়ন্তীয়াপতির ভ্রাতা ও তার প্রণয়িনী দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রবাদ অনুসারে এঁরা অঙ্গামী নাগা সরদারদের আদি পিতামাতা। প্রবল সংগ্রামে কাছাড়-রাজ পরাজিত হন, মাইবঙ্গ নগরী বিনষ্ট হয়। কাছাড়পতি বর্তমান কাছাড় প্রদেশে উপনীত হয়ে খাসপুরে রাজপাট স্থাপন করেন।

১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর বড় গোসাঞি (দ্বিতীয়) সিংহাসনারোহণ করেন। শোনা যায় একসময় বড় গোসাঞি এবং তাঁর ভগ্নী গৌরী কুয়রীকে সামন্তরাজ খাইরামের 'সিম' (অধিপতি) ধৃত করে নিয়েছিলেন। অবশেষে চেরাপুঞ্জীর সিম্ অমরসিংহের প্রেরিত এক ব্যক্তির সহায়তায় তাঁরা বিমুক্ত হন। কথিত আছে, বড় গোসাঞির সময়ে নিজপাটেব প্রসিদ্ধ কালীমূর্তি স্থাপিত হন। এই কালীব এমন মাহাত্ম্য ছিল যে কোনো ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের আদেশ পেয়েও কালীবাড়িতে আশ্রয় নিতে পারলে দণ্ড হতে মুক্ত হত। এই কালীর অর্চনার জন্য লীলাপুরী নামক এক মহাপুরুষকে নিযুক্ত করা হয়। বড় গোসাঞি লীলাপুরীর কাছ থেকে সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করেন— তখন তাঁর নাম রাখা হয় 'রাজপুরী'।

বড় গোসাঞি সন্ন্যাস গ্রহণ করলে পব ছত্রসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। শ্রীহট্টের কোন কোন অধিবাসীর উপর অত্যাচার করাতে মেজর হেনিকার (Major Henniker) কর্তৃক এঁর রাজত্ব সময়ে জয়ন্তীয়া জয় করা হয়। পরে জয়ন্তীয়ারাজ অর্থদণ্ড দিয়ে কোম্পানীর তুষ্টি বিধান করলে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জয়ন্তীয়া ব্রিটিশ কবল থেকে মুক্ত হয়।

রামসিংহ (দ্বিতীয়) ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। ধর্ম বিষয়ে রামসিংহের বিশেষ উৎসাহ ছিল। প্রথম যৌবনে তিনি নিত্যানন্দ গোস্বামী নামক ব্রাহ্মণের কাছে দীক্ষিত হন এবং ঢুপী নামক গ্রামের ৪০০ হাত উঁচু একটি সুন্দর শৈলচূড়ায় এক উচ্চচূড় মন্দিরে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রামেশ্বর নামক শিব স্থাপন করেন। শিবের সন্নিকটে একটি প্রস্তরময় বৃষ ছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মন্দির বিচূর্ণিত হয়। এই মঠের নামই ঢুপীর মঠ।

ব্রহ্মযুদ্ধের আরম্ভকালে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে জয়ন্তীয়াপতি ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তাতে 'জয়ন্তীয়া অধিপতির স্বাধীনতা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে' এই মর্মের সর্তও ছিল। ব্রহ্মদেশীয় একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল জয়ন্তীয়া রাজ্য সীমার নিকটবর্তী হলেও ইংরাজ সৈন্য ও রাজসৈন্য সম্মিলিত হবার সংবাদ পেয়ে তারা চলে যায়।

রামসিংহের শাসনকাল পবম শান্তিতে অতিবাহিত হয়েছিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছব কাল তিনি জয়ন্তীয়াব শাসনদণ্ড পরিচালনা কবেন। তাঁর সময়ে জয়ন্তীয়ায় অনেক মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজদত্ত ভূসম্পত্তি পেয়ে অনেকেই অবস্থার উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়। দেশেব দারিদ্র্য দূর হয়েছিল। রাজা রামসিংহেব মৃত্যুর সঙ্গে জয়ন্তীয়ার সৌভাগ্যসূর্য চিরঅস্তমিত হয়।

জয়ন্তীয়াব স্বাধীন নৃপতিবর্গের নাম ও সম্ভাবিত শাসনকাল উল্লেখ করা যাচ্ছে—

১. মহাবাজ পর্বতরায়— (১৫০০—১৫১৬ খ্রী.)
২. ,, মাঝ গোসাঞি— (১৫১৬—১৫৩২ খ্রী.)
৩. ,, বুড়া পর্বতরায— (১৫৩২—১৫৪৮ খ্রী.)
৪. ,, বড় গোসাঞি (প্রথম)— (১৫৪৮—১৫৬৪ খ্রী.)
৫. ,, বিজয় মানিক— (১৫৬৪—১৫৮০ খ্রী.)
৬. ,, প্রতাপ রায়— (১৫৮০—১৫৯৬ খ্রী.)
৭. ,, ধনমানিক— (১৫৯৬—১৬১২ খ্রী.)
৮. ,, যশোমানিক— (১৬১২—১৬২৫ খ্রী.)
৯. ,, সুন্দররায়— (১৬২৫ —১৬৩৫ খ্রী.)
১০. ,, ছোট পর্বত রায়— (১৬৩৬—১৬৪৭ খ্রী.)
১১. ,, যশোমন্ত রায়— (১৬৪৭—১৬৬০ খ্রী.)
১২. ,, বাণসিংহ— (১৬৬০—১৬৬৯ খ্রী.)
১৩. ,, প্রতাপসিংহ— (১৬৬৯—১৬৭৮ খ্রী.)
১৪. ,, লক্ষ্মীনারায়ণ— (১৬৭৮—১৬৯৪ খ্রী.)
১৫. ,, রামসিংহ (প্রথম)— (১৬৯৪—১৭০৮ খ্রী.)
১৬. ,, জয় নারায়ণ— (১৭০৮—১৭৩১ খ্রী.)
১৭. ,, বড় গোসাঞি (দ্বিতীয়)— (১৭৩১—১৭৭০ খ্রী.)

১৮. ,, ছত্রসিংহ— (১৭৭০—১৭৮০ খ্রী.)

১৯. ,, যাত্রানারায়ণ বা বিজয়নারায়ণ— (১৭৮০—১৭৯০ খ্রী.)

২০. ,, রামসিংহ (দ্বিতীয়)— (১৭৯০—১৮৩২ খ্রী.)

৪. ব্রিটিশাধিকার

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় রামসিংহের আমলে কয়েকটি ব্রিটিশ প্রজাকে ধরে জয়ন্তেশ্বরীর কাছে বলি দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগ জানিয়ে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এক সুতীব্র পত্র লেখা হয়। ফালজোরের কালীবাড়িতে নরবলি দেবার চরেরা ভিন্নরাজ্য থেকে লোক সংগ্রহ করে থাকে— সেকালে শ্রীহট্টবাসীর এ এক ভীষণ ভয়ের বিষয় ছিল। রামসিংহের মৃত্যুর পর ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। ঐ বছর কটি ব্রিটিশ প্রজাকে কালীর সামনে বলি দেওয়ার কথা প্রচারিত হয় ; এতেই বিভ্রাট ঘটে। রাজা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন। শোনা যায় কোনো প্রাক্তন মন্ত্রী কৌশলে একটি ঘটনার সৃষ্টিক্রমে ব্রিটিশ সরকারের গোচরীভূত করেন। জয়ন্তীয়ার সামন্তরাজা গোভার অধিপতি ছত্রসিংহ এই অনর্থের মূল। তাঁর নিয়োজিত চরেরা বলির জন্য চারটি ব্রিটিশপ্রজা ধরে নিয়ে যায়।

প্রায় আড়াই বছর কাল রাজা ও সরকারের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে অনেক লেখালেখি হল, প্রকৃত হত্যাকারীকে বার করে দিতে বলা হল, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। তখন শাস্তিস্বরূপ জয়ন্তীয়ার সমতল ক্ষেত্র ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনাধীন করা হয়। রাজাকেও ছলনা করে বন্দী অবস্থায় শ্রীহট্ট সহরে আনা হয়। রাজার বয়স মাত্র ষোল। তাঁর রাজ্যের পার্বত্য অংশ তখনো গৃহীত হয় নি। কিন্তু লাভজনক সমতলাংশ হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষোভ ও অভিমানে তিনি পার্বত্য অংশও স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলেন। এরপর তাঁকে আমৃত্যু পাঁচশো টাকা মাসিক বৃত্তি দিয়ে শ্রীহট্টে রাখা হল। ১৮৬১ খ্রী. রাজা রাজেন্দ্রসিংহের মৃত্যু হয়।

৫. রাজস্বাদির কথা

জয়ন্তীয়ার সমতল ক্ষেত্রের উত্তরসীমা খাসিয়া জয়ন্তীয়া পাহাড়, পূর্বে কাছাড় জেলা, দক্ষিণে সুরমা নদী, উত্তরকাছ, দক্ষিণকাছ ও ইছাকলস পরগণা, পশ্চিমে বরমু, পিয়াইন, তেলিখাল নামক অপ্রশস্ত তিন নদী। পরিমাণ ৪৮৪ বর্গমাইল। রাজাদের সময়ে আয়তন সময় সময় আরো বর্ধিত হত।

কিন্তু তখন জয়ন্তীয়া রাজ্যের আয় যথেষ্ট ছিল না। প্রজাদের কাছ থেকে প্রধানতঃ শস্যাদি গ্রহণ করা হত, নগদ টাকা অল্পই আদায় করা যেত। হাটবাজার ও ঘাট ইত্যাদি থেকে নগদ প্রায় নয় হাজার টাকা বার্ষিক আদায় হত। অর্থদণ্ড ও উপহার ইত্যাদি নগদ আয়ের মধ্যে গণ্য ছিল। নগদ আয় এই সমুদায়ে ত্রিশ হাজার টাকার বেশি ছিল না।

ভূমির উপর যে কর ধার্য ছিল, সরকারী কাগজপত্রে তার নিরিখ বা পরিমাণ অতি সামান্য ছিল বলে দেখা যায়। বিশ হাল জমির খাজনা মধ্যে সামান্য কিছু শস্য ও নগদ ৮, আট টাকা মাত্র হিসাবে আদায় করা হত। শারদীয়া পূজার সময় কিছু দ্রব্যাদি আদায় হত। পার্বত্য অঞ্চল থেকে যে বেশি কিছু আদায় হত না তা সহজেই অনুমিত হয়। প্রত্যেক পার্বত্য পল্লী থেকে বার্ষিক একটি করে পুং ছাগল রাজস্বস্বরূপ পাওয়া যেত।

এইরূপ রাজস্ব আদায়ের প্রথা থাকায়, রাজকোষে বিশেষ অর্থ সঞ্চিত হোক বা না হোক, রাজাদের আবশ্যকীয় ব্যয় ও কার্য নির্বাহে কোনো অসুবিধা ঘটত না। কারণ কোনো কর্মচারীকেই নগদ টাকায় বেতন দেওয়া হত না, প্রত্যেকেই তাদের পদানুরূপ ভূমি লাখেরাজ পেত।

রাজা যখন দরবারে বসতেন তখন যথানির্দিষ্ট স্থানে সভাসদ, মন্ত্রী, সভাপণ্ডিত, সেনাপতি প্রভৃতি উপবেশন করতেন; এঁদের অধিকাংশই শ্রীহট্টবাসী বাঙ্গালী ছিলেন। রাজার তিনপাশে পরিচারকবর্গ দাঁড়িয়ে থাকতো। সেনাপতিরা প্রায়ই শ্রীহট্টের হিন্দু সাধারণ থেকে নিযুক্ত হতেন। রাজা বড় গোসাঞির সেনাপতি মাণিক্য রায়ের নাম জানা গেছে। শ্রীহট্টবাসী হিন্দু সেনাপতি নিয়োগ করায় রাজাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভিন্নজাতীয় সেনাপতি থাকায় খাসিয়া বা সিন্টেং সর্দারেরা তাঁদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে অগ্রসর হত না। জয়ন্তীয়ার রাজকীয় চিহ্ন ছিল সিংহ। সনদ, তাম্রশাসন এবং পতাকাদিতে সিংহ চিহ্নই অঙ্কিত থাকতো।

জয়ন্তীয়া রাজ্য ব্রিটিশাধিকৃত হলে প্রথমেই সমতল ভূমির পরিমাণ নির্ধারণার্থ জমি পরিমাপ করার বন্দোবস্ত হয়। ক্রমাগত ছয়বার ভূমির বন্দোবস্ত হয়েছে। প্রতি বন্দোবস্তেই রাজস্বের হার ও ভূপরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে রাজস্বও বেড়ে গেছে। প্রথম বন্দোবস্তে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩৫,৯৮৮, টাকা। ১৮৯২.৯৭ সালের ষষ্ঠ বন্দোবস্তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২,২১,৭২৮, টাকা।

৬. বিবিধ কথা

জয়ন্তীয়ায় সাধারণতঃ অধিক বৃষ্টি হয়ে থাকে, নদীর বেগ প্রখর। জয়ন্তীয়ায় লোভা, গোয়াইন, পীযাইন, চেঙ্গরখাল, তেলিখাল, হাবিগাঙ্গ ও বড়গাঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি প্রবাহিত, এরা সুরমা নদীতে পড়েছে (চেঙ্গরখাল গোয়াইন নদীর শাখা বিশেষ)। এইসব নদীপথে জয়ন্তীয়ার অন্তর্বাণিজ্য নির্বাহিত হয়। তেজপাতা, কমলা, লঙ্কা, পাখা, পান, ঝলাঙ্গ ও কাঠ ইত্যাদি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

জয়ন্তীয়ায় প্রায় আঠাশটি বাজারের মধ্যে নিজ পাটের বাজার সর্ববৃহৎ। জয়ন্তীয়ার ভূমি স্বভাবতঃ উর্বরা। ধান যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে থাকে। পূর্বে জয়ন্তীয়াবাসীরা দুর্ভিক্ষ

কাকে বলে জানতো না। কিন্তু ১৩৩৫৭ একর জুড়ে বহু চা-বাগান হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে জয়ন্তীয়ায় প্রতি বছর ধান আমদানী করতে হয়।

শিক্ষা সম্বন্ধে জয়ন্তীয়া হীনদশাপন্ন হলেও (শতাব্দীর প্রারম্ভে জয়ন্তীয়ায় মাত্র দুটি বিদ্যালয় ছিল— একটি মধ্যবঙ্গ, অপবটি মধ্য ইংরেজি) রাজাদের সময়ে শিক্ষিত লোকেরা বিশেষ সম্মান লাভ করতেন। জয়ন্তীয়াবাসী বাঙ্গালী বিরচিত দুখানা প্রাচীন গ্রন্থ আছে, একখানাব নাম রত্নাবলী, দ্বিতীয় গ্রন্থখানার নাম 'অদ্ভুত ভারত'। অন্যায় সমবে অভিমন্যু নিহত হলে পাণ্ডবপক্ষীয় বমণীগণের যুদ্ধ বিবরণ এব প্রতিপাদ্য বিষয়।

শিব ওঝা, রামরায মজুমদার, মোহনরাম ধব প্রভৃতি জযন্তীযাব সঙ্গীত রচয়িতা কবি ; বাজা রাজেন্দ্র সিংহ বাহাদুরকেও এঁদের একাসনে স্থান দেওয়া যেতে পাবে।

নৃপতি কবির একটি ঝুলন সঙ্গীতের নিদর্শনঃ

রাগিণী— সুরট মল্লার তাল— কেওয়ালি

ঘুঙ্গুরোয়া ঝননন বাজে,
দহুঁ ঝোলনা ঝোলে [ধ্রু]
রঙ্গে বঙ্গিণী রঙ্গিযা গোপীয়ানা বিছে
ক্যাবলি আচানক ছাজে (সাজে)॥
ছোওযা বেলি, কুন্দন কেওযালী,
জাই জুই দল বেল চাম্বেলি
মত্তচিত্ত মধুপান মগনমে,
ভ্রমরা ভনন্নন গাজে॥ ১ ॥
রূপ রঙ্গকি ঘটা বনিয়ে
এওছে ছিঙ্গরোয়া বরণ নাহি যাওয়ে,
নিরখি নিবখি বলি যাউ,
চরণকো বাজা রাজেন্দ্র সিংহ মহারাজে॥

[ঘুঙ্গুরোয়া = ঘুঙ্গুর ; গোপীয়ানা = গোপীগণ ; ছোওয়া = ফুলবিশেষ ; গোজে = গুঞ্জন করে ; বিছে = মধ্যে ; বনিয়ে = নির্মিত হওয়া ; এওছে ছিঙ্গরোয়া = এরূপ শৃঙ্গার বা বেশ।]

জয়ন্তীয়া শ্রীহট্টান্তর্গত হলেও জলবায়ুর পার্থক্যের সঙ্গে লোকের প্রকৃতি ও ভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন রকমের ; ভাষায় গ্রাম্যতা দোষ অত্যধিক।

জয়ন্তীয়ায় নিজপাট অর্থে জয়ন্তীয়ার রাজধানী, গ্রামাদিব শেষে প্রায়ই 'খেল', 'খলা', 'চটি', 'ফৌদ', 'দম্‌কি', 'পুঞ্জি' ইত্যাদি শব্দ সংযোজিত দেখা যায়। রাজকীয় শাসন সম্পর্কীয় গ্রামাদি 'খেল', এবং 'কুয়রী' (রাজমাতা বা কন্যা), 'কুয়র' (কুমার), বা উচ্চপদস্থ বাজকর্মচারীর ভোগত্র

ভূম 'খলা' নামে খ্যাত। কয়েকটি গৃহ সমষ্টির নাম 'চটি' ; চার চটিতে এক 'ফৌদ' (ক্ষুদ্রগ্রাম) ; চার ফৌদে এক 'দম্‌কি' (বৃহৎ গ্রাম) হয়ে থাকে। জয়ন্তীয়ার বাঙ্গালীরা 'মোগলান' শব্দে শ্রীহট্টের অপরাংশকে নির্দেশ করে। রাজকীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সংজ্ঞা ছিল 'বিষযধর'। কার্যভেদে বিষয়ধরেরাই সেনাপতি, সহরদার, সুবেদার, মজুমদার, বড়দলই, দলই, মুনসেফ, পুরকায়স্থ, ষষ্ঠী, সেতভ, নক্তি, ওস্তাদ ও কীর্তনী নামে খ্যাত হতেন। বড়দলই ও দলই প্রায়শঃ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পদবী ছিল। মুনসেফগণও সম্মান ভাজন ছিলেন।

জয়ন্তীয়ায় কীর্তনের বিশেষ আদব ছিল, কাজেই কীর্তনী পদবীও সম্মানিত ছিল। বামবায় প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদেব কৃত সুললিত গীতগুলি গান করা কীর্তনীর ও ওস্তাদের কর্ম। মৃদঙ্গ বাদকেব সংজ্ঞা ওস্তাদ। কীর্তন ও সংকীর্তনে বিভেদ আছে। মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে ভাবভেদে রাধাকৃষ্ণ লীলাত্মক গীতই কীর্তন নামে কথিত হয়। সঙ্গীত সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট লোক ভিন্ন অপর লোক কীর্তনেব দলে যোগ দিতে পাবে না। কিন্তু সংকীর্তনে সকলেই যোগদান করতে পারে।

জয়ন্তীযার স্ত্রীলোকেবাও কীর্তন করে। তারা মৃদঙ্গ করতালের পরিবর্তে করতালি দিয়ে গান ধরে। জয়ন্তীয়ার স্ত্রী-সঙ্গীত অশ্লীলতা-বর্জিত এবং তারাও ভাবভেদে ও লীলানুক্রমে গান কবে থাকে,-- এ রীতি তাবা কখনো ভাঙে না। জযন্তীয়ায় খাসিয়া রমণীরা রাসগান কবে থাকে। মণিপুরী কুমারীরাও প্রশংসিত রূপে বাসগান করে। কিন্তু এদের রাসেব তুলনায় তা অতি তুচ্ছ। এদেব সুকণ্ঠ নিঃসৃত সুললিত স্বরলহবী শুনলে কিন্নর গীতি বলে মনে হয়। কবি বাম বায ও মোহন বায় বিশেষ যত্নে এদেব রাসগানের রীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

জয়ন্তীয়ার বাঙালী হিন্দুদের সামাজিক প্রথা অল্প ইতর বিশেষে অপবাপর স্থানেরই মত ; কিন্তু সামাজিক বিচারের প্রথা বলবত্তব ছিল। অপরাধীর দণ্ড হত দুই প্রকার— গলবস্ত্রে ক্ষমা প্রার্থনা ও কীর্তনদানে দোষ ক্ষালন। সামাজিক বিচাব প্রথা ক্রমশঃ লোপ পায়।

জয়ন্তীযার রাজাদেব মধ্যে কোনরূপ বিবাহপ্রথা ছিল না, এই কারণেই রাজাদের মধ্যে পুত্রের সিংহাসনারোহণ করার প্রথা হয় নি এবং এই জন্যই সেখানে ভাগিনেয়গণই উত্তরাধিকার লাভ করে। রাজাদেব মধ্যে বিবাহ বিধি না থাকলেও খাসিয়া প্রজাদের মধ্যে একরূপ বিবাহপ্রথা প্রচলিত। বরকন্যাব মনোমিলন হলেই বিবাহ হয়ে গেল ; অভিভাবককে কিছুই করতে হয় না। বরের পক্ষে কন্যাকে যথাসাধ্য বস্ত্রালঙ্কার দান এবং উভযপক্ষের আত্মীয় স্বজনকে ভোজন করানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। বিবাহেব পব বরকে শ্বশুর গৃহে থাকতে হয়।

এদের মধ্যে বিধবা বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত। বিধবা বিবাহেব নাম 'সেঙ্গা'। একখানা পান ছিঁড়ে ফেলে 'নিকাশ' শব্দ উচ্চারণ করলেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়।

এদেব স্ত্রী পুরুষ সবাই পরিশ্রমী— ভিক্ষুক সংখ্যা নেই বললেই হয়। 'প্রমীলার রাজ্যে' পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অধিক সুশ্রী ও স্ফূর্তিবিশিষ্টা এবং অলঙ্কার প্রিয়া। একটি প্রবাদ বাক্য আছে—

পান পানি নাবী,
তিনে জয়ন্তীয়া পুরী।

জয়ন্তীয়ার রাজারা হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই শাক্ত। কেউ কেউ বৈষ্ণবধর্মেও আস্থাবান ছিলেন। জয়ন্তীয়ায় দুর্গোৎসব পর্ব মহা সমারোহে সম্পাদিত হত; এই সময় নরবলি দানের প্রথা ছিল। মহাবিষুব সংক্রান্তিতেও রাজারা বিশেষ আড়ম্বর করতেন। পার্বত্য খাসিয়াদের মধ্যে সিন্টেংগণ হিন্দুধর্মে আস্থাবান। নাটিয়াঙের সিন্টেংরা দুর্গামাঈ ও কালীমাঈকে পূজা করে থাকে।

রাজাদের স্থাপিত দেববিগ্রহ ও মহাপীঠ জয়ন্তীয়াবাসী বাঙালী ও খাসিয়া সকলে সমভাবে মান্য করে। ফালজোরেব পীঠাধিষ্ঠাত্রী কালী ও রূপনাথ ব্যতীত জয়ন্তেশ্বরীব বিষয় পূর্বে বলা হয়েছে।

বিন্নাটেকের কালী— এই কালী পূর্বে বামজঙ্ঘাপীঠেব নিকটে ছিলেন।

বাউরভাগেব কালী— এক ফুট দীর্ঘ নয় ইঞ্চি প্রশস্ত একখণ্ড পাথরে কালীমূর্তি উৎকীর্ণ— এঁর প্রসাদ কেউ খায না।

গৌরীশঙ্কর— রাজবাড়িব এক মাইল উত্তরে শৈলখণ্ডের উপব এক প্রস্তর খণ্ডে শিব ও দুর্গাব প্রতিমূর্তি অঙ্কিত— দক্ষিণপাশে ছোট গ্রামটির নাম 'গৌবীভুবন'।

উমানন্দী— বড়গাঙ্গেব তীরে প্রাচীরঘেরা এক মন্দিবে হবপার্বতীর মূর্তি বিরাজিত।

ভোলানাথ- (দুজন)— (১) ছয়বুড়ি নদীতীরে অবস্থিত নিজ পাটেব ভোলানাথ। (২) কামাইদ গ্রামেব ভোলানাথ, এই মহাদেবকে কুঠারাঘাত করে জনৈক যবন মাবা যায়।

জগন্নাথ— ডৌডিগ গ্রামে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মূর্তি আছে। বথযাত্রায় রাজাবা এই স্থানে রথ দেখতেন।

নিজ পাটের কালী— মহারাজ বড় গোসাঞি, লীলাপুবী দ্বারা এই কালী প্রতিষ্ঠা করেন, পরে সন্ন্যাসগ্রহণ করে এঁর অর্চনায় জীবন কাটান।

রামেশ্বর শিব— এঁরই মন্দির প্রসিদ্ধ ঢুপীর মঠ

দ্বিতীয় ভাগ

পঞ্চম খণ্ড— ইংরেজ প্রভাব

দ্বিতীয় ভাগ

পঞ্চম খণ্ড— ইংরেজ প্রভাব

১. প্রথম অবস্থা

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানীপদ গ্রহণ করেন। শ্রীহট্ট তখন বাঙ্গালার নবাবের অধীনে ছিল। সুতরাং বাঙ্গালার অপরাপর জেলার মতো শ্রীহট্টেও ওই বছর ইংরাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীহট্টের মুসলমান ফৌজদারের অধিকৃত ২৮৬১ বর্গমাইল ভূভাগের রাজস্ব আদায়ের ভার তাঁরা গ্রহণ করেন; শাসনভার বা ফৌজদারী ক্ষমতা তখনো মুসলমান নবাবদের হাতে ন্যস্ত থাকে।

মোগল শাসনকালে শ্রীহট্ট থেকে হাতী, মসলা, কাঠ প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য ব্যতীত যৎসামান্য কর আদায় হলেও শ্রীহট্ট শাসনকর্তার পদ অতি গৌরবান্বিত বিবেচিত হত— বঙ্গীয় নবাবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গই এখানকার আমিল পদে নিয়োজিত হতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী গ্রহণ করলে পূর্ববঙ্গের রাজস্ব সংগ্রহ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজ নির্বাহের জন্য ঢাকায় 'রেভিনিউ বোর্ড' স্থাপিত হয়। সেই বোর্ড থেকে মিস্টার থ্যাকারে সর্বোচ্চ কর্মচারী রূপে শ্রীহট্টে প্রথম আগমন করেন। তাঁর আখ্যা ছিল 'রেসিডেন্ট'। ইনি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক থ্যাকারের পিতামহ।

থ্যাকারে শ্রীহট্টে পৌঁছে প্রথমে বাসের জন্য এক বৃহৎ গৃহ নির্মাণ করেন। নবাব তালাওয়ের পশ্চিম তীরে, বর্তমানে যেখানে ডেপুটি কমিশনারের বাঙ্গালা বিদ্যমান, সেই গৃহ তারই সন্নিকটবর্তী স্থানে নির্মিত হয়েছিল। (মুরারি চাঁদ কলেজ যে টিলার উপর স্থাপিত তার পূর্বনাম ছিল থ্যাকারে টিলা; থ্যাকারের প্রথম গৃহ সম্ভবতঃ টিলাগড়ে ছিল, পরে তিনি নবাব তালাওয়ের পাশে গৃহ নির্মাণ করেন।) ঐ সময় শ্রীহট্টে কোনো আদালত ছিল না। তরফের সুলতানসিতে নবাবি বিচারালয় ছিল; বিচার প্রার্থীদের সুলতানসি যেতে হত।

থ্যাকারের সময় মেজর হেনিকার পরিচালিত ইংরাজ সৈন্য জয়ন্তীয়া জয়ে সমর্থ হয়। থ্যাকারের পর ঢাকা কাউন্সিলের সদস্য মিঃ হলাণ্ড শ্রীহট্টের ভূস্বামিবর্গের সঙ্গে ভূমির বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায়ের জন্য কাউন্সিল কর্তৃক ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টে প্রেরিত হন। তাঁর হিসাব অনুযায়ী শ্রীহট্টের রাজস্ব নির্ধারিত হয় প্রায় ২,৫০,০০০. টাকা। তিনি এও উল্লেখ করেন যে, শ্রীহট্টের অধিবাসীরা উদ্ধত প্রকৃতির বলে হিসাবানুরূপ রাজস্ব আদায় করা সুকঠিন।

হলাণ্ড সাহেব ঢাকা প্রত্যাগমন করে পুনরায় শ্রীহট্টে আসতে অসম্মত হলে রবার্ট লিগুসে শ্রীহট্টের রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। ইনি দশ বছরেরও বেশী দিন শ্রীহট্টের রেসিডেন্ট ও কালেক্টর ছিলেন।

লিগুসে ঢাকা থেকে মেঘনা নদী হয়ে শ্রীহট্টে আসেন, পথে এত বিস্তৃত হ্রদ পার হয়ে আসতে হয় যে তাঁকে সমুদ্রযাত্রার উপযোগী কম্পাস ব্যবহার করতে হয়েছিল। সময় লেগেছিল সাতদিন। লিগুসে তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, নবাগত রেসিডেন্ট হিসাবে শাহজলালের দরগা পরিদর্শন করে তিনি পীরের সম্মানার্থ পাঁচটি সুবর্ণমুদ্রা উপঢৌকন দিয়েছিলেন এবং দরগা থেকে গৃহে ফিরলে প্রজাপুঞ্জ সম্মান প্রদর্শনে আসতে থাকে। হিন্দু সাক্ষাৎকারীদের উপহৃত রৌপ্যমুদ্রায় তাঁর টেবিল আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল।

লিগুসের প্রধান দুজন কর্মী ছিলেন গুকরি সিং (মতান্তরে গোলাব সিং) ও প্রেমনারায়ণ বসু।

লিগুসে শ্রীহট্টে এসেই এক গোলযোগে পড়েন। মুসলমান ফৌজদারদের সঙ্গে খাসিয়াদের নিয়ত বিরোধ হত। ইংরেজ, পর্টুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি অনেক জাতীয় লোক ব্যবসা উপলক্ষে শ্রীহট্টে থাকতো। 'নিম্নশ্রেণীর' এইসব ইউরোপীয়দের অসদ্ব্যবহারে খাসিয়ারা ক্ষেপে ওঠে। এই ব্যবসায়ীদের রক্ষার জন্য লিগুসে একটি ছোট দুর্গ প্রস্তুত করা আবশ্যক মনে করেছিলেন। দেশের অভ্যন্তরেও উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল একবার। বালিশিরা পরগণায় নীলামে স্বত্বহারানো একব্যক্তি বহুতর সিপাহীকে নিহত ও বন্দী করে কাছারিতে অগ্নিসংযোগ করেছিল।

কড়ির বিভ্রাটেও লিগুসে বিব্রত হন। নবাবি আমলে শ্রীহট্টে কড়ির প্রচলন ছিল। এদেশে রৌপ্য বা তাম্রের প্রচলন ছিল না বললেও হয়। বাঙ্গালা দেশে আর কোথাও কড়ি এমন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত না। আড়াই লক্ষ টাকা রাজস্বে সংগৃহীত হয়েছিল। এই বিপুল পরিমাণ কড়ি নৌকায় পাঠানো ছিল ব্যয়বহুল— এতে শতকরা দশ টাকা ক্ষতি হত। ঢাকায় এই কড়ি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করে— রৌপ্য মুদ্রায় পরিণত করা হত। সুখের বিষয় এপ্রথা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

রেসিডেন্টরূপে লিন্ডসের বার্ষিক বেতন পাঁচ হাজার টাকার বেশি ছিল না সুতরাং তাঁকে ধনোপার্জনের উপায়ান্তর অবলম্বন করতে হয়েছিল। দেশের নিম্নভূমিতে ধান ছাড়া কিছু জন্মাতো না, পাহাড় সংলগ্ন ভূমিতে জন্মাতো আখ, তুলা প্রভৃতি। আরো উচ্চভূমিতে পাওয়া যেত কাঠ, লোহা। তাছাড়া পর্বত শ্রেণী চূণের অফুরন্ত ভাণ্ডার স্বরূপ ছিল। 'যে কড়ি রাশি রাজস্ব স্বরূপ আদায় হত তা দিয়ে আমি চূণ কিনে বিদেশে রপ্তানি করতাম এবং তার মূল্য স্বরূপ রৌপ্য মুদ্রা পেয়ে ঢাকায় রাজস্ব প্রেরণ করতাম।'

লিগুসের সঙ্গে প্রায় একশ সৈন্য ছিল। পার্বত্য প্রদেশের জলবায়ু তাদের সহ্য না হওয়ায় তারা দলে দলে মরতে লাগল। বোর্ডের অনুমতি নিয়ে শ্রীহট্টবাসীদের দ্বারা একদল সৈন্য গঠন করেন।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টে প্রচুর শস্য জন্মেছিল, কিন্তু প্রচুর বৃষ্টি হয়ে হঠাৎ নদীর জল ত্রিশ ফিট বৃদ্ধি পায়। বন্যার ফলে শ্রীহট্ট যে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে তাতে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। সরকার থেকে বিশেষ সাহায্য দেওয়া হলেও লোকের দুর্গতি কমে নি।

এসময় আরেকটি সমস্যা দেখা দেয়। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর প্রিয়পাত্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে বাঙ্গালার কোনো কোনো জেলা ইজারা দিয়েছিলেন, শ্রীহট্ট জেলাও গঙ্গাগোবিন্দ ইজারা নিয়েছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ শ্রীহট্টে আগমন করলে লিণ্ডসে ঢাকা হয়ে কিছুকালের জন্য হিন্দুস্থান ভ্রমণে যান। গঙ্গাগোবিন্দ রাজস্ব সংগ্রহে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হয়ে চলে যান। লিণ্ডসে কাশীতে ছিলেন; জরুরি বার্তা পাঠিয়ে তাঁকে এনে শ্রীহট্টে পুনঃ প্রেরণ করা হয়।

লিণ্ডসেকে সে সময় আর একটি বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি শ্রীহট্টের হিন্দুদের নানাগুণের প্রশংসা করলেও মুসলমানদের উদ্ধত ও অদম্য বলে নিন্দা করেছেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানেরা মোহরম পর্ব উপলক্ষে প্রচণ্ড হাঙ্গামা সৃষ্টি করে। একদল হিন্দু লিণ্ডসেকে গোপনে জানায় যে, মোহরমের দিন অভ্যুত্থান হবে এবং হিন্দু দেবমন্দিরাদিতে আক্রমণের প্রথম সূচনা হবে। উৎসবের দিন রাত পাঁচ ঘটিকার পূর্ব পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি। এরপর দলে দলে হিন্দু প্রাণভয়ে লিণ্ডসের বাসভবনে আশ্রয় নেন, সবার দেহে মুসলমানের অত্যাচারের চিহ্ন বিদ্যমান। বিলম্বের সময় ছিল না। লিণ্ডসে সমস্ত সৈন্যবল নিয়ে লোকসমারোহের দিকে অগ্রসর হলেন। লিণ্ডসেকে দেখে তারা পিছু হটে একটি পাহাড়ের উপর আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের নেতা এক মৌলবী। তার ব্যবহার অতি গর্বিত। বিনা যুদ্ধে মীমাংসা সম্ভবপর কিনা আলাপক্রমে তা জানবার জন্য লিণ্ডসে অগ্রসর হলে মৌলবী 'আজ মরবার দিন নয়, মারবার দিন' বলে লিণ্ডসের মাথা লক্ষ্য করে অসির আঘাত করে। সৌভাগ্যবশতঃ লিণ্ডসে নিজ তরবারি দিয়ে সে আঘাত প্রত্যাহত করতে সক্ষম হন। তাঁর সিপাহীরা তৎক্ষণাৎ গুলিবর্ষণ করতে শুরু করলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। বহুলোক এ দিন হতাহত হয়। লিণ্ডসে বলেছেন, সৌভাগ্যবশতঃ সিপাহীরা পলায়ন করে নি, অন্যথা সহরে একটি ইংরেজও প্রাণে বাঁচত না। লিণ্ডসে হাঙ্গামার বিবরণ স-কাউন্সিল গবর্ণর জেনারেলকে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর তারিখের রিপোর্ট দ্বারা জানান। এথেকে জানা যায় আক্রমণকারীরা দেওয়ান মানিকচাঁদের বাড়ি আক্রমণ করে সহরের সর্বত্র আগুন দিয়েছিল। ইদ্‌গার টিলায় এই যুদ্ধ ঘটে। লিণ্ডসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রোশ সহজে নির্বাপিত হয় নি। এক ফকির লিণ্ডসের সঙ্গে দেখা করে দরখাস্ত দেবার অছিলায় তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে। হাঙ্গামায় নিহত আর এক ব্যক্তির পুত্র, তার নাম সৈয়দউল্লা, লিণ্ডসেকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায় বিলাত পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল।

মোহরমের হাঙ্গামা নিবৃত্ত হতে না হতে খাসিয়ারা পুনরায় উৎপাত শুরু করে। তারা ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এক হাবিলদারকে নিহত করে। তারপর ইংরাজ গারদ আক্রান্ত হয়। লিণ্ডসের নিজ কারবারে নিযুক্ত ভৃত্যদেরও তারা কেটে ফেলেছিল। পরের বছর, ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ষণপ্রাচুর্যের সময় খাসিয়ারা সমতল ছেড়ে পাহাড়ে চলে গেল সত্য, কিন্তু বন্যা ও দুর্ভিক্ষে শ্রীহট্টের প্রায় এক চতুর্থাংশ লোক প্রাণত্যাগ করে। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রচুর ধান হয়— কিন্তু এবছরও দুটি উৎপাত উপস্থিত হয়। প্রতাপগড়ে রাধারাম নবাব উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা অবলম্বন করে। অন্যদিকে লাউড়ের নিকটবর্তী

অঞ্চলের খাসিয়াবা অন্য প্রতিবেশীদের সহযোগে শ্রীহট্টের উত্তর প্রান্তবর্তী বংশীকুণ্ডা, বর্ণদিঘা, সেলবরষ, বেতাল ও আটগাও আক্রমণ করে প্রায় তিনশ'র অধিক অধিবাসীকে বধ করে। শ্রীহট্ট থেকে প্রেবিত সৈন্য পৌঁছুবার আগেই খাসিয়ারা পাহাড়ে প্রত্যাবর্তন করে। খাসিয়াদের দমন করতে দীর্ঘ দিন লেগেছিল।

দেশে শান্তি স্থাপিত হলে লিণ্ডসে কৃষি বিষয়ে উন্নতি বিধান কল্পে মনোনিবেশ করেন। তিনি শ্রীহট্টে গম ও কফিব চাষে উৎসাহ দেন। তাঁর উদ্যোগে বড় জাহাজ নির্মিত হয়েছিল। মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ২০ খানা জাহাজেব এক বছবে চাল বোঝাই করে পাঠিয়েছিলেন।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুন কার্যত্যাগ করে প্রচুর অর্থ নিয়ে তিনি বিলাত যান ; অর্থবলে তিনি 'লর্ড' উপাধি পেয়েছিলেন।

লিণ্ডসেব সময় শাসন বা ফৌজদারী বিচাবের ভার মুসলমান ফৌজদারের উপব থাকলেও তিনি বিচারকার্যে বিশেষ মনোযোগ ও দৃষ্টি রাখতেন। তিনি শ্রীহট্টের লোককে 'মামলাবাজ' বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীহট্টের মুসলমানদেব তিনি উদ্ধত, অশাসিত ও জিঘাংসাপবায়ণ মনে কবতেন। তাঁর সময়েব সতীদাহের কথাও তিনি উল্লেখ কবেছেন।

২. দশসনা বন্দোবস্ত

লিণ্ডসে সাহেবেব পর জন উইলিস শ্রীহট্টের বেসিডেন্টের পদ লাভ করেন। সর্বসাধারণেব কাছে তিনি 'দেলাবজঙ্গ বাহাদুর' এই উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৩ তাঁর কার্যকাল। শ্রীহট্টে এসে তিনি প্রথমে জেল নির্মাণ করেন। হিন্দু বাজাদেব আমলে বহু প্রাচীন একটি বাঁধ সুরমাব তীরদেশে ছিল ; ঐ বাঁধ সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিল। উইলিস ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে সুবমাব তীবে প্রায় একশ মাইল দীর্ঘ বাঁধ প্রস্তুত কবে প্লাবনজনিত ক্ষতি রোধ কবেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাসিংহ নামে এক খাসিয়া ইছামতী থানা ও বাজার লুঠ কবে। লেফ্‌টেনান্ট চিপেব সাহায্যে উইলিস খাসিয়াদের দমন কবেন।

উইলিস শ্রীহট্টে এসেই লর্ড কর্ণওয়ালিসের উপদেশানুসারে জরিপ আরম্ভ করেন। পূর্বে প্রায়শঃ জমিদাবি নিলাম হতো। যে রাজকর্মচারীবা এগুলি ক্রয় করতেন প্রজাদের উপর তাদের মায়াদয়া দেখা যেত না। এই সকল অনিষ্ট সংশোধনার্থ কর্ণওয়ালিস দশ বছর মেয়াদে একটি বন্দোবস্ত করেন। পরে ইংলণ্ড থেকে মঞ্জুরি এলে এই দশসনা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়। এই সময় উইলিস এক বিচক্ষণ ব্যক্তির সহায়তা পেয়েছিলেন, এঁর নাম লালা আনন্দরাম। প্রসিদ্ধ ফবহাদ খাঁর পুলেব পূর্ব দক্ষিণ কোণে, গোয়ালিছড়ার পূর্ব তীবে এঁর বাড়ি ছিল।

উইলিসের পবে রেসিডেন্ট হন—জে আর নটী, এইচ লজ, জে আমুটি, জে লেইরি, সি. এস্. মলিং, এফ্ মর্গান, জে ফ্রেঞ্চ, ই. ম্যাক্সওয়েল, জে ডব্লিউ ম্যাকনবল, টমাস বার্ণহাম, জে পি. ওয়ার্ড। ওয়ার্ড সাহেব ১৮২০ পর্যন্ত শ্রীহট্টে ছিলেন।

এই সময় শ্রীহট্টের বন্দর বাজার বর্তমান স্থানে ছিল না। সহরের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তবর্তী দুপড়ি-হাওরের পশ্চিমাংশে, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত যে একটা বড় রাস্তা আছে এরই দুধারে দোকান শ্রেণী ছিল। অনেক দোকান পরিত্যক্ত হওয়ায় বাজারের অবস্থা মন্দ হয়ে পড়ে। বর্তমান বন্দর বাজারের অনেক অংশই পূর্বে জল্লা বা জলাশয়ের নিচে ছিল, উত্তরের অল্পাংশেই ভূমি ছিল। বড় বড় মট্‌কা (মাটির কলসী) ফেলে তার উপর মাটি ভবাট করে অধিকাংশ স্থল কার্যোপযোগী করে নেওয়া হয়। 'চালিবন্দর' বলে খ্যাত পরিত্যক্ত বন্দরের ভগ্নপ্রায় কোনো কোনো ইষ্টকগৃহ উনিশ শতকের শেষ ভাগেও দেখা যেত। কেবল বন্দব বাজাব নয়, বর্তমান সহবের অনেক প্রসিদ্ধ স্থল ও অনেক রাস্তা এই উপায়ে নির্মিত হয়; এই সকল সড়কের দু পাশে এখনো জল্লা বয়েছে— দেখলে বোধ হয় যে, মধ্যে মাটি ভরাট কবে পথটি প্রস্তুত।

অতিপূর্বে বরশালা ও গড়দুয়ার নিয়ে সহর ছিল, পবে মুসলমান সময়ে কিছু দক্ষিণবর্তী হয়; তখনও আখালিয়া, বায়নগরের উত্তরাংশ ও শেখঘাটের কিছু অংশ সহরের অন্তর্গত ছিল। ইংবাজ আমলের প্রথমে নবাব তালাওয়ের তীবদেশ থেকে শেখঘাট পর্যন্ত সহর বিস্তৃত হয়।

খাসিয়ারা কিছুদিন শান্তভাব অবলম্বন করে থাকলেও প্রায়শঃ উত্তেজিত হত। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুয়াব সন্নিকটবর্তী খাসিয়ারা এক সিপাহী ও এক ডাকওয়ালা এবং এক ধোবাকে নিহত করে। শ্রীহট্টেব ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর টকাব সাহেবেব আদেশে চেরাপুঞ্জীস্থিত 'সিলেট লাইট ইন্‌ফ্যান্ট্রি' নামক দেশী সৈন্যদলের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন লিস্টার খাসিয়াদের দমন কবেন।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে আসাম ইংরেজদেব অধিকারভুক্ত হয়; তখন জয়ন্তীয়ার মধ্য দিয়ে শ্রীহট্ট থেকে আসাম যাওয়া যেতে পারতো। ব্রহ্ম যুদ্ধের সময় পাণ্ডুয়া চেরাপুঞ্জী হয়ে শিলং যাওয়ার পথ প্রস্তুত করা আবশ্যক হয়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি অনুসাবে খাসিয়া পাহাড়ের নংখলাও নামক স্থানেব রাজা রাজ্যেব ভিতব দিয়ে পথ করে দিতে স্বীকৃত হন। বাম্বরায় অঞ্চলের রাজাও রাজি হন। কিন্তু ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে খাসিয়া প্রজারা অশান্ত হয়ে ওঠে। লেফটেনান্ট বেডিংফিল্ড্ ও বার্লটন এবং কয়েকটি সিপাহী নিহত হন। সরকারকে তখন বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে হয়। লিস্টার অনেকগুলি খণ্ড যুদ্ধেব পব ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে খাসিয়াদের শেষ বাজাকে ব্রিটিশ সরকাবের সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকাব করতে বাধ্য কবেন।

বর্ণিত সময়ে শ্রীহট্টেব অবস্থা অনেকটা হীন হয়ে পড়ে। অধিকাংশ জমিদারের অবস্থা শোচনীয় ছিল, সমগ্র জেলায় বার্ষিক পাঁচ হাজাব টাকার বেশি আয়ের জমিদাবের সংখ্যা পনেরো জনের অধিক ছিল না। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব বাকি পড়ার জন্য ১০০৪টি মহাল নিলাম হয়ে যায়, এতেই দেশেব অসচ্ছলতার কথা স্পষ্ট বোধগম্য হবে। ইতিপূর্বে খাসিয়াদের কথা বলা হয়েছে; খাসিয়া অভিযানের সময়েই কুকির উৎপাত শুরু হয়।

৩. বিবিধ

ত্রিপুরা পর্বতের পূর্ব ও উত্তর দিগ্‌বর্তী অংশে কুকিদের বাস (কাছাড়বাসীব কাছে এরা লুশাই নামে পরিচিত)। এদেব প্রকৃতি অতি উদ্ধত; শত্রু দূরে থাক, তাদের পরস্পরেব মধ্যে

বিবোধ ঘটলেও একে অন্যের প্রাণ বধ না করে স্থির থাকতে পারে না। ত্রিপুরাধিপতিকে তাদের সার্বভৌম নরপতি বলে মান্য করলেও তাঁর বিরুদ্ধে তাদের বহুবার অস্ত্রধারণ করতে দেখা গেছে। এদের ভিন্ন ভিন্ন দলের সর্দারগণ রাজা বলে কথিত হয়।

যে সময় শ্রীহট্টের উত্তরাংশে খাসিয়ারা ইংরেজের বিরুদ্ধাচারণ করছিল দক্ষিণাংশে সেই সময় কুকিগণ গোলযোগ উপস্থিত করে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কুকিরাজ বুন্তাই কয়েকটি কাঠুরিয়াকে পর্বতমধ্যে নিহত করে। সেই প্রথম বারে সরকাব কুকিদের ব্রিটিশাধিকৃত বাজারে আসতে নিষেধ করা ব্যতীত আর কোনো প্রতিকার করতে পারেন নি।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার কুকির আক্রমণ হয়। কুকিরাজ লালড়িহুয়ার পুত্র লালচুক্লা পিতাব মৃতদেহের সঙ্গে লৌকিক প্রথা মত নরমুন্ড দিতে ইচ্ছা কবে, ষোলই এপ্রিল প্রতাপগড় পরগণাস্থিত কচুবাড়ি আক্রমণ পূর্বক ২০টি নবমুন্ড ও ৬টি স্ত্রীলোককে ধরে নিয়ে যায়। লালচুক্লা ছিল ত্রিপুরেশ্বরেব সামন্ত রাজা। সরকারেব পক্ষ থেকে ত্রিপুবারাজকে লেখা হলে তিনি লালচুক্লাকে ধৃত করতে দশ জন বরকন্দাজ পাঠান। সবকাব বিরক্ত হযে মহারাজকে লিখলেন, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অপবাধীকে সরকারের হাতে সমর্পণ না করলে ব্রিটিশ সৈন্য অপবাধীকে ধববাব জন্য তাঁব রাজ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে। এ বিষয়ে ত্রিপুরেশ্বর সন্তোষজনক কিছু করতে না পারায় ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকউড ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতব দিয়ে লালচুক্লাকে ধরতে সসৈন্যে ধাবিত হলেন। লালচুক্লা অচিবে আত্মসমর্পণ করে, শ্রীহট্টে তাঁর বিচাব হয় ও দ্বীপান্তব বাসেব আদেশ হয়।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের একটি স্ফুলিঙ্গ শ্রীহট্ট জেলাকে স্পর্শ করেছিল। চট্টগ্রামে সবকারেব তিন শ সীমান্তবক্ষক সৈন্য ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সংবাদে এরা বিদ্রোহী হয়ে ওখানকাব কালেক্টরী লুঠ করে ২১৮২৬৭ টাকা ও তিনটি হাতী নিয়ে এবং কারারুদ্ধ অপবাধীদেব মুক্ত করে ত্রিপুরার মধ্যভেদ করে শ্রীহট্ট জেলায় প্রবেশ কবে। এই সংবাদ পেযে শ্রীহট্টেব পদাতি সৈন্যদল নিয়ে মেজর বিং প্রতাপগড অভিমুখে ধাবিত হন। লাতুর বাজারের কাছে বিদ্রোহীদেব সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্যের সাক্ষাৎ হয়। বিদ্রোহীরা নদীতীরবর্তী মালগড় টিলায় আশ্রয় নিল ও ইংরেজ সৈন্যের উপর গুলিবর্ষণ করতে লাগলো। ব্রিটিশ সৈন্য নিচে নদীতীবে ছিল। বিদ্রোহীদেব প্রথম গুলিতেই মেজব বিং প্রাণত্যাগ করেন। সুবেদার অযোধ্যাসিংহ তখন অপূর্ব বণনৈপুণ্য প্রকাশ করে সুকৌশলে জয়লাভ করেন।

২৬ জন নিহত ব্যক্তিকে পবিত্যাগ কবে বিদ্রোহীরা লুকিয়ে পড়ে। নানা ভাগ্যবিপর্যয়েব পর যে কজন বিদ্রোহী জীবিত ছিল তারা কুকিদের আশ্রয়ে চলে গিয়েছিল। এরা কুকিদেব সরকাবেব বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করবে তা অস্বাভাবিক নয়।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে লালচুক্লার পুত্র মুবছুইলাল, সুখপাই লাল নামক দুর্ধর্ষ স্বাধীন কুকি সর্দারেব ভগ্নীকে বিবাহ কবে। এই বিবাহে ভগ্নীর সঙ্গে দাসী যৌতুক দেবার জন্য এরা একযোগে আদমপুবের কাছে তিনটি গ্রাম আক্রমণ করে হত্যা ও অগ্নিদানের পর কয়েকটি স্ত্রীলোক ধরে নিয়ে যায়।

এরপবই সরকারের সঙ্গে সন্ধি করলেও চঞ্চল চরিত্র কুকিদের সন্ধি অনেকদিন স্থির থাকে নি। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জানুয়াবি শ্রীহট্টের কাছাড়িয়া পাড়া আক্রমণ করে কুকিরা ২০টি মানুষকে

বধ ও কতকগুলি স্ত্রীলোককে বন্দী করে নিয়ে যায়, ২৪ তারিখে চরগোলা আক্রমণ করে দুজনকে বধ করে এবং ২৭ তারিখে আলীনগর আক্রমণ করে অনেক লোককে হত্যা করে। কিন্তু ঐ সময়কার কাছাড়ের আক্রমণ বিশেষ ক্ষতিজনক ছিল। অনেকগুলি চা-বাগান আক্রান্ত হয়েছিল, তারমধ্যে আলেকজান্ডারপুর চা-বাগানের বহুতর কুলি ও ম্যানেজার উইনচেষ্টার সাহেব নিহত হন, তাঁর কন্যাকে কুকিরা ধরে নিয়ে যায়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কাছাড় ও চট্টগ্রামে দুটি বৃহৎ সেনাদল গঠিত হয়; এরা ভিন্ন ভিন্ন সময় কুকিদের বাসস্থান আক্রমণ করে।

এর কিছুকাল পরে তারা পুনরায় ক্ষেপে ওঠে; তখন সরকার উত্তরলুশাই গ্রহণ করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তারা উত্তরলুশাইর শাসনকর্তা ক্যাপ্টেন ব্রাউনকে হত্যা করলে সরকার ক্রুদ্ধ হয়ে লুশাইক্ষেত্রে যে অগ্নি ক্রীড়া প্রদর্শন করেন তার ফলে সমগ্র লুশাই প্রদেশ সরকারের করায়ত্ত হয়।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আসাম প্রদেশে পৃথক চিফ কমিশনার নিয়োগ করার বিষয় স্থির হয়। আসামের আয় নিতান্ত অল্প, এইজন্য আয়বহুল শ্রীহট্ট জেলাকে আসাম প্রদেশভুক্ত করা হয়। ঐ সময় লর্ড নর্থব্রুক ভারতের গবর্ণর জেনারেল; তিনি শ্রীহট্টে এসেছিলেন। শ্রীহট্টবাসী আইনবর্জ্জিত আসামের অধীনে যেতে অনিচ্ছুক ছিল; তারা আপনাদের দুঃখের কাহিনী ও অসুবিধা বর্ণনা করে লর্ড বাহাদুরের কাছে এক আবেদন করেছিল। লর্ড নর্থব্রুক যদিও তাদের সঙ্গত প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নি, তবু তিনি প্রতিশ্রুত হন যে, শ্রীহট্টের বিধিব্যবস্থা পূর্ববৎ অব্যাহত থাকবে। রাজস্বসংগ্রহ ও ভূমি বন্দোবস্তে বাঙ্গালার সর্বত্র যে নীতি প্রচলিত, শ্রীহট্টে কদাপি তার ব্যভিচার ঘটবে না।

শ্রীহট্টের পরিমাণ ফল প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বর্গমাইল। এতবড় একটা জেলার অধিবাসীদের একস্থানে বসে শাসন করা অসুবিধাজনক বলে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মহকুমা বিভাগের প্রশ্ন ওঠে। ১৮৭৭ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে প্রথম সুনামগঞ্জ মহকুমা খোলা হয়। এই বছর সর্বপ্রথম শ্রীহট্ট সহরে মিউনিসিপালিটি স্থাপন করা হয়। শ্রীহট্ট সহর কলকাতা থেকে ৩৩২ মাইল এবং শিলং থেকে ৭২ মাইল দূরবর্তী; লোক সংখ্যা (শতাব্দীর প্রারম্ভে) ১৩৮৯৩ জন। ১৮৭৮ খ্রীঃ করিমগঞ্জ ও হবিগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয়। ১৮৮২ খ্রীঃ দক্ষিণ শ্রীহট্ট বা মৌলবীবাজার নামে পঞ্চম মহকুমা পৃথক করা হল।

শ্রীহট্ট আসামভুক্ত হওয়ার পর স্থানীয় কর ও আসাম-ভূমি রাজস্ব বিষয়ক আইন (১৮৮৬ সনের ১ আইন) শ্রীহট্টে প্রচলিত হয়। এতে বলতে গেলে লর্ড নর্থব্রুকের পূর্ব প্রতিজ্ঞার ব্যভিচার ঘটে।

শ্রীহট্টে বৃহৎ জমিদারের সংখ্যা অধিক না হলেও শ্রীহট্টের প্রজাগণ অন্যান্য জেলার অধিবাসী অপেক্ষা কোন অংশেই হীন দশাপন্ন নয়। শ্রীহট্টের অর্থ একত্রে দুই এক স্থানে মাত্র ভাণ্ডার-বদ্ধ হয় নি, বিভাগিত রূপে প্রত্যেকের ঘরেই গেছে; এইজন্য শ্রীহট্টে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু ভূসম্পত্তির অধিকারী।

ইতিপূর্বে কয়েকবার বন্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে একবার ভয়ানক ভূকম্প হয়ে শ্রীহট্টের অনেক ক্ষতি করেছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুন বিকাল ৪টা ৫০ মিনিটে যে ভীষণতম ভূকম্প হয় তার স্মৃতি ভোলা যায় না। শ্রীহট্ট একটি প্রাচীন সহব, কিন্তু ভূকম্পে এর অনেক প্রাচীন কীর্তি লোপ করেছে।

৪. ইংলিশ কোম্পানী

শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ যাঁদের কার্যকলাপে শ্রীহট্টের এক অংশের জনসাধারণের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, শ্রীহট্টে বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে যাঁবা অদ্বিতীয় প্রভাববিশিষ্ট ছিলেন, তাঁদেব বিবরণ না থাকলে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের অঙ্গহানি হত, সন্দেহ নেই।

শ্রীহট্টেব চূণ অতি প্রসিদ্ধ। নবাব মীরজাফর ও মীর কাশেমের সঙ্গে ইংবাজের যে সন্ধি হয় তাতেও প্রচুর লাভকর শ্রীহট্টের চূণেব উল্লেখ থাকা আবশ্যক বিবেচিত হয়। নবাবের কর্মচারী চূণের দারোগা বলে অভিহিত হতেন। লিন্ডসে সাহেব এই চূণের কারবাবে প্রভূত ধন উপার্জন পূর্বক লর্ড শ্রেণীতে উন্নীত হযেছিলেন। লিন্ডসে সাহেবেব পবেই ইংলিস কোম্পানীব অভ্যুদয় হয়।

ইংলিস কোম্পানী ছাতকে চূণেব প্রধান আড্ডা করেন। পূর্বে ছাতক একটি সামান্য গ্রাম ছিল— একজন সন্ন্যাসী একটি ছাতি ভূমিতে প্রোথিত কবে তাব তলে অবস্থিতি কবতেন। ক্রমে ঐ স্থানে একটি ক্ষুদ্র হাট বসে, কালক্রমে তা ছত্রক বা ছাতক বাজার আখ্যা পায়।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বেইট ও জর্জ ইংলিস নামক দুজন ইংবাজ মিলিত হয়ে 'বেইট ইংলিস এ্যান্ড কোম্পানী' নামে যৌথ কাববার স্থাপন কবে চূণের ব্যবসায আরম্ভ করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে বেইট সাহেবেব মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী জর্জ ইংলিসেব কাছে নিজ অংশ বিক্রয় কবেন। তখন থেকে এই কারবাব 'ইংলিস কোম্পানী' নামে খ্যাত হয।

George Inglis পূর্ণ উদ্যমে কাববার চালিয়েছিলেন। শ্রীহট্ট জেলায ছাপ্পান্ন বছর বাস করে ৭৬ বৎসব বযসে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পবলোক গমন কবেন। ছাতকে একটি টিলাব উপব তাঁর সমাধিস্তম্ভ বয়েছে।

তাঁব দুইপুত্র— হাবি ইংলিস ও জন ইংলিস। জন ইংলিস উদাসীন প্রকৃতিব লোক ছিলেন। তিনি নিজ অংশ জ্যেষ্ঠেব কাছে বিক্রী কবে চলে যান। হাবি ইংলিস একচ্ছত্র অধিকাবী হয়ে বিশেষ যত্নের সঙ্গে কারবাব চালাতে থাকেন। 'সিলেট লাইট ইন্‌ফ্যানট্রি' সৈন্যদলেব অধিনায়ক কর্ণেল লিস্টাব অমিত বলশালী যোদ্ধাপুরুষ— তিনি খাসিয়া পর্বতের ভাবপ্রাপ্ত ছিলেন। জয়ন্তীয়া দখল কবায় সরকারের নিকট হারি সাহেবের প্রতিপত্তি বর্ধিত হয়। কর্ণেল লিস্টার নিজ দুহিতা সোফিয়াকে তাঁর নিকট বিবাহ দেন। ফলে হারি সাহেব খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পর্বতের সমস্ত চূণা পাথবের মহাল ইজারা বন্দোবস্ত নিয়ে চূণের একচেটিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

প্রতি বছরে সমস্ত খনির কাজ চলতো না। জলের গতি বুঝে যে খনিব পাথর নামানো সুবিধাজনক মনে করতেন সেই খনিতেই কাজ হত। বৎসরভরা ডিনামাইট ও লৌহশাবলাঘাতে পাথর ভেঙে পাহাড়-ঘাটে মজুদ রাখা হত, পূর্ণ বর্ষাতে মাপের 'ঢকি নৌকা' দ্বাবা পাহাড় থেকে চূর্ণ নামানো যেত, শরৎকালে চূণ সংগৃহীত হত, হেমন্তে চূণ 'পোক্তানি' (পোড়া) এবং চৈত্র-বৈশাখে চূণ গোলাজাত করে রাখা যেত। হারি সাহেবের সময়ে আড়াই লক্ষ টাকা মূলধনে লাভ আড়াই লক্ষ দাঁড়াতো।

হেমন্তে হাবি সাহেব ছাতকের নদীত্রয়ের সঙ্গম চরে কমলার কারবার খুলতেন, এতেও প্রচুর লাভ হত।

প্রচুর লাভকর এই ব্যবসাগুলিব ফল একা হারি সাহেব ভোগ কবছেন, তা দেখে কেউ প্রলুব্ধ হয়ে খাসিয়া পাহাড়ে প্রবেশ করলে প্রতাপশালী ইংলিস কোম্পানী তাকে বহ্নিমুখ পতঙ্গেব দশা প্রাপ্ত করাবাব চেষ্টা করতেন।

এই সময় ইংলিস কোম্পানী কারবার ব্যতীত অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করেছিলেন। ছাতকে এজমালি দুই তালুকে চার পাঁচ মাইলের মধ্যে আর কারো অধিকার ছিল না। জমিদারিতে খাজনার হার পার্শ্ববর্তী তালুক থেকে অর্ধেকেবও কম ছিল। সুতরাং প্রজাসাধাবণ বাধ্য না হবে কেন? এছাড়া শাহ আরপীনের দবগাতে বৃত্তি ববাদ্দ ছিল। ছাতকের কালীবাড়িতে এবং মহাপ্রভুর আখড়ায় বৃত্তি ব্যবস্থিত হয়েছিল। চাঁদা তুলে আমলা পটীতে শ্রীধব নামে দেবতা স্থাপন কবা হয়। সমারোহ সহকারে ঐ দেবতার রথ ও দোল ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হত। হারি সাহেবের চেবাপুঞ্জীস্থিত খাস কুটীরের হাতাতে বথোৎসব হত; ঠাকুবকে হাতীর উপর বসিয়ে সেখানে নেওয়া হত; অনেক খাসিয়া এই উৎসবে যোগ দিত। এসকল কাবণে কোম্পানীর প্রতি সাধাবণেব বিশেষ অনুরাগ ছিল।

হাবি সাহেব অনেকদিন এদেশে থেকে এদেশীয় আচার ব্যবহারের অনেকটা পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি গুড়গুড়ি হুঁকাতে তামাক খেতেন। তাঁব সদ্ব্যবহার ও সৌভাগ্য প্রভৃতি নানা কারণে সাধাবণে তাঁকে মহাপুরুষ বলে মনে করতো।

মোটা বেতন ও কমিশনেব আকর্ষণে চেরাপুঞ্জীর প্রধান অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনাব হডসন সাহেব কোম্পানীর ম্যানেজারি গ্রহণ করেন। দেওয়ান ছিলেন ব্রজমোহন বায়।

পত্নীব আগ্রহে হারি সাহেব বিলাত যান। বিলাতে পৌঁছেই সাতান্ন বৎসব বয়সে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘবপুঃ দীর্ঘশ্মশ্রু সুগঠিতদেহ হারি সাহেব মানবলীলা সংবরণ করেন। তার দেহ পরে চেরাপুঞ্জীতে এনে মাটির উপরে রেখে সমাহিত কবা হয়। এরূপ সমাহিত কবার একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যে সকল স্বাধীন খাসিয়া সর্দারের কাছ থেকে চূণামহল ইজাবা নেন, তাঁর দেহ যতদিন 'মাটির নিচে' না যায় ততদিন সর্তভঙ্গ করতে পারবে না বলে তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়েছিলেন।

হডসন সাহেব ন্যায়বান ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হারি সাহেবের মৃত্যুর পব তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটায় তাঁর উদ্যম উৎসাহ কমে যায়। অধিকাংশ সময় শ্রীহট্ট সহরে, ঢাকায় বা কলকাতায় কাটাতেন। শ্রীহট্টে নবাব তালাওয়েব দক্ষিণ তীরে নদীর উপরে হডসন সাহেবের কুঠি ছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হডসনের মৃত্যু হয়। হারি সাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র লিও ইংলিস

উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন। শিকার, নৌকাচালন ইত্যাদিতে সময় ক্ষেপণ করতে ভালোবাসতেন। শিলঙে তিনি Inglis–by ইংলিসবী নামে এক বিচিত্র বাসভবন প্রস্তুত করেন। কিন্তু শিলংয়ে চীফ কমিশনারের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা ছিল। নানা কারণে শেষে তিনি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর কাছে চার লাখ টাকা দামের সম্পত্তি আড়াই লাখ টাকায় বিক্রী করে দেন।

৫. ইংরাজ আমলের প্রথম শতাব্দী

শত বৎসর পূর্বেকার অবস্থার সঙ্গে বর্তমান কালের আচার ব্যবহারের অনেক প্রভেদ ও বৈষম্য দেখা যায়। পূর্বে যেমন ব্যবসায়াদি জাতিগত ছিল এখন আর সেরকম নেই।

ব্রাহ্মণেরা সামাজিক বিষয়ে 'পাতি' বা ব্যবস্থাপত্র দিতেন, ব্যবস্থাদানে অনেক স্থলেই অর্থ মিলত। সমাজে কবিরাজদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। রোগী আরোগ্য হলে কবিরাজ আরোগ্য স্নান দিয়ে নববস্ত্র, কলসী বা পারিতোষিক নিতেন। শ্রীহট্টে বৈদ্য কায়স্থ ভেদ না থাকায় কবিরাজের ব্যবসায় প্রায়শঃ ব্রাহ্মণেরাই করতেন।

কায়স্থেরা প্রধানতঃ রাজকার্য ও মোহরেরি করতেন। দলিলাদি লিখে তারা সচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করতে সমর্থ হতেন।

'সাহু'দের মধ্যে ধনিগণ 'সাহাজী' এই সম্মানসূচক উপাধিতে অভিহিত হতেন।

জাতির পবিত্রতা রক্ষাকল্পে সমাজ কিরূপ কঠোর শাসন করতেন, রাজা সুবিদনারায়ণের সময় সাহা সংস্রবজনিত সাহু সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ঘটনাই তার প্রমাণ।

ইংরাজ রাজের অভেদাচারের প্রভাব শিক্ষিত সমাজে বহুমাত্রায় সংক্রমিত হচ্ছে, কিন্তু সেকালে ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে এভাব অনেকটা কম ছিল। ব্রাহ্মণ উপস্থিত হলে তাঁকে পৃথক আসন দেওয়া হত, ব্রাহ্মণের জন্য পৃথক হুঁকা রক্ষার প্রতি তীব্র দৃষ্টি ছিল।

ইংরাজ আমলের প্রথম দু চার ক্ষেত্রে 'চৌধুরী' খেতাব প্রদত্ত হলেও দশসনা বন্দোবস্তের পর এই খেতাব দেওয়ার প্রথা রহিত হয়। শ্রীহট্টের অনেক উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণও এই উপাধিধারী। তাছাড়া নবাবি আমলের শিকদার, কানুনগো, পুরকায়স্থ প্রভৃতি বংশানুক্রমিক উপাধিধারীদেরও বিশেষ সম্মান ছিল।

তৎকালে ধনিগণ লাদাউ দালান নির্মাণ করতেন, তা অধিককাল স্থায়ী হত। লোকের দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল। গৃহস্থ নিদ্রা ত্যাগ করে ঠাকুর ঘরের দ্বারে প্রণাম করে বা সূর্য প্রণাম করে গো-গৃহের দ্বার নিজে খুলে গোরু কেমন আছে দেখতেন। কারো বাড়িতে কিছু ফললে আগে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে না দিয়ে খেতেন না। দ্রব্যাদি সুলভ ছিল, টাকায় দেড়মণ চাল পাওয়া যেত, ঘৃতের সের ছয় আনা, তেলের সের তিন আনা, দুধের সের দু পয়সাতে পাওয়া যেত। কোনো কোনো গ্রামে দুধ বিক্রীই হত না। চাকরের মাসিক বেতন ছয় আনা, আট আনা কি ঊর্ধ্ব সংখ্যা বারো

আনা ছিল। জমির মূল্যও সুলভ ছিল, এক কেদার ভূমি দশ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় হত না।

পথের সুবিধা না থাকলেও লোকে তীর্থ যাত্রা করতো। জীবনে একবার তীর্থ দর্শন না করলে জীবন বৃথা গণ্য হতো। যাত্রীকে উপযুক্তরূপ লোকলস্কর নিয়ে সুরক্ষিত ভাবে চলতে হত। তবু পথে প্রায়শঃ রাহাজানি হতো।

জলদস্যুদের ভয় বারণার্থে জলপুলিশ নিযুক্ত ছিল। এদের নৌকায় নাগবা থাকত।

কাছারীর আমলাগণ, এমন কি হাকিম পর্যন্ত বেজায় ঘুষ প্রিয় ছিলেন। বিচারে ঘুষ প্রদানই মোকদ্দমা জয়ের কারণ ছিল।

ধরিত্রী এত অনুর্বরা ছিল না। দেশের জলপ্রবাহ ভালভাবে নিষ্কাশিত হবার বাধা ছিল না। ম্যালেরিয়ার এত প্রকোপ হয় নি। ওলাওঠাই একমাত্র মহামারী ছিল।

স্ত্রীলোকের ব্যবহারে এখন যেমন বিলাসিতার লীলা পরিলক্ষিত হয় তখন তেমন ছিল না। ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোকের মেয়ে মাত্রেরই কলসী দিয়ে পুকুর থেকে জল আনতে, পাকশাক করতে ও চরকায় সূতা কাটতে হত। সূতা কাটার পয়সা অলঙ্কারের ন্যায় মেয়েদের নিজস্ব হত। অলঙ্কারের কারুকার্য অপেক্ষা ওজনের গুরুত্বই গৌরবের কারণ হত। শাড়ীর মধ্যে মেঘডম্বর চন্দ্রকোণা, বাসমন্ডল প্রভৃতি প্রধান ছিল। বিবাহের কন্যাকে লেটের চাদর দেওয়া যেত। স্ত্রীলোকেরা বড়ই লজ্জাশীলা ছিলেন, কিন্তু গর্ভাধানের সংস্কার উৎসবের ধামালি গানে তারা অশ্লীলতার শ্রাদ্ধ করতেন। শ্রীহট্টে বাসবগৃহের উৎপাত কোনো দিনই বেশি ছিল না। বিবাহাদিতে স্ত্রী আচারের ঘটা ছিল।

বিবাহকালে বরকেও কানে কুন্ডল, মণিবন্ধে বাজুবন্ধ, গলায় হার এবং মাথায় শোলার মুকুট পরতে হত। বরের হাতে কোন কোন স্থলে বালা শোভা পেত। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী ধুমধামের সঙ্গে লোক লস্কর নিয়ে চলতেন। উভয় দলে প্রায়ই লাঠিযুদ্ধ হত, বিজিত পক্ষকে অনেক বিদ্রূপ সহ্য করতে হত। নিমন্ত্রণে সাধারণতঃ নিরূপিত গুয়াপান ও সম্ভ্রান্ত স্থলে কাটাপান ও তেল না পাঠালে নিমন্ত্রণ উপযুক্ত বলে বিবেচিত হত না। খাওয়াতে রীতি অনুযায়ী উপবেশন করার প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। খাদ্যে নানা রকমের পিঠা ও শ্রীহট্টের বিশেষত্ব বিরণীর ভাতের বাহুল্য ঘটত। ভদ্র বিশিষ্টগণ (বোধ হয় যবনানুকরণে) লোহা নির্মিত আধ হাত উঁচু 'ভোজন বেড়ীর' উপর থালা রেখে খেতেন ও ডাবরে আচমন করতেন। পংক্তি ভোজনের বাঁধা নিয়ম ছিল ; যে সে ঘরের মেয়ে দশজনের জন্য পাক করতে পেতেন না।

সাধারণতঃ পুরুষেরা পরিধানে ধুতি, গায়ে চাদর, নিমা, শীতকালে মিরজাই ও অঙ্গরাখা ব্যবহার করত। একবস্ত্রে বাড়ির বার হত না। শীতকালে সাধারণ লোকে যুগীয়ানা গিলাপ, মধ্যবিত্ত প্রবীণ ব্যক্তি বনাত, তরুণবয়স্কগণ দোলাই, এবং সম্ভ্রান্তগণ শাল ব্যবহার করতেন। দরবারে বা রাজদ্বারে যেতে চাপকান, আচকান, লাটুদার পাগড়ি ও পায়ে নাগরা জুতা পরতেন। সাধারণতঃ

পুরুষের ধুতি হাঁটুর নিচে বড় নামত না। পুরুষেরা কপালে স্বীয় ধর্ম সম্প্রদায়ের বিধিমত তিলক দিতেন। চন্দনচর্চিত দেহে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছাতা— বেহারাসহ গৃহের বার হতেন। বেহারারা শ্রীহট্টের পাতার তৈরী বৃহৎ ছাতা দীর্ঘ বাঁশের দণ্ডে উঁচু করে মাথার উপর ধরে চলত। সম্ভ্রান্ত ধনিগণ পালকীতে বার হতেন। তামাক পান মজলিশি ভদ্রতা ছিল। সঙ্গীতচর্চা বেশি রকমই ছিল, জুয়াখেলাও খুব চলত। ঘাটুর গানও পরবর্তী কালের মত ইতরজনসেবিত ছিল না— কৃষ্ণলীলা গীত হত।

দাসদাসীর সংখ্যাবাহুল্য সম্ভ্রমাধিক্যের কারণ হত। ভদ্রলোক মাত্রেই দু একজন নফর সঙ্গে না থাকলে ঘরের বার হতেন না। খালি মাথায় বার হওয়া অনেক স্থলে অরীতি গণ্য হত। মাথায় পাগড়ী, হাতে লাঠি ও সাথে নফর থাকাই ভদ্রত্বের পরিচায়ক ছিল। দাসদাসীদের প্রতি অনেক সময় নির্দয় ব্যবহার করা হত—

'দারে বালি কুড়ালরে শিল
বাঁদিরে লাথি গোলামরে কিল।'

দাসদাসীকে 'দুরুস্ত' রাখবার এই মন্ত্র বা শ্লোক থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময়েও দাসদাসী বিক্রয়ের প্রথা দূর হয় নি, তবে দাসদাসীর মূল্য নবাবি আমল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেড়েছিল।

কি হিন্দু কি মুসলমান— সামান্য লোকে পাদুকা ব্যবহার করতে পারতো না, বিবাহে নহবৎখানা উঠাতে পারতো না, এবং তাদের স্ত্রীলোকেরা নাকে নথ ও পায়ে অলঙ্কার পরতে পারতো না।

ভদ্র গৃহস্থের বাড়িতে দোল দুর্গোৎসব হত, যতদূর সাধ্য স্বয়ং কর্তা দেবকার্য স্বহস্তে করতেন। গুরুদেব বাড়িতে এলেও কেউ খড়ম বা জুতা ব্যবহার করতেন না। বিবাহ ও শ্রাদ্ধ সভাতে এবং গোবিন্দ কীর্তনের মেলে সামাজিক গোলমাল মীমাংসিত হত। পুরাণপাঠ, শনি ও সত্যনারায়ণের সেবায় পাঁচালী পাঠ এবং শ্রাবণ মাসে পদ্মপুরাণ পাঠ হত। চামর হাতে খোল করতাল যোগেও পদ্মপুরাণ এবং চৈতন্য মঙ্গল গীত হত। বৈষ্ণবের ঘরে তুলসী ও চন্দন সহ ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের পূজা ও ধূপধূনা দেওয়া হত।

গ্রাম্য মেল বন্ধন বড় সুন্দর ছিল। হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব ছিল। কোন কোন গ্রামে মুসলমানেও বিষহরি ও শীতলা দেবীর পূজা দিত। দুর্গোৎসবের মিছিলের সঙ্গে মুসলমানেরাও যেত, পক্ষান্তরে মহরমের সময় হিন্দুরাও তরবারি খেলায় মাততো।

কোন গৃহস্থের অবস্থা উন্নত হলে দেবালয় স্থাপন, পুষ্করিণী ও অশ্বত্থ প্রতিষ্ঠাদি করতেন। ইতর লোকের টাকা হলে নৌকা ও পাট বিষহরি পূজা করতো। পাড়ায় পাড়ায় রামায়ণ মহাভারত পাঠের প্রথা বড় সুন্দর ছিল।

প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি এসময়ে উঠে গেলেও গুরুমহাশয়ের বেত্রের গুণে ছাত্রের চরিত্র অনেকখানি মার্জিত হত। লেখাপড়ার উন্নতির সঙ্গে কলাপাতে ও সর্বশেষে ভোটিয়া কাগজে লিখবার অধিকার পেত। ছুটির পূর্বে খড়িবাড়ি মাটিতে রেখে তার উপরে মাথা দিয়ে সরস্বতী প্রণাম করে বাড়ি যেত। সন্ধ্যার পর মজলিসে অভিভাবকদের মধ্যেও কখন কখন 'শ্লোককণ্ঠ' চলত। একে শ্লোকের লড়াই বলা যেতে পারে।

মুসলমানের পর ইংরেজের নতুন ও সুব্যবস্থিত শাসনে দেশের চোর দস্যুব ভয় দূর হওয়ায় লোকে অনেকটা নিরাপদ হয়েছিল। ইংরাজের ন্যায়পরতার প্রতি কারো সন্দেহেব কোনো কারণ ছিল না। কেবল ১৮৭৪ সালে শ্রীহট্ট আসামভুক্ত হওয়াব সময় একটু আন্দোলন চলেছিল।

উপসংহার— কাছাড়ের কথা

কাছাড়ের পূর্ব নাম হৈড়ম্ব দেশ। হিড়িম্বার বাসস্থান বলে এই প্রদেশ হৈড়ম্ব দেশ নামে অভিহিত হয়। মণিরাম বর্মা নামক এক ব্যক্তি বলেন, কাছাড়ী জাতির মধ্যে প্রচলিত স্তব বাক্যে হৈড়ম্ব শব্দের অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী বটবৃক্ষ সমন্বিত পবিত্র স্থান। গেইট সাহেবের মতে কাছাড়ী জাতির বাসভূমি বলে এটি কাছাড় নামে অভিহিত। পদ্মনাথ ভট্টাচার্যেব মতে সংস্কৃত কচ্ছ শব্দ থেকে শ্রীহট্টীয় অপভ্রংশে কাছার (পর্বত সন্নিহিত স্থান), তাথেকে কাছাড নাম হয়েছে।

ডিমাপুরে কাছাড়ীদের প্রাচীন কীর্তির অনেক চিহ্ন এখনো পবিলক্ষিত হয। জনপ্রবাদ অনুসারে এই নগর প্রাচীন নৃপতি চন্দ্রধ্বজ কর্তৃক নির্মিত হয়। যখন দেশাঙ্গরাজ ডিমাপুবে বাজত্ব করছিলেন, ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আহোমগণ কর্তৃক আক্রান্ত ও পরাস্ত হয়ে তিনি ডিমাপুর পরিত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ তিনিই মাইবঙ্গ নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু মাইবঙ্গে বাসও কাছাড়ীদের নিবাপদ হয়নি। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে কোচ-রাজ নরনারায়ণের সেনাপতি শুক্লধ্বজ (চিলারায়) কাছাড় আক্রমণ করেন। পরাভূত হৈড়ম্বেশ্বব নবনারায়ণের অধীনতা স্বীকাব করতে বাধ্য হন।

কাছাড় জেলার বহু অংশ এক সময ত্রিপুব বাজবংশীয়দের অধীনে ছিল। কথিত আছে, কোনো কাছাড রাজের পুত্র ত্রিপুর রাজবংশে বিবাহ করে প্রায় চারশ বছর আগে কাছাড়ের দক্ষিণ দিগ্‌বর্তী সমতলভাগ যৌতুক পান।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে কাছাড়ের ঐতিহাসিক বিবরণ একরূপ অবগত হওয়া যায়। ওই শতাব্দীর প্রারম্ভে কাছাড় রাজ শত্রুদমন জয়ন্তীয়াপতি ধনমানিক্যকে যুদ্ধে ঘোরতর রূপে পরাভূত কবে নিজ কবপ্রদ করেছিলেন। তিনি আহোম নৃপতি প্রতাপসিংহকেও পরাজিত করে নাম ধারণ করেন প্রতাপনারায়ণ এবং রাজধানী মাইবঙ্গকে কীর্তিপুর নামে অভিহিত করেন। ইনিই কাছাড় রাজ বংশবলীতে নির্ভয়নারায়ণ নামে কথিত হয়েছেন। গল্পে কথিত হয়েছে যে একদা তিনি স্বপ্নদর্শনে নদীতীবে গিয়ে সর্পরূপিণী রণচণ্ডী দেবীকে দর্শন করেন। বিষধর সাপকে তাঁর ভয় হল না, দেবী জ্ঞানে নির্ভয়চিত্তে তার লাঙ্গুলে হস্তাপর্ণ করলেন ; সর্প তৎক্ষণাৎ অসিতে পবিণত হল। দেবীরূপী তরবাবি নিয়ে তিনি গৃহে আগমন করলেন। পরে রাত্রে পুনরায় স্বপ্নে অবগত হলেন যে, এই অসি সযত্নে সংরক্ষিত হলে তার কৃপায় রাজবংশে কোনো অমঙ্গল স্পর্শ করবে না। এই তরবাবি তখন থেকে রাজবংশে পূজিত হতে আরম্ভ হয়। প্রবাদ আছে যে কাছাড়ের শেষ রাজার হত্যাকান্ড সংঘটিত হবার পূর্বে তরবারিটি রাজপ্রাসাদ থেকে অপসৃত হয়েছিল।

শত্রুদমনের মৃত্যুর পব তাঁর পুত্র নরনারায়ণ অত্যল্প কাল রাজ্য ভোগ করে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তাঁর পিতৃব্য ভীমবল (শত্রুদমনের ভ্রাতা ও সেনাপতি) সিংহাসনারোহণ করেন। ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ইন্দ্রবল্লভ কিছুদিন রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র বীরদর্প নাবায়ণ ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। এঁর সময়ে কাছাড় রাজবংশে হিন্দুধর্ম প্রবেশ লাভ করে, রাজবংশীযগণ শাক্তমতে দীক্ষিত হন। এর নিদর্শন স্বরূপ বীরদর্প নারায়ণ একটি শঙ্খে পৌরাণিক দশ অবতারেব চিত্র অঙ্কিত করে রাখেন।

এরপর গরুড়ধ্বজ নাবায়ণ এবং তারপর মকরধ্বজ রাজা হন। তৎপরবর্তী রাজা উদয়াদিত্য। উদয়াদিত্যের পর ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাম্রধ্বজ সিংহাসনারোহণ করেন। এঁর সময়ে আহোমপতি রুদ্রসিংহ কাছাড় আক্রমণ করেন ও মাইবঙ্গ অধিকার করেন। তাম্রধ্বজ পলায়ন কবে খাসপুরে অবস্থিতি করেন।

তাম্রধ্বজের পুত্র সুরদর্পনারায়ণ। জয়ন্তীয়ার অধিপতি জয়নাবাযণের সঙ্গে এঁর বিবাদ বেধেছিল। এর পরবর্তী রাজা হরিশ্চন্দ্র নারায়ণ। তাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র কীর্তিচন্দ্র নাবায়ণ সিংহাসনারোহণ করেন। মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের পর রামচন্দ্র রাজা হন। রামচন্দ্রেব শাসন সময়ে ত্রিপুবাধিপতি কাছাড় আক্রমণ কবেছিলেন; অনন্যোপায় বামচন্দ্র তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন। আবার ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আহোমরাজ রাজেশ্বর সিংহের দূতেব প্রতি অসদ্ব্যবহার করায় আহোমবাজ ক্রুদ্ধ হন ও সেনাপতি বড়বড়ুয়াকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। কাছাড়পতি ভীত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। রামচন্দ্র ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

এরপব সিংহাসনারোহণ কবেন হরিশচন্দ্র ভূপতি। রাজমাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর অভিপ্রায়ে তদানীন্তন রাজধানী খাসপুরে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে নতুন প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রেব দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র কনিষ্ঠ গোবিন্দচন্দ্র।

কাছাড়ের রাজধানী উত্তর থেকে ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে অগ্রসব হয়েছে দেখা যায়। শিলচর থেকে প্রাচীনতম ডিমাপুব প্রায় একশ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। ডিমাপুরের পর মাইবঙ্গেব প্রতিষ্ঠা, শিলচর থেকে এ প্রায় পঞ্চাশ মাইল উত্তরে। তারপর খাসপুরে রাজধানী স্থাপিত হয়, এও শিলচর থেকে প্রায় দশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ওখানে হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের নামে আখ্যাত তিনটি ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ আছে। রাজনগর পরগণাযও প্রাচীন রাজকীর্তিব অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

পিতার পরলোকগমনেব পর কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড় রাজসিংহাসনে আবোহণ করেন। পঞ্চখণ্ড পরগণাবাসী গোপীনাথ শিরোমণি তাঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন। মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র মণিপুর রাজবংশে বিবাহ করেন ও শ্বশুরের উদাহরণে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণেব পরেই খাসপুরে বিষ্ণুমন্দির, দ্বাদশচক্রের মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় আগা মোহাম্মদ রেজা নামক জনৈক মোগল কর্তৃক খাসপুর আক্রান্ত হয়, কৃষ্ণচন্দ্র গোয়াবাড়ি নামক স্থানে পলায়ন করেন। বিজয়োন্মত্ত মোগল খাসপুব অধিকার করে বদরপুর আক্রমণ করে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড় ও শ্রীহট্টের সীমা নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়।

(মণিপুর)

নানাকাবণে মণিপুবের সঙ্গে কাছাড়ের বিশেষ সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, তাই মণিপুরেব কথা একটু বলা প্রয়োজন।

মণিপুরের পূর্ব ইতিহাস একরূপ অজ্ঞাত হলেও নাগাজাতীয় নৃপতি প্রসিদ্ধ পেম হেইবার পূর্বে ক্রমান্বয়ে ছত্রিশ জন নরপতির বাজ্যশাসন কথা শোনা যায়। পেম হেইবা মণিপুর রাজের দত্তক পুত্র ছিলেন। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিতাকে নিহত করে গরীব নওয়াজ— নাম ধারণ পূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন। এঁর রাজত্বকাল ৪০ বৎসর। এ সময় ব্রহ্মবাজও মণিপুরেব প্রাধান্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গরীব নওয়াজের দ্বিতীয় পুত্র জিটসই ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামসইকে নিহত কবে সিংহাসনারোহণ কবেন, কিন্তু পাঁচ বৎসর মাত্র রাজত্ব করাব পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রুরুট সই কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি দু বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন ; তৎপব শ্যামসইব পুত্র গুরুশ্যাম রাজা হন। ইনি নিজভ্রাতা জয়সিংহ বা ভাগ্যচন্দ্রকে সাহায্যার্থ রাখেন। ভাগ্যচন্দ্রই পবে মণিপুরের বাজা হন, এঁর সময়েই মণিপুরে গোবিন্দজী স্থাপিত হয়েছিলেন।

অতঃপব কয়েকবার মণিপুর ব্রহ্মসৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয় ; ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রহ্মসৈন্য কর্তৃক তাড়িত হয়ে কাছাড়ে পলাযন কবেন। ভাগ্যচন্দ্র বৃদ্ধ বযসে বাজ্য পুনরুদ্ধাবে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নবদ্বীপ গমন কবেন, কিন্তু ভগবানগোলার সন্নিকটে পদ্মাগর্ভে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র হর্ষচন্দ্র (মতান্তরে রবীনচন্দ্র) তিন বৎসব বাজত্ব করেন। মধুচন্দ্র (মধুসিংহ) নামে তাঁর এক দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা তাঁকে নিহত করে সিংহাসনারোহণ করেন। কিন্তু মধুচন্দ্রেরও ভাগ্য বড় সুপ্রসন্ন ছিল না। তিনিও নিজ ভ্রাতা কর্তৃক উত্যক্ত হন। প্রকৃতই ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরে বিষম অন্তর্বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল। মধুচন্দ্র স্বীয় ভ্রাতা মারজিৎ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়ে কৃষ্ণচন্দ্রেব আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র পাঁচশো সৈন্য নিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন ; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মধুসিংহ প্রাণত্যাগ কবেন। এবপব ব্রহ্মবাজ মণিপুর আক্রমণ করেছিলেন, এবং তখন মারজিৎকে বাধ্য হয়ে কিছুকালেব জন্য মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্রেব আশ্রয়ে কাছাড়ে এসে বাস কবতে হয়েছিল। এই সময় কাছাড়াধিপতির ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র অতিথি মারজিতের একটি মনোহর অশ্ব বলক্রমে গ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনার তিন বছর পরে ১৮১৩ খ্রীঃ কৃষ্ণচন্দ্র মারা যান।

কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর গোবিন্দচন্দ্র সিংহাসনারোহণ করেন। তিনি রাজ্যের বিধিব্যবস্থা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করেন ও কাছাড়ের আইন সংস্কারপূর্বক নতুন বিধি প্রবর্তিত করেন। তিনি এসময় স্বনামাঙ্কিত মুদ্রাও প্রচার করেছিলেন।

মণিপুরপতি মধুসিংহের অন্যতম ভ্রাতা গম্ভীর সিংহকে গোবিন্দচন্দ্র নিজ সেনাপতি নিযুক্ত করেন। গম্ভীর সিংহ মারজিতের চিরবিরোধী ছিলেন। কিন্তু ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মারজিৎ কাছাড় আক্রমণ করলে সেনাপতি গম্ভীরসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক ভ্রাতৃপক্ষে যোগ দেন। এই অচিন্তিতপূর্ব বিপৎপাতে গোবিন্দচন্দ্র অনন্যোপায় হয়ে শ্রীহট্টে গিয়ে ইংরাজের সাহায্যপ্রার্থী হন। কিন্তু সে সময় তাঁকে নিরাশ হতে হয়।

গম্ভীরসিংহ মারজিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করলেও একান্তভাবে তাঁর পক্ষে যোগ দেন নি। তাঁর অপর ভ্রাতা চৌরজিৎ নির্বাসিত ভাবে জয়ন্তীয়ায় ছিলেন, গম্ভীরসিংহ তাঁকে আহ্বান করেন। ভ্রাতার আহ্বানে তিনি সসৈন্যে কাছাড়ে আগমন করলে ভয়ে মারজিৎ মণিপুরে প্রস্থান করলেন। চৌরজিৎ কাছাড়ের দক্ষিণ দিক আয়ত্ত করে নেন।

পরের বছর ব্রহ্মরাজ মণিপুর জয় করেন। মারজিৎ বিপৎকালে কাছাড়ে এসে চৌরজিৎ ও গম্ভীরসিংহের সঙ্গে সন্ধি করে কাছাড়ে বাস করতে বাধ্য হন। কিন্তু এখানেও তিনি শান্তিলাভে সমর্থ হলেন না, ব্রহ্মরাজ তাঁর অনুসরণে কাছাড় আক্রমণ করেন। মারজিৎকেও গোবিন্দচন্দ্রের মত ইংরাজের সাহায্যপ্রার্থী হতে হল।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ মার্চ গবর্ণর জেনারেল ব্রহ্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। যে দিন লর্ড আমহার্স্ট এই ঘোষণা প্রচার করেন তার পরদিন গবর্ণর জেনারেলের এজেন্ট স্কট সাহেব বদরপুরে গোবিন্দ চন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি পত্র স্বাক্ষর করেন। তাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বহিঃশত্রু থেকে চিরদিন কাছাড় রাজ্য রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত হন। এও নির্ধারিত হয় যে, যুদ্ধাবসানে কাছাড়পতি দশ হাজার টাকা বার্ষিক কর প্রদান করবেন।

জুনমাসে বারশ সৈন্য নিয়ে কর্ণেল ইনেস (Innes) কাছাড় যাত্রা করে যাত্রাপুর অধিকার করেন; যাত্রাপুরের পর দুধপাতিল নামক স্থান অধিকৃত হয় এবং মণিপুর পর্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুতের কার্যারম্ভ হয়। কিন্তু বৃষ্টি প্রভৃতির প্রতিবন্ধকে ও স্থানের দুর্গমতায় রাস্তা প্রস্তুতের কাজ বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। ব্রহ্মসৈন্য সমূহ কাছাড় ছেড়ে মণিপুরে গিয়ে আড্ডা করে।

ব্রহ্মসৈন্য কর্তৃক মণিপুর অধিকৃত হলে মণিপুরের বহুতর প্রজা পলায়ন করে কাছাড় ও শ্রীহট্টে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। সেসময় গম্ভীর সিংহ পাঁচশো অনুচর সহ শ্রীহট্টে আসেন। শ্রীহট্টের মণিপুরী রাজবাড়ি এই সময় নির্মিত হয়েছিল (১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে তা বিধ্বস্ত হয়)।

সরকারের আশ্রয়ে গম্ভীর সিংহ শ্রীহট্টে বাস করতে লাগলেন, সরকার তাঁর সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সুশিক্ষিত করে তুললেন— এতে অবশ্য সরকারের সু-উদ্দেশ্য ছিল।

গম্ভীর সিংহ বীরপুরুষ ছিলেন। খাসিয়াদের সঙ্গে বিরোধ বাধলে শ্রীহট্টের প্রধান রাজকর্মচারীর অনুরোধে পাবর্ত্য যুদ্ধ বিশারদ গম্ভীরসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে যান। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের খাসিয়া বিজয় প্রধানতঃ এঁরই সহায়তা ও শৌর্যে সাধিত হয়েছিল।

এই সময় মহরম পর্ব ও রথযাত্রা এক তারিখে উপস্থিত হওয়ায় শ্রীহট্টের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এক হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। নামে মাত্র নবাব গণব খাঁ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন রথযাত্রাব তারিখ একদিন পিছিয়ে দিতে। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ গম্ভীর সিংহকে একথা জ্ঞাপন করলে তিনি বলেন তা কখনো সম্ভব নয়। সেদিন উভয়পক্ষে ঘোরতব বিবাদ উপস্থিত হয়। মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে তীব্রতেজে আক্রমণ করে। কিন্তু তৎপর মণিপুব সৈন্যের সঙ্গে মুসলমানগণ অল্পক্ষণ মাত্র মারামারি করতে সমর্থ হয়েছিল।

গম্ভীব সিংহের সৈন্যদল 'গম্ভীব সিংহের' লেভি নামে খ্যাত ছিল এবং সরকার কর্তৃক ক্যাপ্টেন গ্রান্ট এব অধিনায়ক নিযুক্ত হন। এই মণিপুরী সৈন্যদল ব্রহ্মযুদ্ধের সময় বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। গম্ভীব সিংহ নিজ পাঁচশ মণিপুরী সৈন্য নিয়ে ব্রহ্ম সৈন্যদের তাড়িয়ে দিতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ মে তারিখে লেফটেনান্ট পেম্বারটন সহ শ্রীহট্ট থেকে যাত্রা করেন এবং বহু কষ্টের পর ১০ জুন মণিপুর উপস্থিত হন। তাঁর উপস্থিতিমাত্র শত্রুরা ইমফল ত্যাগ করে।

ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ ফেব্রুয়ারি য়ান্দবো নগরে যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় তার সর্তানুসারে গম্ভীর সিংহ ব্রহ্মবাজ কর্তৃক মণিপুরপতিরূপে স্বীকৃত হন।

ওই বছর মহারাজ গোবিন্দ চন্দ্রও কাছাড়ের সিংহাসনে পুনরারোহণ করেন। কিন্তু বেশিদিন রাজ্য সম্ভোগ তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কতগুলি মণিপুরী, সম্ভবতঃ তৎকর্তৃক অপমানিত মারজিতের অনুচর, একদা রজনীযোগে গোপনভাবে রাজপ্রাসাদে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁকে হত্যা করে। গোবিন্দচন্দ্রের উত্তরাধিকারী কেউ ছিল না। কাজেই তাঁর রাজ্য সরকার কর্তৃক অধিকৃত হয়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাচাদিন নামে এক সেবক উত্তর দিগ্‌বর্তী পার্বত্য প্রদেশ শাসনের ভার পেয়েছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাজ্যসংক্রান্ত গোলযোগে তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। গোবিন্দচন্দ্র কৌশলক্রমে তাঁকে বধ করেন। তাঁর পুত্র তুলারাম গোবিন্দচন্দ্রের ভয়ানক শত্রু হয়ে দাঁড়ান এবং নাগা, কুকি প্রভৃতি দ্বারা দল গঠিত করে তাঁকে উত্যক্ত করতে থাকেন। ক্রমাগত তিনটি যুদ্ধে তুলারাম জয়লাভ করেন। বহুকাল কলহের পর, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বাধ্য হয়ে, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র তুলারামকে ২২২৪ বর্গমাইল পরিমিত ভূমির অধিকার ছেড়ে দিয়ে তাঁকে অধীন রাজা বলে স্বীকার করেন। এই এলাকারই নাম উত্তর কাছাড়।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তুলারামের মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র নকুলরাম ও ব্রজনাথ উত্তর কাছাড় শাসন করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নকুলরাম নাগাদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করে প্রাণত্যাগ করেন। এই যুদ্ধে নকুলরাম সরকারের আদেশ গ্রহণ করেন নি, এই কারণে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বাজ্য সরকার অধিকার করেন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সরকার কর্তৃক কাছাড় রাজ্য অধিকার হলে ক্যাপ্টেন ফিসার এর প্রধান শাসনকর্তা বা সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন। কিন্তু এই রাজ্য সরকাবেব অধিকাবভুক্ত হওয়ার ঘোষণাপত্র ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ আগস্টের পূর্বে প্রচারিত হয় নি। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড় জেলা ঢাকা কমিশনারের অধীন করা হয়, কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দেওয়ানী বিচার প্রবর্তিত হয় নি। ১৮৬২ খ্রীঃ থেকে দণ্ডবিধি আইন অনুসারে বিচার আরম্ভ হয়। ১৮৬৪ খ্রীঃ সুপাবিনটেনডেন্ট পদেব পরিবর্তে ডেপুটি কমিশনার পদের সৃষ্টি হয়। ১৮৬৭ খ্রীঃ থেকে শ্রীহট্টের সেসন জজ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাছাড়ে গিয়ে সেসনেব বিচাব করতে থাকেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জুন হাইলাকান্দি মহকুমা পৃথক করা হয়। ১৮৭১ খ্রীঃ লুশাই কর্তৃক কাছাড় আক্রান্ত হয় (লুসাইরা বাঁশের ছিলকা ভেঙে বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত করে সাঙ্কেতিক ভাবে বাক্য আদান প্রদান করতো)। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আসামে চিফ কমিশনাব পদের সৃষ্টি হলে কাছাড়কে পুর্নবাব আসাম প্রদেশভুক্ত কবা হয়েছিল।

উত্তর কাছাড়ের মহকুমা অফিস গংজং নাম শৈলশৃঙ্গে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল। দু বৎসর অতীত হতে না হতেই শম্ভুধন নামে এক কাছাড়ী প্রকাশ কবে যে, সে স্বর্গ হতে অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করে 'দেও' হয়েছে। মাইবঙ্গের চতুর্দিগ্বর্তী অধিবাসীরা তাকে মান্য করে কর দিতে আরম্ভ কবে। কাছাড়েব ডেপুটি কমিশনাব মেজর বয়েড একে দমন করা আবশ্যক বোধে দলবল সহ মাইবঙ্গে উপস্থিত হন। পলায়ন কালে দৈবচক্রে শম্ভুধন নিহত হয়।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অফিসাদি গংজং থেকে ৩১১৭ ফিট উঁচু হাফলং শৃঙ্গে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

উত্তরাংশ

তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ

চতুর্থ ভাগ— জীবনবৃত্তান্ত

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

অদ্বৈতাচার্য

মুরারি গুপ্ত

যদুনাথ কবিচন্দ্র

শ্রীবাস পণ্ডিত

মাধব দাস

বংশীধর ঘোষ

বাণীকিশোর (ঠাকুর বাণী)

জগন্মোহন গোসাই

রামকৃষ্ণ গোসাঞি

উত্তরাংশ

তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ

চতুর্থ ভাগ— জীবনবৃত্তান্ত

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

উত্তর শ্রীহট্ট মহকুমার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বুরুঙ্গা পরগণা। এই পরগণায় ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের আদিবাস; সেই আদিবসতিকারক আদিদেব নামে খ্যাত। তাঁর বংশীয়েরা বলেন তিনি সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গের কিছু পরে কান্যকুব্জ থেকে এসেছিলেন। তিনি চন্দ্রনাথ দর্শন করে কামরূপ যাবার পথে বরবক্রতীরে শ্রান্ত হয়ে বসে পড়েন ও এখানে বসতি স্থাপন করেন। আদিদেবের ষষ্ঠ পুরুষে হিরণ্যগর্ভ জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্যগর্ভের কন্যা চণ্ডীদেবী। বৎস গোত্রজ পাশ্চাত্য বৈদিক মধুকর মিশ্রের সঙ্গে চণ্ডীদেবীর বিবাহ হয়েছিল। তিনি তীর্থ পর্যটন উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে হিরণ্যগর্ভের গ্রামে উপস্থিত হন।

কথিত আছে, চণ্ডীর আরাধনায় গঙ্গা পরিতুষ্টা হন। তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে তাঁরা স্বামীস্ত্রীতে পশ্চাদ্দৃষ্টি ব্যতিরেকে বরবক্রতীরে প্রভাতে যতদূর অগ্রসব হবেন ততদূর পর্যন্ত তাঁব অধিকাবভুক্ত হবে।

পরদিন প্রভাতে শুদ্ধ চিত্তে স্বামি-সহকারে শঙ্খধ্বনি করে চণ্ডীদেবী বরবক্রাভিমুখে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করলেন। হঠাৎ চঞ্চল প্রবাহের কুলুধ্বনি না শুনে চণ্ডীদেবী পশ্চাতে চাইবামাত্র স্রোত স্বাভাবিক রূপে দক্ষিণাভিমুখ হল— বরবক্র চর দিয়ে সরে যাচ্ছিল, চণ্ডীর দৃষ্টিপাতে তা স্থগিত হল, দৈবতঃ তাঁদের অধিকভূমি প্রাপ্তি ঘটল না। চণ্ডীদেবী গঙ্গার বরপ্রভাবে স্রোতঃ পরিত্যক্ত ভূমি পাওয়ায়, ঐ ভূখণ্ড বরগঙ্গা নামে খ্যাত হয়। আদিদেবের সময় থেকেই প্রাকৃতিক নিয়মে বরবক্রের গতি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং এই সময়ে তা সুসম্পন্ন হয়। বরবক্রের পরিত্যক্ত সেই ভূভাগই বরগঙ্গা (পরবর্তীকালে বুরুঙ্গা)।

মধুকর মিশ্রের চার পুত্র— কীর্তিদ, রঙ্গদ, উপেন্দ্র ও কৃত্তিবাস। উপেন্দ্রমিশ্রের পুত্র সংখ্যা সাত— কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দন, ত্রিলোকপা। শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ মিশ্রের সন্তান। উপেন্দ্র মিশ্রের বাসস্থান ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে যে মিশ্র বংশের বাস তাঁরা জগন্নাথের ভ্রাতা পরমানন্দের বংশভুক্ত।

জগন্নাথ মিশ্র শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে নবদ্বীপ যান, সেখানে মায়াপুর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। জগন্নাথ মিশ্রের শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্তী তরফের বাসস্থান ছেড়ে নবদ্বীপে আসেন। মায়াপুরে আরো অনেক শ্রীহট্টবাসী ছিলেন— চৈতন্যদেবের মেসোমহাশয় চন্দ্রশেখর আচার্যও মায়াপুরে বাস করতেন।

গঙ্গাদাস আচার্য নামক পণ্ডিতের কাছে নিমাই সাহিত্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। এরপর বিষ্ণু মিশ্রের কাছে স্মৃতি ও জ্যোতিষ এবং সুদর্শন পণ্ডিতের কাছে দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দু বছরে তা সমাপ্ত হয়— তাবপর অল্প কিছুকাল ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অদ্বৈতের কাছে নিমাই কিছুদিন বেদপাঠও করেছিলেন।

চৈতন্যদেবের দুই বিবাহ— প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর পিতা বল্লভ মিশ্রের পূর্বনিবাস শ্রীহট্টে। বনমালী ও কাশীনাথ নামক শ্রীহট্টবাসী কজন বন্ধুর সঙ্গে মিলে তিনি নবদ্বীপে যান। দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা।

নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আত্মীয় বন্ধু ও পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীহট্টবাসী রূপে উল্লেখযোগ্য হলেন, অদ্বৈত আচার্য, চন্দ্রশেখর আচার্য, মুরারি গুপ্ত, মাধব দাস, যদুনাথ কবিচন্দ্র, শ্রীবাস পণ্ডিত, প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভৃতি।

কথিত আছে চৈতন্যদেব মায়ের ইচ্ছায় ঢাকাদক্ষিণে গিয়ে পিতামহীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে চৈতন্য পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে গিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীহট্টের নামোল্লেখ করা হয় নি। প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীহট্ট গমন সংবাদে লেখা হয়েছে প্রথমতঃ তিনি পদ্মাতীরে অনেক ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন। বিক্রমপুরের নূরপুব থেকে যান সুবর্ণগ্রামে। এখান থেকে উত্তর পূর্বাভিমুখ হয়ে ব্রহ্মপুত্রতীরে লাঙ্গলবন্দে পৌঁছান ও ব্রহ্মপুত্রে স্নানান্তে এগারসিন্দুর আগমন করেন। পরে এগারসিন্দুর থেকে পূর্বদিকে প্রসিদ্ধ বেতাল গ্রামে গমন করেন— এর অল্পদূরে ঢোলদিয়া ভিটাদিয়া প্রভৃতি প্রাচীন পল্লী। মহাপ্রভু ভিটাদিয়াতে লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর গৃহে আতিথ্য নেন। এরপর শ্রীহট্টে শুভাগমন করেন। চৈতন্যদর্শনের কিছুদিন পরে উপেন্দ্র মিশ্র দেহত্যাগ করেছিলেন।

মহাপ্রভু ঢাকা দক্ষিণে আগমন করলে তাঁর সঙ্গে এদেশের রামদাস, মাধব ও জ্ঞানবর কল্যাণবর প্রভৃতি অনেক ভক্ত এসে সম্মিলিত হন। এঁদের তিনি স্থানে স্থানে প্রচারকার্যে প্রেরণ করেছিলেন। সেই প্রচারের নিদর্শন— উত্তরে হাজঙ্গ জাতি এই সময়ে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়।

ঢাকাদক্ষিণ থেকে মহাপ্রভু আসামে গমন করেন। আসামে হাজোতে মাধব মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। প্রথমতঃ তিনি এই মন্দিরে এসে, বরাহকুণ্ডের উপরে একটি গোফাতে অবস্থিতি করে মাধবদর্শন করেন। এখানে রত্নেশ্বর বিপ্র তাঁর ভক্তরূপে গণ্য হন। এঁকে তিনি ভাগবত শিক্ষা দিয়ে 'রত্নপাঠক' উপাধি দান করে মাধবের মন্দিরে পাঠক নিযুক্ত করেন। তখন থেকে

ওখানে ভাগবত পাঠ ও সংকীর্তন প্রবর্তিত হয়। পরশুরামকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড দর্শন করে মহাপ্রভু পুনরায় হাজোতে এসে সেই গোফাতেই অবস্থিতি করেন; গোফাটি আজো 'চৈতন্যের গোফা' নামে খ্যাত। এখানে তিনি মাগুরীয় তর্কভূষণ ও কবিশেখরকে ভাগবত শিক্ষা দেন।

দামোদর আসামে দামোদরীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তিনি মাধব দর্শনে এসে শ্রীচৈতন্যের কৃপা ও উপদেশ লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। দামোদরের শিষ্য প্রসিদ্ধ ভট্টদেব কবিরত্ন অসমীয়া ভাষায় 'সৎসম্প্রদায় কথা' নামে যে গ্রন্থ লেখেন তাতে বলা হয়েছে—

'শ্রীচৈতন্য কেশবভারতীর শিষ্য হই সৌমার (উত্তরপূর্ব আসাম) পর্যন্ত প্রেমভক্তি প্রবর্তাইলা। এতেকে পূর্ব দেশের আচার্য চৈতন্য প্রখ্যাত ভৈল।'

পাচে চৈতন্যভারতী প্রভু মাধবদর্শনে মণিকূটে (হাজোতে মাধব মন্দির যে পর্বতে) আসিলা বরাহকুণ্ডর উপরে গোফাত রহি মাধবদর্শন হৈল। পাচে রত্নেশ্বর বিপ্রক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াই রত্নপাঠক নাম দি মাধবর দ্বারত ভাগবত পঢ়িবে দিলা আরু যাত্রা মহোৎসব সংকীর্তন কর্মকো মাধবর দ্বারত প্রবর্তাইলা। পরে মহাপ্রভু পর্শু কুঠারে (পরশুরামকুণ্ড) যাই নামর নির্ণয় লেখি ব্রহ্মকুণ্ডত স্নান করি উলটি আসি সেই গোফাতে রহিলা। পাচে মাগুরীয় কণ্ঠভূষণক আর কবিশেখর বা কণ্ঠহার কন্দলীক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াইলা। পাচে বীণা হাতে ধরি কৃষ্ণ নাম গাই নারদর শ্রেষ্ঠা (চেষ্টা) দেখাইলা। সেই বেলা দামোদরে মাধব দেখিতে মণিকূটে যাই তাঙ্ক দেখি দুর্লভ লাভ ভৈলা। .... তাঙ্ক তত্ত্বজ্ঞান দিয়া উড়েষাক (উড়িষ্যায়) গেলা। (৭ম অঃ)

চৈতন্যের জীবনের পরবর্তী ঘটনাসমূহ পাঠক সমাজে সুপরিচিত।

অদ্বৈতাচার্য

লাউড়ের নবগ্রামে ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বৈতের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম কুবেরাচার্য, মায়ের নাম নাভা দেবী। অদ্বৈতের পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। পিতৃআদেশে অদ্বৈত বেদ অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। শান্তিপুরের কাছে অধুনা-লুপ্ত পূর্ণবাটী নামক স্থানে শান্তদ্বিজের চতুষ্পাঠীতে তিনি বেদ অধ্যয়ন করেন। মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন। কথিত আছে কুবেরাচার্য দেহত্যাগ করার অল্পক্ষণ পরে নাভাদেবীরও মৃত্যু হয়— একই চিতায় উভয়ের দেহ দাহ করা হয়েছিল। গয়াতে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানের পর তিনি তীর্থপর্যটনে বার হন। প্রথমে রেমুনাতে গোপীনাথ দর্শন করে নাভিগয়াতে গিয়ে পিণ্ডদান করলেন। সেখান থেকে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করেন। এরপর কাঞ্চীপুর হয়ে কাবেরী নদীতে স্নান করে মাদুরাই যান। রামেশ্বরে মধ্বাচারী বৈষ্ণবসন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়— মাধবেন্দ্র পুরীরও আবার সাক্ষাৎ পান। সেখান থেকে নাসিক, দ্বারকা, পুষ্করতীর্থ প্রভৃতি দর্শন করে হরিদ্বার হয়ে বদরিকাশ্রম পর্যন্ত

যান। ফেরার পথে কাশীধামে সন্ন্যাসী বিজয়পুরীর দেখা হয়— ইনি অদ্বৈত জননী নাভা দেবীর পিতৃবংশের পুরোহিতপুত্র ও মাধবেন্দ্র পুরীর সতীর্থ ছিলেন। মথুরা বৃন্দাবন প্রয়াগও তিনি দর্শন করেছিলেন।

লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ অদ্বৈতের শিষ্য হয়ে কৃষ্ণদাস নাম নিয়ে তাঁর একটি জীবনী লিখেছিলেন। গ্রন্থটির নাম 'বাল্যলীলাসূত্র'।

এই সময়ের অল্পপরে তাঁর সঙ্গে নৃসিংহ ভাদুড়ীর দুহিতা শ্রীদেবী ও সীতাদেবীর বিবাহ হয়। অদ্বৈতের পাঁচ পুত্র— অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, স্বরূপ, জগদীশ ও বলরামমিশ্র।

শ্রীমহাপ্রভু চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে কৃষ্ণলীলা নাটকাভিনয় করেছিলেন, এই অভিনয়ে শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে অদ্বৈতকে কৃষ্ণ সাজতে হয়েছিল। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে প্রথমেই শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে উপনীত হয়েছিলেন। অদ্বৈতই প্রথম গৌরাঙ্গবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করেনঃ

শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর
দীন দুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়া কর।

'একদা অদ্বৈত মহাপ্রভুর কাছে একটি প্রহেলিকাবাক্য প্রেরণ করেন—

বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

প্রহেলিকাপদ্য প্রাপ্তির পর শ্রীমহাপ্রভু শেষ কয়েক বৎসর যেমন কৃষ্ণবিরহে বাহ্যজ্ঞান বিহীন ছিলেন, অদ্বৈতও তেমনি শেষ কয়েক বৎসর গৌরবিরহে বিহ্বল ছিলেন।

মুরারি গুপ্ত

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ছাত্র মুরারি গুপ্ত নিমাইয়ের সহপাঠী ছিলেন, কিন্তু বয়সে তিনি নিমাইয়ের চেয়ে বড। বালক নিমাই মুরারিকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করতেন।

মুরারি নিমাইর জন্ম থেকে সকল ঘটনাই দেখেছেন এবং তাঁর প্রধান প্রধান লীলার অনুষঙ্গী ছিলেন। এই সকল দৃষ্ট ঘটনাবলী অবলম্বনে ১৪৩৫ শকাব্দে তিনি 'চৈতন্য চরিত' নামে এক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। গৌরলীলা সম্বন্ধে এটি আদি গ্রন্থ।

মুরারি গুপ্তের লেখনী মাতৃভাষার সেবায়ও নিয়োজিত হয়েছিল। বঙ্গভাষায় তাঁর বিরচিত পদাবলী কবিত্বে অতুল্য।

যদুনাথ কবিচন্দ্র

চৈতন্য ভাগবতে দেখা যায় তাঁর পিতা রত্নগর্ভ আচার্যের 'প্রভুর পিতার সহ জন্ম এক গ্রাম'। সুতরাং ইনিও ঢাকাদক্ষিণবাসী। পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে কবিচন্দ্রের অতুলনীয় পদাবলীসমূহ সংগৃহীত আছে। ইনি নিত্যানন্দপ্রভুর ভক্ত ও পার্ষদ পর্যায়ভুক্ত ছিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত

পঞ্চখণ্ডে পণ্ডিতের পাড়া পল্লীতে শ্রীবাসের আদি নিবাস ছিল। পরে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির সন্নিকটে বাসস্থান নির্মাণ করেন। শ্রীবাসের প্রাচীর বেষ্টিত বাড়িতে ভক্তেরা সম্মিলিত হতেন ও সন্ধ্যার পরে দ্বার দিয়ে সংকীর্তন করতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক শক্তি মহিমায় শ্রীবাসের চার বছর বয়স্কা ভ্রাতুষ্পুত্রী যন্ত্রচালিতবৎ কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য করেছিল। এই নারায়ণীর পুত্র চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবনদাস।

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচল চলে যান তখন থেকে 'শ্রীবাসাঙ্গন' পরিত্যক্ত হয়; শ্রীবাসও কুমারহট্টবাসী হন।

মাধব দাস

নবদ্বীপবাসী দুর্গাদাসের পূর্ব নিবাস ছিল শ্রীহট্ট। তাঁর দুই পুত্র সনাতন ও পরাশর। সনাতনের এক কন্যা এক পুত্র-কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যদেবের দ্বিতীয়া পত্নী। পুত্রের নাম যাদব মিশ্র। নবদ্বীপে যাঁরা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর বিগ্রহের সেবাধিকারী তাঁরা তদীয় অনুজ যাদবমিশ্রের বংশীয। যাদবের পুত্রই প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার।

সনাতনের ভ্রাতা পরাশরকে সকলে কালিদাস বলে ডাকতো, কারণ তিনি পৈতৃক বৈষ্ণবধর্ম পরিত্যাগ করে কালীভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। মাধব কালিদাসের একমাত্র পুত্র।

বালক মাধব একদা বাসগৃহে ভক্তগণ পরিবৃত শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করে ভক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। মাধব বৃন্দাবনে পরমানন্দপুরীর কাছে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তিনি এরপর শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর কাছে বৈষ্ণবীয় ভজন বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন।

মাধব কবি ছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ-অবলম্বনে 'কৃষ্ণমঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করেন।

রঘুনাথশিরোমণি

রাজা সুবিদনারায়ণ প্রসঙ্গে রঘুনাথের জীবন কথা বিবৃত হয়েছে।

বঞ্চিত ঘোষ (গঙ্গারাম ঘোষ)

শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ পদকর্তা বাসু ঘোষের বংশে পরম ধার্মিক কৃষ্ণ ঘোষের উদ্ভব হয়। কৃষ্ণ ঘোষের পুত্র গঙ্গারাম, নামান্তরে বঞ্চিত ঘোষ। বঞ্চিত অল্প বয়সে পিতৃহারা হলে পিতৃব্য তাঁকে লালন করেন। একদা জননী রেবতী দেবী তাঁকে মূর্খ বলে তিরস্কার করে খাওয়ার সময় একথালা ছাই দিলে গঙ্গারাম ক্রোধভরে বনে চলে যান। এখানে তাঁর ভাবান্তর হয়। বৃক্ষমূলে বসে আত্মচিন্তা করতে করতে তাঁর জ্ঞানের উদয় হল, মূর্খ বালক কবি হয়ে উঠল ঃ

পাইয়া পরশমণি কোলে না তুলিনু রে
বলয়ে বঞ্চিত ঘোষে
শিমলির ফুল চাইতে জনম গোয়াইলু রে
দিন গেল মিছা পরবাসে।

বঞ্চিতের ধর্মভাব ও দৈবশক্তির কথা শুনে দেশের জমিদার, ইটার রাজবংশীয় ইস্রাইল খাঁ এই বালক তপস্বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর তপঃক্ষেত্র পরিষ্কৃত করিয়ে দান করলেন, তা 'মোহন্তালয়' নামে খ্যাত।

সিদ্ধপুরুষ বঞ্চিত সামাজিকতা প্রভৃতি ভেদ বিচারের বহু ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছিলেন।

বঞ্চিতের বয়স যখন মাত্র পনেরো, দিল্লীর বাদশাহ দেশের সাধুদের সংবাদ গ্রহণের অভিলাষ করে কর্মচারিবর্গের উপর তালিকা প্রস্তুতের আদেশ দেন। সে অনুসারে শ্রীহট্টের শাসনকর্তা বা আমিল শ্রীহট্টের শ্রেষ্ঠ সাধুসমূহের মহিমা ও নামাবলী জ্ঞাপন করলে তাঁদের কয়েকজনকে দিল্লী নিয়ে যেতে আদিষ্ট হন।

সেকালে শ্রীহট্টে পাগল শঙ্কর, ঠাকুরবাণী, বৈষ্ণব রায় এবং বঞ্চিত ঘোষের মহিমা বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং আমিল এঁদের নিয়ে দিল্লী যাত্রা করেন। শ্রীহট্টের সীমা অতিক্রম করলেই একদিন বঞ্চিত ঘোষ ব্যতীত অন্য তিনজন অদৃশ্য হন। অগত্যা আমিল এই মহাত্মাকে সম্রাট সদনে উপস্থিত করলেন। বাদশাহ সাধুর গুণপণা দর্শনে ইচ্ছা করলেন কিন্তু বঞ্চিত কোনো 'ইন্দ্রজাল' জারি করতে রাজি হন নি। বঞ্চিতের ব্যবহারে বাদশাহ বিরক্ত হলেন এবং অখাদ্য খাইয়ে তাঁর জাতি নষ্ট করতে আদেশ দিলেন। দৈববশতঃ সেই সময় দিল্লী নগরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হল। সম্রাট একে সাধু নিগ্রহের ঈশ্বরদত্ত শাস্তি বলে বোধ করলেন ও সেই অসৎ চিন্তায় বিরত হলেন।

প্রত্যাবর্তনের পথে বঞ্চিত বৃন্দাবনে যান। দেশে ফেরার পর তিনি মায়ের আদেশে পঞ্চখণ্ডের বিশ্বাস বংশের একটি পাত্রীকে বিবাহ করেন। তাঁর পাঁচটি পুত্র হয়। কিন্তু বিবাহের পরেও বঞ্চিতের ভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটল না। এই সময় ঠাকুর বাণী, পাগল শঙ্কর এবং বৈষ্ণব রায় তাঁর সঙ্গে কীর্তনে কখনও কখনও যোগ দিতেন। বলা হয় এ অঞ্চলে চৌতালা কীর্তন তিনিই প্রবর্তন করেন।

তিনি সাতগাঁও অবস্থিতি কালে ঠাকুরবাণীর শেষ মহোৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্তে দিনারপুরে গিয়ে ঠাকুরবাণীর সঙ্গে মিলিত হন।

ঘোষ ঠাকুর বালিশিরার জনৈক মুসলমানকে বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত করেন।

দেহত্যাগ কালে তিনি একটি মশারির ভিতর পদ্মাসনে উপবেশন করেছিলেন এবং চারপাশে ভক্তবর্গ কর্তৃক উচ্চ সংকীর্তন হচ্ছিল।

বাণীকিশোর (ঠাকুর বাণী)

ঠাকুরবাণী এক প্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ। তাঁর পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র, নিবাস দিনারপুর। বাণীকিশোর যখন কিশোর বয়সে পদার্পণ করেন তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। বাণী বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁর মা তাঁর বিবাহ দেন, কিন্তু উদাসচিত্ত পুত্র কোনো প্রকারেরই কাজকর্ম দেখতেন না। একবার ভূমির রাজস্ব বাকি পড়েছিল, কর আদায়ের জন্য পেয়াদা উপস্থিত হলে বাণী কিশোর ভয়ে পলায়ন করেছিলেন। এই ঘটনার পর তিনি গৃহত্যাগ করে নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। শ্রীহট্ট সহরে উপস্থিত হলে তিনি পাগল বলে বন্দিশালে নীত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বন্ধন পুনঃপুনঃ মুক্ত হয়ে পড়ায় কারারক্ষক বিস্মিত হন, তিনি তা নবাবকে জ্ঞাপন করেন। শ্রীহট্টের নবাব এই সংবাদ অবগত হয়ে বাণীকে সিদ্ধপুরুষ জ্ঞানে অনেক অর্থ দান করেন। তিনি সেই অর্থ পথে পথে বিতরণ করে চলে আসেন।

শ্রীহট্ট থেকে ঠাকুরবাণী রূপনাথদর্শনে জয়ন্তীয়ায় উপস্থিত হন। জয়ন্তীয়ায় তিনি সাতদিন ছিলেন। সেখানে এক রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন, স্বয়ং মহাদেব তাঁকে বলছেন— 'পাগলশঙ্কর সমীপে সত্বর উপস্থিত হও, তিনিই তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেবেন।' স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তে বাণী সেখান থেকে চললেন ও নানাস্থানে ভ্রমণ করে নবিগঞ্জের বাজারে উপস্থিত হলেন। এখানে পাগল শঙ্কর নামক সাধুপুরুষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল।

পাগল শঙ্করের জন্মস্থান সতরসর্তী পরগণার বরাকপার গ্রাম। ইনি পরম সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। বাণীকিশোর এক মাস কাল পাগল শঙ্করের কাছে অবস্থান করলেন। এসময় আর একজন মহাপুরুষ তাঁদের সঙ্গে সম্মিলিত ও বন্ধু বলে পরিগণিত হন; ইনি তরফের সৈয়দ বংশীয় সাধক গদা হাসন সাহেব।

কিছুদিন পরে ঠাকুরবাণী ও পাগল শঙ্কর গঙ্গাস্নানের উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ যান। নবিগঞ্জ থেকে যাত্রা করে।

পথে পথে নানা ভঙ্গি নর্তন কীর্তন
পঞ্চদশ দিনে পাইলা গঙ্গার দর্শন। (চরিত্র চিন্তারত্ন)

কটক নগর, অম্বিকা, নবদ্বীপ, শ্রীক্ষেত্র হয়ে প্রত্যাগমন কালে তাঁদের 'বঙ্গাধিপতি যবন রাজের' সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি সাধুদের দৈবশক্তির পরিচয় পেয়ে

শ্রীহট্টাধিপের স্থানে এক পত্র দিয়া
বাণীকে পাঠাইলা দেশে সম্মান করিয়া।

দেশে এসে উপস্থিত হলে একে অন্যের কাছে বিদায় নিয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করেন। এর পরে প্রসিদ্ধ বঞ্চিত ঘোষ অজ্ঞান ঠাকুর ও মালী ধর্মদাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

ধর্মদাস একজন কবি বলে খ্যাত ছিলেন। প্রথমাবস্থায় তিনি বাংলা ভাষায় 'হুসেনপর্ব' রচনা করে যশস্বী হন। শেষ বয়সে তিনি পরমবৈষ্ণব হয়ে ওঠেন এবং সাধু মহাত্মা রূপে দেশবাসীর ভক্তির পাত্র হয়েছিলেন। ধর্মদাস জাতিতে ছিলেন মালী।

একদা বাণীর এক শিষ্য কালীপূজার আয়োজন করেন। তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা হল বাণীকে দিয়ে পূজা করাবেন। কিন্তু একথা পূর্বে বলা হয় নি। যেদিন পূজা হবে সেদিনই তা মনে হল এবং তাঁর প্রাণ বড়ই আকুল হয়ে উঠল। সিদ্ধপুরুষ শিষ্যের আকুলতা নিজপ্রাণে অনুভব করতে পারলেন, তাঁরও মন চঞ্চল হয়ে উঠল ও অনতিবিলম্বে তিনি শিষ্যালয়ে উপনীত হলেন—

দৈববলে জানিয়া সেবকের মনোবথ
চারিদণ্ডে গেলা এক দিবসের পথ।
শিষ্যালয়ে উত্তরিয়া কল্যাণে তাহার
কালীপূজা করিয়া দেখাইলা চমৎকার।
ন ভূত ন ভবিষ্যতি—জীবের অসাধ্য
প্রতিমাকে ভক্ষাইলা পূজার নৈবেদ্য। (চরিত্র চিন্তাবত্ন)

বাণীর এক ব্রাহ্মণ শিষ্যের কন্যা কুব্জা ছিল। শিষ্যের দুঃখ দেখে বাণী স্বয়ং এই কন্যাকে বিবাহ করেন। বাণীর প্রথমা পত্নীর পুত্রের নাম অনন্ত, দ্বিতীয়া পত্নীব পুত্রের নাম রাজেন্দ্র।

রাজেন্দ্র যখন উপযুক্ত হয়েছেন সেই সময়ে অকস্মাৎ একদিন পাগল শঙ্কর তাঁব গৃহে উপস্থিত হলেন। দুজনে বহু কথাবার্তা হল। পাগল শঙ্কর বিদায় নিয়ে পুনরায় তীর্থযাত্রা করলেন। বহুতীর্থ দর্শন শেষে কুরুক্ষেত্রে গেলে তাঁর দেহপাত হল। সিদ্ধপুরুষ বাণীব নির্মল হৃদয়দর্পণে ঐ ঘটনার ছায়াপাত হল। গৃহে থাকতে তাঁর আর ইচ্ছা রইলো না। তিনি পুত্রদের ডেকে মনোভাব ব্যক্ত করলেন ও এক মহোৎসবের আয়োজন করতে বললেন। পুত্রেরা অধীব হলে তাঁদের আশ্বাস দেন— আমি সময়ে সময়ে তোমাদের দেখা দেব।

মহোৎসবের দিন অবিরাম কীর্তন চলতে লাগলো। যখন কীর্তনে সকলেই মত্ত, তখন হঠাৎ ঠাকুর বাণী অদৃশ্য হলেন, তাঁকে আর পাওয়া গেল না।

সেই রাত্রে রাজেন্দ্র স্বপ্নে দেখলেন, যেন পিতা বলছেন, 'রাজেন্দ্র, ভ্রান্ত ধারণা ছাড়, আমি মরিনি, আমার শ্রাদ্ধ করো না। তবে লোক নিন্দা পরিহারের জন্য কিছু করা কর্তব্য।

আমার উদ্দেশ্যে কিছু চিড়া, গুড়, কলা, দুধ ও দই দিও। এসব দ্রব্য গোপালের কাছে ভোগ দিয়ে প্রসাদস্বরূপ আমাকে প্রদান কোরো— তা-ই যথেষ্ট।' পুত্রেরা পিতার শ্রাদ্ধ না করে পিতার উদ্দেশে গোপালের প্রসাদ মাত্র নিবেদন করে দিলেন।

কালক্রমে রাজেন্দ্রের হরিরাম নামে এক পুত্র জাত হয়। জন্মের ষষ্ঠ দিনে আত্মীয়স্বজনেরা হঠাৎ দেখতে পান এক যোগীপুরুষ আগমন করেছেন। ইনি আর কেউ নন ঠাকুর বাণী। শিশুর মাথায় দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করে তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হলেন।

এই হরিরামের পৌত্র, ঠাকুরবাণীর বৃদ্ধ প্রপৌত্র জয়গোবিন্দের মনে হয়েছিল যে ঠাকুর বাণীর শ্রাদ্ধাদি হয় নি, এটা শাস্ত্রসঙ্গত নয়, অতএব গয়াতে গিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করা কর্তব্য। প্রকাশ্যে গয়ার কথা না বলে তীর্থে যাবেন বলে প্রকাশ করলেন। তা শুনে তিনজন শিষ্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার মানসে পুড়াউন্ধা নামক পাহাড়তলির পথে আসতে আসতে পথভ্রমে বিপদগ্রস্ত হলেন। এমন সময় তাঁরা দেখতে পেলেন জটাবল্কলধারী এক ঋষি বন থেকে বার হয়ে তাঁদের সম্মুখীন হচ্ছেন। তাপসের হাতে বিল্বফল। তিনি দূরে একটি পথের রেখা দেখিয়ে বললেন— 'এই পথে তোমরা দিনারপুরে যেতে পারবে।' হাতের ফলটি একজনকে দিয়ে বললেন— 'এই ফলটি জয়গোবিন্দকে দিও; বোলো বাণী মরে নি, গয়ায় পিণ্ড দেওয়া নিষ্প্রয়োজন'।

ঠাকুরবাণীব রোপিত একটি তেঁতুল গাছ দিনারপুরে আছে; গাছটি অতি প্রকাণ্ড ও 'সিদ্ধ তেঁতুল' নামে খ্যাত। বৃক্ষের তলা ইঁটে বাঁধানো। ঠাকুর বাণীর উদ্দেশ্যে এই বৃক্ষের নিচে ভোগ দেওয়া হয়ে থাকে। একদা ঠাকুরবাণী তেঁতুলের টক' খেয়ে তাব একটা বীজরোপণ করেছিলেন, তাতেই এই বৃক্ষ জন্মেছিল।

জগন্মোহন গোসাই

প্রায় পাঁচশো বছর আগে মহাপুরুষ জগন্মোহন জন্মগ্রহণ কবেন। জগন্মোহনের পিতার নাম সুন্দরানন্দ, মাতার নাম কমলা। জগন্মোহন জাতিতে বৈদ্য (মতান্তরে কায়স্থ)— তাঁর পৈতৃক নিবাস বাঘাসুরা।

জগন্মোহন শিশুকাল থেকে কৃষ্ণভক্ত। বিবাহের পরও তাঁর সংসারাসক্তি জন্মায় নি। একদিন তিনি গৃহত্যাগ করে শ্রীক্ষেত্রে চলে যান। মুরারিজী নামক জনৈক ছত্রধারী রামানন্দী বৈষ্ণবের কাছে তিনি দীক্ষা নিলেন। 'পূর্ণব্রহ্ম' উচ্চারণপূর্বক 'সাধু সত্য কি বাণী, গুরু সত্য' এই ধ্বনি উচ্চারণ করতে লাগলেন— ফলতঃ এ তাঁর ধর্মের মূলমন্ত্র স্বরূপ হল।

গুরুর আদেশে জগন্মোহন দেশে এলেন কিন্তু গৃহে না গিয়ে মাছুলিয়ার বিজন বনে বিরলে বসে ভজন করতে লাগলেন। সুধারাম নামে নাগাসন্ন্যাসী একশ সাধু সহ আশ্রমে এসে দেখলেন যে, কোনো দেবমূর্তি নেই। তিনি এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে গোসাই বললেন 'বৈষ্ণব ভগবানের বিগ্রহ, স্বতন্ত্র বিগ্রহের প্রয়োজন কি?' কোনো পর্ব উপস্থিত হলে শিষ্যগণ

দোলমঞ্চ স্থাপন করে তাঁরই পূজা করেছিল। ব্রাহ্মণেরা এতে ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু জগন্মোহনের খ্যাতি বেড়েই চলে। সুলতানশীর মুসলমান ভূস্বামীও তাঁর পক্ষপাতী হয়ে পড়লেন। তুলসীপত্রের ও গোময়ের পবিত্রতা সম্বন্ধে জগন্মোহন বিশ্বাসী ছিলেন না— তিনি অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী ছিলেন। তাঁর আদি শিষ্য গোবিন্দ গোসাই জগন্মোহনের মতানুযায়ী যে সকল সঙ্গীত বচনা করেন, জগন্মোহনী সম্প্রদায়ে তা 'নির্বাণ সঙ্গীত' নামে উক্ত হয়, এর একটি নিদর্শনঃ

ভাবের বন্দো, ভাবের বন্দো পতিতের বন্ধু তুমি হে
প্রভু তোমার লাগিয়া প্রাণ দিতে চাই আমি হে।
রূপ রেখ ধাতুমূর্তি পাষাণ না হও
সর্ব ঘটে আছ তুমি কাকে নাহি হও।
ঢাকিয়া আছ হে প্রভু সর্ব কলেবর
স্বর্গ মর্ত্য রাখিয়াছ উদর ভিতর।
অংশ বিন্দু কলা নহ অক্ষরেব পব
বলেন গোবিন্দ দাস সব ভাইর ভিতর।

হিম্মত খাঁ, বাহাদুর খাঁ, মনসুর খাঁ নামক তিনজন মুসলমানও তাঁর মত গ্রহণ করেছিল। এঁদের নাম হয় যথাক্রমে হৃদয়ানন্দ দাস, বাণেশ্বর দাস ও মনোহর দাস।

১৪৮১ শকাব্দে জগন্মোহন দেহত্যাগ করেন। এঁর জীবন সম্বন্ধে বিবিধ অলৌকিক কথা বর্ণিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ গোসাঞি

রিচি পরগণাবাসী দাস বংশীয় বনমালী ও জাহ্নবীর সন্তান রামকৃষ্ণ ৯৮৩ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র তিন বছর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। যখন রামকৃষ্ণের বয়স ষোল বছর মাছুলিয়া আখড়াবাসী জগন্মোহন সম্প্রদায়ী শান্ত গোসাঞি রিচিতে জনৈক শিষ্যগৃহে উপনীত হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে মাছুলিয়ার আখড়াতে যেতে বলেন। রামকৃষ্ণ ৯৯৯ বঙ্গাব্দে মাছুলিয়ার আখড়াতে গিয়ে শান্ত গোসাঞির কাছ থেকে ভেখ আশ্রয় কবেন। এ সময তিনি স্বয়ং নির্বাণ সঙ্গীত বচনা করে গান ও ভজন করতেন, যথা

তোমাবে আমি ভজিব কেমনে,
ও নাথ! তোমারে আমি ভজিব কেমনে!
অক্ষর নির্ণয় নাই, জপ তপে নাহি পাই
রূপ বর্ণ না দেখি নয়নে
হইয়াছে হইবে যত তোমার মহিমা হত
নিমিষিতে না রবে সকল।

রামকৃষ্ণ যখন আঠাশ বৎসরের যুবক তখন গুরুদেবের আদেশে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। এই বয়সেই তিনি দেশের লোকের অর্চনীয় হয়ে উঠেছিলেন। মাছুলিয়া থেকে রামকৃষ্ণ বর্তমানে হবিগঞ্জ হয়ে বিথঙ্গল আসেন। এই স্থানটি তাঁর বড় সুন্দর বোধ হল। এরপর ঢাকা, ভবানীপুর, কালীঘাট, গঙ্গাসাগর দর্শন করে শ্রীক্ষেত্রে যান। জগন্নাথ দর্শন কালে তিনি সজল নয়নে

নমঃ প্রসন্ননেত্রায় নীলাচলবিহারিণে
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ দারুব্রহ্ম রূপায়তে।

নিজকৃত এই স্তুতি বাববার পাঠ করেছিলেন। তিনি দশ বছর নীলাচলে থাকেন। পুনরায় তীর্থ যাত্রায় বাব হন। বৈষ্ণববর্গ রামকৃষ্ণের মুখে অবিরত 'পূর্ণব্রহ্ম' ইতি ধ্বনি শ্রবণে তাঁকে অসম্প্রদায়ী বোধ করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁর অত্যদ্ভুত মহিমা তাঁদেব গোচরীভূত হয়।

তাঁর গুণাবলী শুনে তরফের অন্যতম জমিদার সৈয়দ হুসেন আলী তাঁব সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং সাধুর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে, তাঁকে উপহার দেওয়ার উপলক্ষে, হিন্দুর অভক্ষ্য দ্রব্যাদি প্রদান কবেন। রামকৃষ্ণ একটি শঙ্খবাদন পূর্বক উপহার গ্রহণ করলেন। আচ্ছাদন উন্মোচন করলে দেখা গেল পাত্রের মধ্যে মিছরি চিনি কলা প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য রয়েছে।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ কর্তৃক বিথঙ্গলের প্রসিদ্ধ আখড়া স্থাপিত হয়; এবকম বৃহৎ আখড়া পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয়টি নেই।

১০৫৯ বঙ্গাব্দে (১৬৫২ খ্রীঃ) মাঘী পূর্ণিমাযোগে ৭৬ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

শ্রীহট্টের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ

প্রথম অধ্যায়— প্রাচীন ও মধ্যযুগ

রাজনৈতিক পটভূমি — শাসন ব্যবস্থা — ধনসম্পদ — সমাজব্যবস্থা — ধর্ম — সাধক — বিদেশে শ্রীহট্টবাসী — শিক্ষা — সাহিত্য — স্ত্রীজাতির স্থান — সতীদাহ — হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক — গীতবাদ্য — বেশভূষা — বিবাহরীতি — দেশের সাধারণ অবস্থা ॥

শ্রীহট্টের সমাজচিত্র

প্রথম অধ্যায়— প্রাচীন ও মধ্যযুগ

রাজনৈতিক পটভূমি

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শ্রীহট্টের উল্লেখ সুপ্রাচীন কাল থেকে পাওয়া যায়। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বলেন "শ্রীহট্টের নাম একখানি প্রাচীন লিপিতে বড়ই কৌতূহলাবহভাবে উল্লেখিত আছে। সিংহপুর রাজকন্যা জালন্ধর রাজবধূ ঈশ্বরা দেবী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার অবদান-প্রশস্তির শীর্ষভাগে 'শ্রীহট্টাধিশ্বরেভ্যঃ' এইরূপ একটি শব্দ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ... ডাক্তার বুহলার ঐ প্রশস্তির লিপি আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের বলিয়া মনে করেন। ... ইহাতে দেখা যাইতেছে যে ভাস্কর বর্মার শাসনেব পূর্বেই শ্রীহট্ট নামক একটি দেশ ছিল।" (মাসিক 'বিজয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ)।

বরবক্র, মনু প্রভৃতি নদীকে অনেক প্রাচীন গ্রন্থে 'সর্বপাপ প্রনাশন' বলা হয়েছে। 'বায়ুপুরাণে' আছে

বিন্ধ্যপাদসমুদ্ভূতো বরবক্র সুপুণ্যদঃ।
যত্র স্নাত্বা জলং পিত্বা নরঃ সদ্‌গতিমাপ্নুয়াৎ॥

'কালিকা পুরাণ', 'যোগিনীতন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীট্টের উল্লেখ পাওয়া যায়। যোগিনীতন্ত্রে শ্রীহট্টের সীমা নির্দেশ করে বলা হয়েছে

পূর্বে স্বর্ণ নদীশ্চৈব দক্ষিণে চন্দ্রশেখরঃ
লৌহিত্য পশ্চিমভাগে উত্তরে চ নীলাচলঃ
এতন্মধ্যে মহাদেবি শ্রীহট্ট নাথো নামতঃ।

শ্রীহট্টের প্রাচীনতম যে রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে দেব বংশ বলে পরিচিত করা যেতে পারে। উনিশ শতকের শেষ পাদে ভাটেরা গ্রামে দুটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছিল। তা থেকে এই বংশের পরপর পাঁচজন নৃপতির নাম পাওয়া গেছে, যথা— নবগীর্বান, তৎপুত্র গোকুল দেব, তৎপুত্র নারায়ণ দেব, তৎপুত্র কেশবদেব, তৎপুত্র ঈশান দেব।

তাম্রফলকে নৃপতিদের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা পাঠ করে জানা যায় এঁরা প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন, এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণের পোষক, বিষ্ণু ও শিবের মন্দির এঁরা নির্মাণ করেছিলেন এবং তুলাপুরুষ দান রূপ শ্লাঘনীয় কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

অচ্যুত চরণ চৌধুরী মনে করেন এই তাম্রফলক দুটি শ্রীহট্টে পূর্ববর্তী কালেব।

একটি তাম্রফলকে যে তারিখ দেওয়া আছে— ২৩২৮ পাণ্ডব কুলাধিপালাব্দ' (অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাব্দ) তা থেকে কাল বিষয়ে সুনিশ্চিত ধারণা করা দুঃসাধ্য। তবু তাম্রফলকগুলি যে অতি প্রাচীন তার প্রমাণ আছে।

একটি প্রমাণ তাম্রফলকে উল্লিখিত গ্রাম ও নদীর নাম। বাংলার জনপদ ও নদীর নামের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁদের সামান্য জ্ঞান আছে তাঁরাই বুঝবেন এগুলি কত প্রাচীন নাম— অথিনহাটকে, অনীকাথী, অনিঘণাকোণার্ক, উগডাট, কডডিয়া, কানিয়ানী (নদী), গৃড্ডভাটপড়া, চাট্টপড়া দেবসত্র, নডকুটীগাম, নাটয়ান, ভাস্কর টেক্করী, বিথায়ীনগর, শবগানদী, সিহাবডগ্রাম, হড্ডিপগৃহ ইত্যাদি।

এ নামগুলির প্রচিনত্ব বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কানিয়ানী নদী, নাগাই নদী প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হয়তো দুয়েকটি জনপদও বিলুপ্ত। অচ্যুত চবণ চৌধুরী ঠিকই অনুমান করেছেন 'গুড়াবয়ী' নামটিই বর্তমান 'গুড়াভই'।

কিন্তু গ্রাম ও নদীর নামগুলি প্রাচীনত্বদ্যোতক হলেও খৃষ্টপূর্বকালের কিনা জোব কবে বলা যায় না। রাজাদের নাম— 'গোকুল দেব', 'নারায়ণ দেব', 'কেশব দেব' এবং রাজমন্ত্রীর নাম— 'বনমালী কর' দেখে অনুমান করা যায় সবই বিষ্ণু-প্রভাবিত নাম। বিশেষতঃ 'বনমালী' নামটি সংশয় জাগায়। কেশব দেব সম্বন্ধেও বলা হয়েছে তিনি 'ভগবান গোবিন্দেব ন্যায শত্রু বিমর্দক' ছিলেন।

তাম্র ফলক দুটির কাল নিরূপণ সহজসাধ্য না হলেও ষষ্ঠ শতকের পূর্ববর্তী বলা সমীচীন।

১৯১২ সালে নিধনপুর তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হলে মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ সরস্বতী তাব যে পাঠ নিরূপণ ও অনুবাদ করেন তার ফলে শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাসের উপব নতুন আলোকপাত হয়। নিধনপুর তাম্রশাসন দ্বারা আসামের বর্মণ বংশীয় রাজাদের সুনির্দিষ্ট বংশলতিকা রচনা কবে কাল নির্দেশ সম্ভব হয়েছে। এই বংশে পরপর রাজা হন— পুষ্যবর্মণ, সমুদ্রবর্মণ, বলবর্মণ, কল্যাণবর্মণ, গণপতিবর্মণ, মহেন্দ্রবর্মণ, নারায়ণবর্মণ, মহাভূতিবর্মণ, চন্দ্রমুখবর্মণ, স্থিতবর্মণ, সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মণ, ভাস্করবর্মণ। পুষ্যবর্মণ চতুর্থ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, ভাস্কর বর্মণের কাল সপ্তম শতাব্দী। সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীহট্ট কামরূপের শাসনাধীনে চলে যায়।

প্রাচীন শ্রীহট্টের উল্লেখ আরেকবার পাই সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণদের শ্রীহট্ট আগমনের বিবরণে। বলা হয় ত্রিপুরার রাজা আদি ধর্মপা যজ্ঞ উপলক্ষে মিথিলা থেকে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে আনান তাঁরাই শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের আদি পুরুষ। এ বিষয়ে অনেকে 'বৈদিক পুরাবৃত্ত' নামক গ্রন্থের একটি অংশ উদ্ধৃত করে থাকেন—

শ্রুত্বা সাধুমতং রাজা ত্রিপুরাধিপতিঃ পুরা।
বিহায় বৌদ্ধধর্মঞ্চ ধর্মং জগ্রাহ পণ্ডিতাৎ॥
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা ব্রহ্মচর্যং যথাবিধি।
চকার বৎসরং পূর্ণং গঙ্গাস্নানাদিকম্ ব্রতম্॥
নানাতীর্থ-পর্যটনং কৃত্বা তু নৈমিষে বনে।
জাত্যুৎকৃষ্টত্ব লাভার্থং পঞ্চাতপ পরীক্ষণম্॥

এবং নানাবিধং কর্ম কৃত্বা নির্মলমানসঃ।
তপস্বিনাং প্রসাদেন ক্ষত্রিয়ত্বমবাপ্তবান্॥
ততঃ সর্বে দ্বিজগণাঃ শান্তিং কৃতাধিবাস্য চ।
আদি ধর্মপা চাখ্যানং দদুস্তং রাজশাসনাৎ॥

* * *

ততঃ ধর্মোপদেশার্থং স্বদেশে ত্রিপুরাপতিঃ।
আনয়ামাস বিপ্রেন্দ্রান্ পঞ্চোত্তম তপস্বিনঃ॥

— 'তৎপর ত্রিপুরেশ্বর পণ্ডিতদেব সাধুমত শুনে বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করে তাঁদের কাছ থেকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেন; এবং উৎকৃষ্ট জাতিত্ব লাভের জন্য যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করে এক বৎসরকাল ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠান, গঙ্গাস্নানাদিব্রত, নানা তীর্থ পর্যটন ও নৈমিষ বনে পঞ্চাতপ পরীক্ষা করলেন। এইরূপ নানাবিধ কর্ম করে বিশুদ্ধচিত্ত হলেন এবং তপস্বিগণের প্রসাদে ক্ষত্রিয়ত্বলাভ করলেন। তৎপর রাজাজ্ঞায় ব্রাহ্মণেরা শান্তি ও অধিবাস করে তাঁকে 'আদি ধর্মপা' এই আখ্যা প্রদান করলেন। . . . অতঃপর ত্রিপুরাধিপতি স্বদেশে ধর্মোপদেশার্থ ধার্মিক ও শাস্ত্রজ্ঞ পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।'

আদি ধর্মপা হর্ষবর্ধনের যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন বলে 'বৈদিক পুরাবৃত্তে' উল্লিখিত হয়েছে। যাঁরা 'বৈদিক পুবাবৃত্ত'কে প্রামাণ্য জ্ঞান করেন তাঁরা বলেন '৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মিথিলাধিপতি বিশেষ এক যজ্ঞ উপলক্ষে ভারতীয় রাজন্য ও পণ্ডিতবর্গের সমক্ষে বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করান। যজ্ঞাবসানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ত্রিপুরেশ্বর হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে নিজ রাজ্যে হিন্দুধর্ম প্রচার মানসে পাঁচটি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।' (উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ — কাছাড়ের ইতিবৃত্ত)।

ত্রিপুরার রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস কিংবদন্তীতে পূর্ণ। চতুর্দশ শতাব্দীতে মাণিক্য উপাধিক রাজাদের অভ্যুদয়ের পূর্বে এ বাজবংশের কোনো বিশ্বাসযোগ্য তালিকা পাওয়া যায় না। আদি ধর্মপা কে ছিলেন এবং কখন আবির্ভূত হন তা বলা অসাধ্য। তবে ত্রিপুবার রাজারা যখন কাছাড় ত্যাগ করে শ্রীহট্টের সীমান্তে প্রথম প্রবেশ করেন এ কাহিনী তখনকার কথা বলে মনে হয়। তাঁরা সম্ভবতঃ তখনো দক্ষিণ ত্রিপুরার দিকে অগ্রসর হন নি। 'ফা' উপাধিযুক্ত এই রাজাব পরিচয় অনাবিষ্কৃত রয়ে গেলেও যজ্ঞ উপলক্ষে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন সুনিশ্চিত ঘটনা এবং তা অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তী নয়। অচ্যুতচরণ চৌধুরী আদি ধর্মপার যজ্ঞের কাল নিরূপণ করেছেন ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে।

আদি ধর্মপার পরে আরো একজন ত্রিপুর নৃপতি বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন— ইনি স্বধর্ম পা। এই যজ্ঞ কৈলারগড়ে, বর্তমান কৈলাসহরের সন্নিকটে হয়েছিল। অচ্যুতচরণ চৌধুরী মনে করেন যজ্ঞটি হয়েছিল ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই যজ্ঞে নৈপুণ্য দেখিয়ে নিধিপতি (ইটার রাজা সুবিদনারায়ণের পূর্বপুরুষ) ভূমি লাভ করেছিলেন।

এরপরে শ্রীহট্টের যে রাজার নাম পাওয়া যায় তিনিও ত্রিপুর রাজবংশোদ্ভূত ছিলেন বলে জনশ্রুতি। রাজা গৌড়গোবিন্দের কাল নিয়ে বিভ্রমের অবকাশ নেই। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে

১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শাহজলালের অভিযানের ফলে গৌড়গোবিন্দ রাজ্যচ্যুত হন। ওই সময় থেকে শ্রীহট্টে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত এবং একটানা চারশো বছর ধরে তা চলেছিল। গৌড় বিজয়ের পর শাহজলালের অনুচরেরা সহজেই তরফ অধিকার করে নিয়েছিলেন। সে সময় শ্রীহট্টে প্রধানতঃ তিনটি রাজ্য ছিল— গৌড়, লাউড ও জয়ন্তীয়া। জয়ন্তীযা কোনোদিন মুসলমান শাসকদেব পদানত হয় নি। লাউড়ের হিন্দুরাজবংশ বিলুপ্ত হবার আগে ওখানেও মুসলমান আধিপত্য ছিল না। এই তিনটি বাজ্য ছাড়া আরো ক-টি ছোট ছোট রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন— তরফ, ইটা, জগন্নাথপুব ও প্রতাপগড়। খুব সম্ভব মগধ নামেও একটি বাজ্য ছিল। এদের মধ্যে কয়েকটি রাজপবিবারকে বলক্রমে ইসলামধর্ম গ্রহণ করানো হয়।

গৌড়, লাউড়, তরফ, ইটা একে একে মুসলমান শাসনকর্তাদেব অধীনে চলে গেলেও পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরা, জয়ন্তীয়া ও কাছাড়ে হিন্দু রাজবংশ শেষ অবধি ক্ষমতাসীন ছিলেন। কোচ এবং আহোম রাজারাও মধ্যে মধ্যে শ্রীহট্ট আক্রমণ করে এখানকার মুসলমান শাসনকর্তাদের পর্যুদস্ত করেছিলেন। প্রতাপগড়ে মুসলমান ভূম্যধিকাবী থাকলেও এখানে শ্রীহট্টের ফৌজদারের শাসন প্রসারিত হয়েছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। কিন্তু শ্রীহট্টেব হিন্দু রাজবংশ ও উচ্চ বর্ণভুক্ত ব্যক্তিদেব মধ্যে একতাব অভাব ছিল।

দিল্লীর মোগল বাদশাদের আমলে শ্রীহট্টের শাসন ব্যবস্থা কিছুটা দৃঢীকৃত হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে তা আবার শিথিল হতে শুরু করে। মুর্শিদাবাদের নবাবেরা শ্রীহট্ট থেকে রাজস্ব আদায়ে তৎপরতা দেখালেও শাসনব্যবস্থাব উন্নতি ঘটাতে পাবেন নি। বর্গীর অত্যাচার ছিল না সত্য, কিন্তু মগ ও পোর্তুগীজ জলদস্যু এবং খাসিয়া-কুকি প্রভৃতি পার্বত্য জাতির আক্রমণে শাসনকর্তারা নিরুপায় বোধ করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এঁদের দুর্বল হাত থেকে ক্ষমতা অধিকার করতে ইংরাজ রেসিডেন্টকে বেগ পেতে হয় নি। তিনি মুসলমানদের বিদ্রোহেব সামান্যতম চেষ্টাও অঙ্কুরে বিনষ্ট করেছিলেন।

শাসনব্যবস্থা

শাহজলালের শ্রীহট্ট বিজয়ের পব কিছুদিন পর্যন্ত তাঁরই কয়েকজন অনুচব শ্রীহট্টেব শাসনকার্য পবিচালনা করেন, যথা— সিকন্দর গাজী, হায়দর গাজী। এঁদের ক্ষমতা শ্রীহট্ট শহরের বাইরে বেশিদূর প্রসারিত ছিল না। এবপব বাংলাব নবাবেরা প্রত্যক্ষভাবে শ্রীহট্টের শাসনভার গ্রহণ করেন।

নবাবদের দ্বারা নিযুক্ত সর্বপ্রধান বাজকর্মচারী ছিলেন কানুনগো। ইনি শাসন, বিচার, রাজস্ব আদায়, সৈন্য পবিচালনা সবক্ষেত্রেই ছিলেন সর্বাধিনায়ক। কিছুকাল পরে তাঁকে সহায়তা করবার জন্য দেওয়ান নিযুক্ত হন। সম্রাট আকবরের সময় কানুনগোদের ক্ষমতা কমিয়ে শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শ্রীহট্ট সদবে একজন কানুনগো থেকে সমগ্র 'গৌড়' অঞ্চলের কাজ চালাতেন; কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে তাঁব ক্ষমতা আরো খর্ব করা হয়— ইটা, কানিহাটি, বরমচাল ও লংলাব জন্য স্বতন্ত্র কানুনগো নিযুক্ত হন।

কানুনগো পদ প্রায়ই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যেত ; শ্রীহট্টের মজুমদার বংশ দীর্ঘদিন বংশপরম্পরায় কানুনগোর কাজ করেছেন। কানুনগোদের মধ্যে হিন্দুও ছিলেন অনেকে ; ইটাবাসী অর্জুন বংশীয় কানুনগোরা বিশেষতঃ রতিরাম প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন।

মোগল আমলে শাসনক্ষমতা কানুনগোদের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে 'আমিল'দের হাতে দেওয়া হয়। আমিলেরা পরবর্তী যুগে ফৌজদার, থানাদার নামেও অভিহিত হতেন। এঁরা সকলেই নবাব উপাধিধারণ করতেন, সেজন্য সাধারণ্যে ফৌজদার 'নবাব' নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীহট্টের নবাব পদে সাধারণতঃ রাজবংশ-সম্পৃক্ত বা অতি অভিজাত ব্যক্তি নিযুক্ত হতেন। শ্রীহট্টের নবাব পদে অন্ততঃ একবার একজন খ্যাতনামা হিন্দু নিযুক্ত হয়েছিলেন— ইনি দস্তিদার বংশের পূর্বপুরুষ হরকৃষ্ণ রায়, 'নবাব হরকিষুণ রায় মনসুর-উল্-মুলুক বাহাদুর'।

ফৌজদারের ঠিক তলায় ছিলেন 'নায়েব ফৌজদার'। এই পদও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ— এঁরাও প্রায় সবাই নবাব উপাধি গ্রহণ করতেন। ফৌজদার শমসের খাঁর অধীনস্থ অন্ততঃ চারজন নায়েব ফৌজদারের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে— নবাব সুজাউদ্দীন খাঁ, নবাব বশারত খাঁ, নবাব সৈয়দ রফিউল্লা হাসনি, নবাব মোহম্মদ হাসন।

ফৌজদারের প্রায় তুল্য মর্যাদার অধিকারী ছিলেন দেওয়ান। দেওয়ান ছিলেন মূলতঃ রাজস্ব ও বিচার বিভাগের প্রধান কর্তাব্যক্তি। বিশেষতঃ রাজস্ব বিভাগে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ পদাধিকারী। এই পদও উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা হতো। দেওয়ান পদে শুধু যে হিন্দুরা নিযুক্ত হতেন তা নয়, আশ্চর্যের বিষয় শ্রীহট্টের দেওয়ান পদে প্রায় তিন শ বছর ধরে একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা নিয়োজিত হয়েছেন। এই বংশের কৃতী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম উল্লেখনীয় নাম আনন্দরাম গুপ্ত। ইনি রাঢ়দেশাগত বৈদ্য জাতীয় ব্যক্তি ছিলেন, রাজদরবারে প্রতিপত্তির নিদর্শন স্বরূপ রায় উপাধিলাভ করেন। এরপর থেকে এঁদের বংশে রায় উপাধির প্রচলন হয়। এ বংশে জন্মেছেন মুক্তারাম, মানিকচাঁদ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। মানিকচাঁদ শ্রীহট্টের শেষ দেওয়ান। ব্রিটিশ আমলের প্রথম ভাগেও তিনি কর্মরত ছিলেন। দেখা যায় একবার কোনো মামলা উপলক্ষে ঢাকায় যাবার প্রয়োজন পড়লে মানিকচাঁদ দেওয়ানের কর্মভার সাময়িকভাবে অর্পণ করেন রেসিডেন্ট লিন্ডসে সাহেবের হাতে। মানিকচাঁদের একমাত্র পুত্র মুরারিচাঁদই রাজা গিরীশচন্দ্রের মাতামহ।

দেওয়ান প্রত্যক্ষভাবে দিল্লীর সম্রাটদের দ্বারা নিযুক্ত হতেন বলে তাঁর উপর ফৌজদারের নিয়ন্ত্রণ ছিল না ; উপরন্তু লাউড়, ইটা, তরফ প্রভৃতি স্থানের অধিপতিরা ফৌজদারের সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করলেও দেওয়ানের বৈরিতা করতে সাহসী হতেন না। ইটার রাজা সুবিদনারায়ণ দেওয়ান আনন্দনারায়ণের বিরোধিতা করতে গিয়ে নিজের পতন ডেকে আনেন। অন্যান্য হিন্দু দেওয়ানের মধ্যে খ্যাতনামা ঢাকার দেওয়ান সম্পদ সেন (পঞ্চেশ্বরবাসী), ভাগলপুরের দেওয়ান শ্যামরায় (ইটাবাসী) ও ইটাবিজয়ী খোয়াজ ওসমানের দেওয়ান নরসিংহ দাস।

রাজস্ব বিভাগে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদ হচ্ছে দস্তিদার ও পাটওয়ারি। কখনো কখনো একই ব্যক্তি কানুনগো ও দস্তিদার পদ অলঙ্কৃত করেছেন, যেমন নবাব হরকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র জয়কৃষ্ণ দস্তিদার।

পাটওয়ারির স্থান ছিল কানুনগোর ঠিক নিচে। এঁরা বেতন পেতেন না, জমির কিছু উপস্বত্ব ভোগ করতেন মাত্র ; এই উপস্বত্বেরও কিছু অংশ সদরের কানুনগোকে নজরস্বরূপ দিতে হত।

রাজস্ববিভাগে খাজাঞ্চির কাজ ছিল প্রধানতঃ হিন্দুর হাতে। এঁদের বলা হত 'সাহাজি'। এর কারণ সম্ভবতঃ এঁদের অনেকে ছিলেন সাহা বংশজাত। খাজাঞ্চি যেমন তহবিলের ভারপ্রাপ্ত তেমনি ফোতাদার বা পোত্দারের কাজ ছিল মুদ্রাপরীক্ষা।

দেওয়ানী সেরেস্তায় অন্যান্য কর্মচারীর মধ্যে ছিলেন মুস্তফী বা সেরেস্তাদার, আমীন, পেশকার, মুনশী ইত্যাদি।

সৈন্য বিভাগে ফৌজদার স্বয়ং ছিলেন প্রধান। তাঁকে সাহায্য করতেন সুবেদার, বকশী, জমাদার, হাজারি প্রভৃতি। সৈন্য বিভাগেও কোনো কোনো হিন্দু উচ্চস্থান অধিকার করেছিলেন, যথা সেনাপতি হরদয়াল, সুবেদার কল্যাণসিংহ। নবাব হরকৃষ্ণের দুজন প্রধান সেনানায়ক ছিলেন— রাধানাথ, মাধব খাঁ (মতান্তরে মহাতাব খাঁ)।

বিচার বিভাগের প্রধানের নাম কাজি। ফৌজদার নিজেও বিচার করতেন, তাঁরও কয়েদখানা ছিল, কিন্তু সাধারণভাবে বিচারের ভার ন্যস্ত ছিল কাজির উপরে। বিশেষতঃ দেওয়ানী বিচারে কাজিদের স্থান সর্বোচ্চ। কাজিরা সে আমলে সামান্য কিছু সৈন্য রাখার অধিকারী ছিলেন। কাজিকে সহায়তা করতেন মুসলমান আইনের ক্ষেত্রে মুফ্তি ও হিন্দু আইনের ক্ষেত্রে রাজপণ্ডিত। এঁরা ভূমি পেতেন। রাজপণ্ডিতি সনদ যে বিশেষ মূল্যবান ছিল তা বোঝা যায় অনেকগুলি পরিবারের সনদ থেকে।

শ্রীহট্টের প্রধানতম কাজির আদালত কিন্তু সদরে ছিল না, তা অবস্থিত ছিল তরফে সুলতানসিতে।

ভূম্যধিকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন চৌধুরী— এটি নবাবি আমলের মর্যাদাসূচক উপাধি। এছাড়া ছিলেন মিরাশদার, শিকদার, তরফদার, তালুকদার প্রভৃতি। কিন্তু রাজস্ব আদায়ে সে যুগে এত কড়াকড়ি ছিল যে অনেকেই ইজারাদার হতে চাইতেন না। সময়মতো খাজনা দিতে না পারলে অনেক বড় বড় জমিদারকেও 'বৈকুণ্ঠবাস' করতে হত।

ধনসম্পদ

প্রাচীন আমলে শ্রীহট্টের রাজস্ব আদায় কি রকম হত তা জানা যায় না, কিন্তু মুসলমান আমলের রাজস্ব আদায়ের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। আকবরের কালে শ্রীহট্ট ছিল সুবে বাংলার উনিশটি 'সরকারের' অন্যতম। টোড়রমল শ্রীহট্টকে আটটি মহলে ভাগ করে প্রতি মহলের রাজস্ব সুনির্দিষ্ট করেন। সমগ্র 'সরকারের' রাজস্ব নির্দিষ্ট হয় ১৬৭০৪০, টাকা। রাজস্ব হিসাবে এর পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়। শ্রীহট্টের আমিলের ভাই যখন কোচ সেনাপতি চিলারায়ের হাতে বন্দী হন তাঁকে মুক্ত করার জন্য পণস্বরূপ দিতে হয়েছিল ২০০ ঘোড়া, ১০০ হাতি, ৩০০,০০০, টাকা ও ১০,০০০ মোহর। আর্থিক অবস্থা উন্নত না হলে এই বিরাট পণ দেওয়া সম্ভব হত না।

মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে 'চাকলা শিলহাটের' ১৪৮ টি পরগণাব রাজস্ব নির্দিষ্ট হয় ৫৩১৪৫৫. টাকা। যদিও তখন সরাইল, জোয়ানশাহী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরগণা শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল এ খাজনা খুব বেশি বলে মনে হয় না, কারণ সুবে বাংলার তেরটি চাকলার মধ্যে শ্রীহট্টের স্থান ছিল দ্বাদশ। শ্রীহট্টের আর্থিক অবস্থা যে নিম্নগামী হচ্ছিল এ তার ইঙ্গিত।

আইন-ই-আকবরি পাঠে জানা যায় শ্রীহট্ট থেকে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হত কাঠ, কমলালেবু, শেরগঞ্জ ও বিহঙ্গরাজ পাখি প্রভৃতি। পরবর্তী যুগে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে বড় স্থান অধিকার করে চূণ, শুকনো মাছ, শীতলপাটি ও সফ, ঢাল, মধু, অগুরু প্রভৃতি। আরেকটি জিনিস সিলেট থেকে প্রচুর চালান যেত— তা হচ্ছে 'খোজা'। খোজা করার পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে জাহাঙ্গীর আইন করে এই নৃশংস প্রথা দমনের প্রযাস পান।

রাজস্ব আদায়ের জন্য উৎপীড়নের ফলে শ্রীহট্টে বড় কোনো জমিদার বা ইজারাদার দেখা যেত না। তুলনামূলকভাবে সাধারণ রায়তদের আর্থিক অবস্থা ভালোই ছিল বলে মনে হয়।

ব্যবসার কিছু প্রসাব হয়েছিল নিঃসন্দেহে। বড়লিখার দুর্লভরাম ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী— ইনি লবণের একচেটিয়া ব্যবসায়ে বিপুল বিত্ত অর্জন করেন। শ্রীহট্টের এবং কাছাড়ের কোনো কোনো পাহাড়ে লবণের 'খুলি' ছিল। 'খুলি' অর্থে তরল লবণাক্ত জল, আখের রসের মতো এই জল জ্বাল দিয়ে লবণ প্রস্তুত করা হত। পরে অনেক 'খুলি' পাথর চাপা দিয়ে নষ্ট করা হয়। দুর্লভরাম দাতা হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ— ঢাকাদক্ষিণ মহাপ্রভুর মন্দিরে তিনি প্রতি বছর সোনার উপবীত ও সোনার মোহনমালা নিবেদন করতেন। একবার নৌকাপূজায় তিনি দশ হাজার সোনার বিল্বপত্র দিয়ে দেবীর অর্চনা করেছিলেন। জনসাধারণের হিতার্থে তিনি অনেক পুল ও দীঘি নির্মাণ করেন। এগুলি দুর্লভদাসী পুল ও দীঘি নামে পরিচিত।

দুর্লভদাসের ভ্রাতা জোড়া রায়ও কৃতী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর পুত্র রাধাকৃষ্ণ রায় নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। দুর্লভদাসের দুই পুত্র হুকমত রায় ও সাহেব রাম পিতার মতো ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করেন। এঁরা 'পলওয়ার' নামক বিরাট বিরাট নৌকাযোগে চাল রপ্তানি করতেন। একবার মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষের সময় হুকমত রায় দরিদ্রদের মধ্যে প্রচুর চাল বিতরণ করেন— এজন্য মুর্শিদাবাদের নবাবেরা হুকমত রায়ের বিশেষ গুণগ্রাহী হন। সাহেবরামও নবাবদের প্রিয়পাত্র ছিলেন— তাঁকে তাঁরা 'রাজাজী' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতকে আরো কজন ব্যবসায়ী বিত্ত অর্জন করেন। মুর্শিদাবাদ থেকে ছুরি, কাঁচি, তরোয়াল, বাক্স প্রভৃতি আমদানি করে।

শ্রীহট্টে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ ছিল এরকম—

৫ কৌড়িতে	১ গন্ডা
৫ গন্ডায়	১ পয়সা
২০ গন্ডায় বা ৪ পয়সাতে	১ আনা বা পণ
১৬ পণে	১ কাহন বা টাকা।

ইংরাজ আমলের গোড়াতেও কড়ির প্রচলন ছিল— শ্রীহট্ট সমুদ্র থেকে দূরবর্তী হলেও এখানে এত কড়ির প্রচলন হল কি করে এই ভেবে লিন্ডসে সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বহু চেষ্টা করে কড়ির দ্বারা রাজস্ব পরিশোধের রীতি রহিত করেন।

শ্রীহট্টে ভূমির পরিমাণ—

৩ ক্রান্তিতে	১ কড়া
৪ কড়ায়	১ গন্ডা
২০ গন্ডায়	১ পণ
৪ পণে	১ রেখ (৪৯ বর্গহাত)
৪ রেখে	১ যষ্টি
৭ যষ্টিতে	১ পোয়া
৪ পোয়া বা ২৮ যষ্টিতে	১ কেদার (কেয়ার)
১২ কেদারে	১ হল (হাল) অর্থাৎ ৬৫৮৫ বর্গহাত।

শ্রীহট্টে আজও সংস্কৃতমূলক রেখ, যষ্টি, কেদার, হল প্রভৃতি প্রচলিত এ কম বিস্ময়ের কথা নয়।

সমাজব্যবস্থা

অমরকোষের টীকায় বলা হয়েছে যে দেশে চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা নেই সেই দেশ ম্লেচ্ছদেশ। কামরূপ বঙ্গাদি ম্লেচ্ছ দেশ, তদ্ব্যতীত স্থান আর্যাবর্ত— অর্থাৎ যেখানে যেখানে চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা আছে সেই দেশই আর্যাবর্ত।

শ্রীহট্টে চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা কবে থেকে গৃহীত হয়েছে তা বলা কঠিন। তবে তা বেশ প্রাচীন কালেই ঘটেছিল।

ব্রাহ্মণ— চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের স্থান সর্বাগ্রে। শ্রীহট্টে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণদের আগমন প্রসঙ্গে জানা যায় ত্রিপুর বংশীয় মহারাজ আদিধর্মপা যজ্ঞ উপলক্ষে মিথিলা থেকে পাঁচজন বৈদিক ব্রাহ্মণকে আনেন। এঁরা হলেন বৎস গোত্রোৎপন্ন শ্রীনন্দ, বাৎস্যগোত্রোৎপন্ন আনন্দ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গোবিন্দ, কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় শ্রীপতি এবং পরাশর গোত্রীয় পুরুষোত্তম। পরে আরো পাঁচ গোত্রের বৈদিক ব্রাহ্মণ এঁদের অনুগামী হয়ে আসেন। এঁরা পঞ্চখণ্ডে উপনিবিষ্ট হন। আরো কিছুকাল পরে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ নিধিপতি ত্রিপুরার অন্য এক মহারাজার যজ্ঞ সম্পাদন করে ইটায় উপনিবিষ্ট হন। কিন্তু এই বিদেশাগত ব্রাহ্মণদের পূর্বেও এদেশে ব্রাহ্মণ ছিলেন— ভাটেরা তাম্রশাসন তার সাক্ষ্য দেয়। বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, পরাশর, কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদগুল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম— এই সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণরা ছাড়াও এদেশে অনেক প্রাচীন উচ্চকুলজাত ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশের বাস ছিল। দুলালীর শাণ্ডিল্য ও কৃষ্ণাত্রেয় বংশীয় ব্রাহ্মণদের কথা এখানে বলা

যায়। অচ্যুতচরণ চৌধুরী বলেন, সাম্প্রদায়িক না হলেও 'বেজোড়া, বামৈ, দুলালী, আতুয়াজান, বোয়ালজোর, ইটা, চৌয়ালিশ, বনভাগ প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ বংশীয়গণ প্রাচীনত্বে ও মর্যাদায় সুমহৎ। মাসকান্দি, ইসাকপুর, লক্ষ্মীপুর, কাশীপুর প্রভৃতির ভট্টাচার্যগণ এবং পঞ্চখণ্ডের শাণ্ডিল্য ও মৌদ্‌গুল্য, ইন্দেশ্বরের ভরদ্বাজ, বালিশিরার আত্রেয়, সাতগাঁও-এর বাৎস্য ও কাশ্যপ, ইটার বশিষ্ঠ প্রভৃতি গোত্রীয়গণ সম্ভ্রান্ত ও সমাজমান্য। বাণিয়াচঙ্গের গৌতম, কাত্যায়ন, ভরদ্বাজ, জাতূকর্ণ প্রভৃতি গোত্রীয়গণও প্রাচীন ও অতি সম্ভ্রান্ত। . . . রাঢ়ী বারেন্দ্রাদি পশ্চাদাগতদের মধ্যে সাটিয়াজুরীর শাণ্ডিল্য, আগনার চৌধুরী, দিনারপুরের বাগ্‌চি, স্বর্ণরেখার মৈত্র প্রভৃতি বংশীয়ের নাম উদাহরণস্থলে' বলা যেতে পারে।

ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে চক্রবর্তী বংশের বাস, এঁরা ফুলিয়া মেলের রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ---- এঁদের বীজীপুরুষের নাম নীলকণ্ঠ অগ্নিহোত্রী। ঢাকাদক্ষিণের পালপাড়া গ্রামে ভরদ্বাজ গোত্রীয় এক বংশ ব্রাহ্মণ আছেন, এঁদের উপাধি লস্কর। সাবর্ণ গোত্রীয় প্রাচীন এক ব্রাহ্মণ বংশ ঢাকাদক্ষিণের ব্রহ্মপুর গ্রামে অবস্থিতি করতেন। চাপঘাটের দেশমুখ্যদের আদি নিবাস ছিল মহারাষ্ট্রে। গার্গ্য গোত্রীয় এই দেশমুখ্যদের পূর্বপুরুষ সদাশিব মহারাষ্ট্রের মাউলী গ্রামে বাস করতেন। শিবাজীর পুত্র সাহু তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে জায়গীর কেড়ে নিলে তিনি বঙ্গদেশে কাঁঠালপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বংশধরেরা পরে ত্রিপুরা হয়ে চাপঘাটে আসেন।

সাধারণভাবে ব্রাহ্মণদের বৃত্তি ছিল গুরুতা, যাজকতা, মিরাশদারী ও সাধারণ বিষয়কর্ম। পূজক শ্রেণী ও অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরা সচরাচর ঠাকুর আখ্যায় অভিহিত হন। গ্রহবিপ্রদের আখ্যা 'আচার্য'। চৌধুরী, পুরকায়স্থ, কানুনগো, শিকদার প্রভৃতি উপাধি কুলক্রমানুযায়ী হলেও এগুলি রাজদত্ত উপাধি। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা রাজপণ্ডিত সনদ পেতেন, সমাজে তাঁরা বিশেষ সম্মানিত হতেন। রাজপণ্ডিতেরা স্বীয় অধিকৃত পরগণা প্রভৃতির অধিবাসী জনগণের ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবস্থা দান করতেন ও বিশিষ্ট বিদায় পেতেন।

শ্রীহট্টে বঙ্গদেশের মতো রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ নেই।

বৈদ্য---- বঙ্গীয় বৈদ্য জাতি রাঢ়ী, পঞ্চকোটী, বঙ্গজ এই তিন সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রীহট্টে এরকম বিভাগ দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীহট্টে বৈদ্য ও কায়স্থে কোনো প্রভেদ নেই---- 'কেবল গোত্র ও পদ্ধতিতে বৈদ্য ও কায়স্থ বনিয়াদ চেনা যায়'। 'দক্ষিণ শ্রীহট্টে ত্রিপুর গুপ্ত ও আন্ধা প্রভৃতিতে কায়ুগুপ্ত পাওয়া যায়, কিন্তু দুলালী প্রভৃতি স্থানের বৈদ্য থেকে তাঁরা বিশেষ ভিন্ন নন'।

চৌয়ালিশের আদাপাশার সেনেরা উচ্চ বংশোদ্ভূত। শিবানন্দ সেন ছিলেন মহাপ্রভুর বিশ্বস্ত সহচর---- 'শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান' (চৈতন্য চরিতামৃত)। শিবানন্দের এক বংশধর রামচন্দ্র আত্মীয়বিরোধের ফলে বঙ্গদেশ ত্যাগ করে শ্রীহট্ট চলে আসেন ও চৌয়ালিশ পরগণায় বিবাহ করে এখানকার অধিবাসী হয়ে পড়েন। এঁদের বংশগত বৃত্তি ছিল চিকিৎসা।

কায়স্থ— শ্রীহট্টের কায়স্থ সমাজ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত— উত্তম, মধ্যম ও পঞ্চসমারি।

উত্তমের মধ্যে 'দেব, দত্ত, দাস, নন্দী। চারি ঘরে কুল বন্দী'।

মধ্যমে— 'কর, ধর, চন্দ, পাল। নাগ, পালিত মাঝা চাল,

কীর্তি, হ্যতি, দাম, লোধ, গণ, পত্য, শূর, সিংহ, আদিত্য, অর্জুন, হোম, সোম, ভদ্র, বক্ষিত, বর্ধন, এন্দ প্রভৃতি পঞ্চসমারির অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গীয় খ্যাতি বিশিষ্ট বংশের মধ্যে দু চার ঘর মিত্র, ভাড়াউড়ার ওম, বিভিন্নস্থানের ঘোষ প্রভৃতি উল্লেখ্য। সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পন্ন কয়েকঘর কায়স্থ আছেন— যেমন লাভুর 'স্বামী' বংশ।

পশ্চিমবঙ্গের মতো ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত এই পাঁচ কুলীন কায়স্থের অনুরূপ কৌলীন্য প্রথা শ্রীহট্টে দেখা যায় না।

বৈশ্য, সাহা— শ্রীহট্টে সাহা সম্প্রদায়ের সংখ্যা অল্প নয়। মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের মতে সংস্কৃত সাধু শব্দ থেকে সাহু শব্দের উৎপত্তি। এই সাহুরাই সাহাদের সমাজ গঠন করেন। শ্রীহট্টে সাহু বণিক জাতির মধ্যে 'শ্রীহট্ট' 'দক্ষিণভাগ' ও 'উজান' এই তিনটি সমাজ প্রধান। রাজা সুবিদনারায়ণ কর্তৃক সমাজচ্যুত ব্যক্তিরা সাহা সমাজে স্থান পান।

দাস— দাস জাতিকে পণ্ডিতমণ্ডলী মাহিষ্য বলে প্রমাণিত করেছেন কিন্তু ভিন্নস্থানবাসী মাহিষ্যদের সঙ্গে শ্রীহট্টেব দাস জাতির সম্বন্ধ নেই। শ্রীহট্টের দাস জাতি পূর্বে যুদ্ধজীবী ছিলেন। শ্রীহট্ট জেলায় এদের মধ্যে চৌধুরী, পুরকায়স্থ, তালুকদার, বিশ্বাস প্রভৃতি উপাধি ছাড়া সেনাপতি, হাজারা, লস্কর, তরফদার প্রভৃতি সামরিক উপাধি অনেকের আছে।

নবশাক— গোপস্তিলীচ মালীচ তন্ত্রীমোদক বারুজী
কুলালঃ কর্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ।

শ্রীহট্টে নবশায়কদের মধ্যে রয়েছেন— কামার, কুমার, গোয়ালা, তাঁতি, তেলী, নাপিত, বারুজী, ময়রা ও মালী।

এছাড়া শূদ্র সম্প্রদায়ে গণনীয়— কাহার, রাঢ় (কুশিয়ারী), কেওয়ালী (কপালী), কৈবর্ত, গণক, গন্ডপাল (গাড়ওয়াল), চামার, চূণার, বাদ্যকর, ধোপা, ডোম ও পাটনি, নমঃশূদ্র, ভূঁইমালী, মাহারা, মালো, যুগী, লোহাইত কুরী, শাঁখারি, শুঁড়ী, সোনার প্রভৃতি।

মুসলমানদের মধ্যে প্রধান শ্রেণী চারটি— কুরেশী, সৈয়দ, শেখ ও মাহিমাল। এছাড়া আছে জোলা, মীর শিকারী, গাইন ও বেজ। সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীহট্টের মজুমদার বংশ, পৃথিমপাশার জমিদার বংশ, লক্ষ্মণশ্রীর দেওয়ান বংশ ও শ্রীহট্টের মুফতিগণ।

পার্বত্য জাতীয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে শ্রীহট্টে বাস করছে খাসিয়া, গারো, কুকি, ত্রিপুরা, মণিপুরী প্রভৃতি।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে কিছু পোর্টুগীজ বসতি স্থাপন করে বুন্দাশিলে।

পাশ্চাত্ত্য বৈদিকদের আগমনের ফলে শ্রীহট্টের হিন্দু সমাজে মৈথিল আচার ও ব্যবহার প্রচলিত। রঘুনন্দনের গ্রন্থের পরিবর্তে মিথিলাবাসী মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি ও স্মার্তচূড়ামণি বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থাবলী এখানকার চতুষ্পাঠীতে অধীত হয়।

ধর্ম

বিষ্ণু

শ্রীহট্ট থেকে ইতিহাসের প্রাচীনতম যে নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় এদেশে বিষ্ণুমূর্তির উপাসনা বহুকাল ধরে প্রচলিত ছিল। ভাটেরার তাম্রশাসনে কেশবদেব সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'তিনি কংস নিসূদনকে এক আকাশস্পর্শী মেঘবিদারি উচ্চচূড় প্রস্তর মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।' তাঁর পুত্র ঈশান দেবও 'মধুকৈটভারির জন্য অভ্রভেদি যে এক মন্দির নির্মাণ করেছেন তার ধ্বজা কোনো বায়বীয় বৃক্ষের কুসুমের ন্যায় বোধ হয়।'

বর্তমান কালেও শ্রীহট্টে দুটি মন্দিরে বাসুদেব মূর্তি পূজিত হয়। পঞ্চখণ্ডের মূর্তিটি সুপাতলা গ্রামে জয়ন্তীয়া রাজের কর্মচারী দুর্গাদলইয়ের বাড়ির পুরানো পুকুর কাটার সময় পাওয়া যায়। মূর্তিটি কালো পাথরে খোদিত— দুপাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, একখণ্ড পাথরে তিনটি মূর্তি উৎকীর্ণ। জগন্নাথপুরের বাসুদেব মূর্তিও ঠিক একপ্রকার।

সাম্প্রতিক কালে শ্রীহট্ট সহরে গোয়ালিছড়ার ফরহাদ খাঁর পুলের কাছে আর একটি পুরানো বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে।

শৈব

শৈব মতও শ্রীহট্টে প্রাচীন কালাবধি বিদ্যমান ছিল। এক সময় শ্রীহট্টে যে শিবোপাসনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। কেশবদেব যে শৈব ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভাটেরার তাম্রশাসনে বলা হয়েছে কেশবদেবের ভক্তিতে 'অনাদি লিঙ্গরূপী ত্রিলোকনাথ ভগবান বটেশ্বর কৈলাস পরিত্যাগ করে হট্টপাঠকে বাস করছেন।' আরো বলা হয়েছে, 'তিনি শিবানুরক্ত এবং শ্রীহট্টনাথ শিবকে বহুতর কৃতদাস এবং নানা জাতীয় ভৃত্য দিয়েছেন।' এই শিব সম্ভবতঃ হাটকেশ্বর শিব যিনি রাজা গৌড় গোবিন্দ কর্তৃক পূজিত হতেন। শাহজলালের আক্রমণের সময় হাটকেশ্বর শিবকে জয়ন্তীয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে চূড়খাই-এর কাছে সেন গ্রাম নিবাসী আগমবাগীশ উপাধিধারী জনৈক ব্যক্তি হাটকেশ্বর শিবকে জয়ন্তীয়া থেকে স্বগ্রামে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এটা আশ্চর্যজনক যে, শ্রীহট্ট জেলার প্রধান তীর্থগুলির অধিকাংশই শৈবতীর্থ, যথা— ঢাকাদক্ষিণে গোপেশ্বর শিব, বালিশিরা পরগণায় নির্মাই শিব, শ্রীগৌরী মৌজায় সিদ্ধেশ্বর শিব, তুঙ্গেশ্বর গ্রামে তুঙ্গনাথ মহাদেব, আদম আইল পাহাড়ে মাধবপ্রপাতের কাছে শিবলিঙ্গ তীর্থ, জয়ন্তীয়ায় রূপনাথ শিব ইত্যাদি। কৈলাসহরের ঊনকোটি প্রকৃতপক্ষে শৈবতীর্থ। নির্মাই শিব দেখে অনুমান করা যায় ত্রিপুরায়ও শৈবধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। জয়ন্তীয়ার ভুবনতীর্থও আরেকটি শৈবতীর্থ। সুদূর আসাম থেকে কাছাড় জয়ন্তীয়া শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত শৈবধর্মের অজস্র নিদর্শন বিস্ময় উদ্রেক করে।

শাক্ত ঃ

শাক্ত পীঠ রূপে শ্রীহট্টের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। শ্রীহট্ট জেলায় দুইটি প্রসিদ্ধ পীঠ— একটি গোটাটিকরের গ্রীবাপীঠ, অন্যটি বামজঙ্ঘা মহাপীঠ বা ফালজোরের কালীবাড়ি। একসময় শ্রীহট্ট শক্তি সাধনার বড় কেন্দ্র ছিল তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। জয়ন্তীয়ায় শাক্তসাধনাব প্রবল প্রভাব তো ছিলই (ফালজোরের দেবীর নামই জয়ন্তী) পার্শ্ববর্তী রাজ্য কাছাড়েও শাক্ত প্রভাবের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। ভুবনতীর্থে ভুবনেশ্বরী মূর্তি ছাড়াও থালিগ্রামে এক শ্যামা মন্দির ছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে। কাছাড়ের রাজাদের উপাস্যা দেবী ছিলেন রণচণ্ডী ; এছাড়া উধারবন্দে ছিল দেবী 'কাঁচা-খাউরীর' মন্দির। কাছাড়ীদের দ্বারা পূজিতা আবও তিন দেবী ছিলেন 'রণবাউলী', 'আম্বেরী' ও 'চান্দাই'। এই সকল দেবীকে শাক্ত স্বভাবা দেবী বলা যায়। এঁদের প্রভাব শ্রীহট্টেও ছিল ; এখানেও রণচণ্ডীর মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেছে হাড়িয়াবাঐ গ্রামে। শঙ্খচক্র অসি ত্রিশূলধাবিণী সিংহবাহিনী এই ত্রিনয়না ধাতুনির্মিত দেবীমূর্তি প্রায় তিনপোয়া হাত উঁচু। প্রবাদ এই যে, ইনি রাজা সুবিদনারায়ণের পূজিতা ছিলেন।

শ্রীহট্টে শাক্ত দেবীদের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শ্রীহট্ট সহর ছাড়া গ্রামেও মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির ছিল, মঙ্গলচণ্ডী গ্রামের নামে তার ইঙ্গিত রয়েছে।

বেগমপুর গ্রামের চৌধুরীবংশকে আশ্রয় করে শাক্তসাধনার বড় একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। শ্রীহট্টে শাক্তসাধনা বহুপ্রাচীন ; চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ মধুকর মিশ্রের স্ত্রীব নাম ছিল চণ্ডী, একথা স্মরণযোগ্য।

শ্রীহট্ট জেলায় মনসাপূজার প্রচলন ঘরে ঘরে এবং অন্যূন বাইশজন মনসামঙ্গল রচয়িতা এদেশে আবির্ভূত হয়েছেন। মনসাপূজার অন্যতম রূপভেদ নৌকাপূজা। সুঘরের মজুমদার বংশে রমাবল্লভের মনসামূর্তি প্রসিদ্ধ।

বৈষ্ণব ঃ

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেও শ্রীহট্টে বৈষ্ণব ধর্মের ধারা প্রবাহিত ছিল। অদ্বৈত আচার্যেব জীবন তার প্রমাণ। অদ্বৈতের গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর সতীর্থ ছিলেন বিজয় পুরী। ইনি শ্রীহট্টবাসী। এঁরা এদেশে ভক্তিবাদের স্রোত সঞ্চালিত করেন। চৈতন্যদেবের বংশেও পূর্বাবধি বৈষ্ণবভাব বিদ্যমান ছিল তা বোঝা যায় তাঁর পিতা ও পিতৃস্থানীয়দের নাম দেখে। উপেন্দ্র মিশ্রের সাত পুত্রের নাম— কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ। প্রতিটি নামই বৈষ্ণব

ভাবদ্যোতক। চৈতন্যদেবের কালে শুধু শ্রীহট্ট নয় আসামেও বৈষ্ণবধর্ম দৃঢ়মূল হতে থাকে— হাজোর মাধবমন্দির ও শঙ্করদেবের প্রভাব এর নিদর্শন (শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের সঙ্গে শঙ্করদেবের সাক্ষাৎ হয়েছিল)। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণবভাবপ্লাবন শ্রীহট্টের সীমা অতিক্রম করে জয়ন্তীয়া, কাছাড় ও ত্রিপুরাতেও বিস্তৃত হয়। একদিকে ময়মনসিংহের হাজঙ্গ জাতি অপরদিকে সুদূর পূর্বপ্রান্তে মণিপুরবাসী— বিশাল এক অঞ্চল বৈষ্ণবপ্রভাবাধীনে আসে।

জগন্মোহনীঃ

জগন্মোহনী সম্প্রদায় বৈষ্ণব গোষ্ঠীভুক্ত হলেও তাঁদেব তুলসী ও গোময়ের প্রতি বীতস্পৃহা, 'পূর্ণব্রহ্ম' মন্ত্র ও নির্বাণসঙ্গীত থেকে অনেকে অনুমান করেন এঁরা প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী। জগন্মোহনী সম্প্রদায় শ্রীহট্টের ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটু বিশিষ্টতার অধিকারী।

কিশোরীভজনঃ

যদিও কিশোবীভজন হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণের কাছে ঘৃণিত তবু এই সম্প্রদায়টির কথা উল্লেখ করা কর্তব্য, কারণ এরা আসলে সুপ্রাচীন সহজিয়া মতেরই একটি বিকৃত রূপের অনুগামী। গোরাচাঁদ অধিকারী এই সহজ সাধনায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যেও কিশোরীভজনের অনুকরণস্পৃহা দেখা দিয়েছিল। করণশীর অন্তর্গত মতির গ্রামে রমজান মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি এই জাতীয় এক সাধকমণ্ডলী গড়ে তুলছিল। রমজান মণ্ডল নিরক্ষর হলেও সে একটি ধর্মমণ্ডলীর নেতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ কবে। শ্রীহট্টের মুসলমান সমাজে 'সিলেটী নাগরী' নামে গ্রন্থাদি প্রচলিত ; তারও অনেক গানে এজাতীয় সহজিয়া মতের ইশারা মেলে।

বাউলঃ

শ্রীহট্টে বাউলদের ছোটখাট দল থাকলেও এদের কোনো ব্যাপক প্রভাব নেই।

বৌদ্ধঃ

শ্রীহট্টে কোনো বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন দেখা যায় না ; কিন্তু পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরার দক্ষিণাংশ একদা বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করেছিল, পিলাক-এর পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি তার প্রমাণ। জগদানন্দ বিরচিত "বৈদিক পুরাবৃত্ত" গ্রন্থে বলা হয়েছে মিথিলাধিপতির যজ্ঞে নিমন্ত্রিত ত্রিপুরাধিপতি "পণ্ডিতদের সাধুমত শুনে বৌদ্ধমত পরিত্যাগপূর্বক তাঁদের কাছ থেকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন"

শ্রুত্বা সাধুমতং রাজা ত্রিপুরাধিপতিঃ পুবা
বিহায় বৌদ্ধধর্মঞ্চ ধর্মং জগ্রাহ পণ্ডিতাৎ ॥

("কাছাড়ের ইতিবৃত্তে" উদ্ধৃত)

ব্রাহ্মণেরা এঁকে আখ্যা দেন আদি ধর্মপা এবং ইনিই পাঁচজন বৈদিক ব্রাহ্মণকে যজ্ঞ উপলক্ষে মিথিলা থেকে আনয়ন করেন। একদা ত্রিপুরায় বৌদ্ধপ্রভাব সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত এ আখ্যানে রয়েছে।

তীর্থঃ

শ্রীহট্টের তীর্থস্থানগুলির মধ্যে গ্রীবাপীঠ, বামজঙঘা মহাপীঠ, রূপনাথ, ঢাকাদক্ষিণ ঠাকুরবাড়ি, গোপেশ্বব শিব, পণাতীর্থ, অদ্বৈতের আখড়া, নির্মাই শিব, ঊনকোটি, সিদ্ধেশ্বর শিব, হাটকেশ্বর শিব, তুঙ্গেশ্বর মহাদেব, মাধবতীর্থ ও শিবলিঙ্গতীর্থ, পঞ্চখণ্ডের বাসুদেব মন্দির, জগন্নাথপুরের বাসুদেব মন্দির, বিথঙ্গলের আখড়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

শাহজলালের দরগা মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ ধর্মস্থান।

সাধক

মধ্যযুগে শ্রীহট্টে বহু সাধক, সিদ্ধপুরুষ ও ধর্মনেতার আবির্ভাব হয়। এঁদের মধ্যে সর্বভারতে খ্যাতি বিস্তারিত হয়েছে চৈতন্যদেবের। চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে শ্রীহট্টে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন প্রবল গতি অর্জন করে। অদ্বৈতাচার্যের প্রভাবে শ্রীহট্টে পূর্ব থেকেই বৈষ্ণব ভাবধারা অঙ্কুরিত হচ্ছিল— চৈতন্যদেব একে পূর্ণতা দেন। অদ্বৈতের পার্ষদবংশীয় হুসিয়ারপুরবাসী নিত্যানন্দ, রসতত্ত্ববিলাস রচয়িতা রামানন্দ, কাছাড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক জ্ঞানবর ও দুর্গাবর, মণিপুরে বৈষ্ণবভাবপ্রচারক রামনারায়ণ শিরোমণি, ময়মনসিংহের সুসঙ্গ দুর্গাপুরে হাজঙ্গ জাতির মধ্যে বৈষ্ণব আন্দোলন সৃষ্টিকারী রামদাস ও মাধব দাস, উনিশ শতকে বৃন্দাবনে বৈষ্ণব সাধনায় খ্যাতিমান শরচ্চন্দ্র তপস্বী— এঁরা মহাপ্রভু ও অদ্বৈত প্রভুর সার্থক অনুবর্তী।

আরো কজন বৈষ্ণব ধর্মগুরুর কথা বলা দরকার যাঁদের প্রভাব শ্রীহট্ট জেলায় খুব গভীর। মধ্যযুগে শ্রীহট্টে চারটি বৈষ্ণব বংশ খ্যাতি অর্জন করে— এরা হলো ঠাকুর বাণী, ঠাকুর জীবন, বৈষ্ণব রায় ও বঞ্চিত ঘোষের বংশ। ঠাকুর বাণী দিনারপুর-শতকে আবির্ভূত হন। তাঁর বংশধরেবা দিনারপুর ও ভুজবল দুই জায়গায় রয়েছেন। দিনারপুর শাখায় দোলগোবিন্দ সাধকরূপ প্রসিদ্ধ হন। নারায়ণ মহান্ত নামে অদ্বৈতের শিষ্যবংশীয় এক রাঢ়ী ব্রাহ্মণ শ্রীহট্টে বিবাহ করে বসবাস করেন— এঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বৈষ্ণব রায়। বৈষ্ণব রায়ের বংশধরেরা বিষ্ণুপুর ও কুরুয়ার অধিবাসী। সতরসতী পরগণার চাঁদপুর গ্রামবাসী জীবন ঠাকুর সামান্য দাস বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 'বঞ্চিত ঘোষ' নামধারী গঙ্গারাম ঘোষ ছিলেন চৈতন্যপার্ষদ বাসু ঘোষের বংশে জাত। বৃন্দাবনে জীবগোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

আরো দুজন বৈষ্ণব নেতা ছিলেন কৃষ্ণানন্দ ভাগবতাচার্য ও ঠাকুর পরশ।

বেগমপুরবাসী সদাশিবের বংশ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে, এই বংশে একজন সাধক থাকবেনই। রামকান্ত গোসাই, শ্যামাচরণ চৌধুরী, চন্দ্রকান্ত ব্রহ্মচারী, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী সদাশিবের বংশধর। শরচ্চন্দ্র চৌধুরী আধুনিককালের শক্তিসাধকদের অগ্রণী ছিলেন। মধ্যযুগে চন্দন শর্মা কামাখ্যাপীঠে শক্তিসাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য— এঁরা দুজনও শক্তিসাধক ছিলেন। শঙ্করসেনাবাসী কাশীনাথ শর্মার জন্ম ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি নির্মাই শিব মন্দিরে শব সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। বাণিয়াচঙ্গের গৌতম গোত্রীয় শ্রীরাম বিশারদের পরিবারে অনেক তান্ত্রিক সাধক জন্ম নেন।

ষোড়শ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে শ্রীহট্টে যে সকল সিদ্ধপুরুষের জন্ম হয়। তাঁদের সবার নামোল্লেখ করা সম্ভব নয়— তবে কজনের উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। এঁরা ছিলেন— জন্তরিবাসী সিদ্ধ কমলাকান্ত, সতরসতী পরগণার পাগলশঙ্কর, শ্রীহট্ট সহরবাসী কাঁচা ঠাকুর, ইটা পরগণার বুড়িকোণা গ্রামবাসী নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ কুলে জাত কেশব (অজ্ঞান ঠাকুর), জন্তরির কেশবলাল গোস্বামী, ইটা পরগণার ক্ষেমসহস্র গ্রামবাসী— দুর্গাপ্রসাদ কর বা দুর্গা সাধু (ইনি আধুনিক কালবর্তী— জন্ম ১৮৫১), আলমপুরবাসী দুর্লভ ঠাকুর, আগিয়ারাম পরগণার চক্রবাণীবাসী হুলাস পাটুনীর পুত্র অর্জুন বা লেংটাবাবা (ইনিও আধুনিক কালের), করিমগঞ্জের সাহাপুর-গ্রামবাসী নাথকুলে জাত শীতল গিরি, বানিয়াচঙ্গের বিশ্বাসবংশীয় সিদ্ধেশ্বর, দিনারপুরের হরি ঠাকুর— এঁদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে অলৌকিক কাহিনীর যোগ আছে।

কোনো কোনো মহাপুরুষ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে সমভাবে খ্যাত ছিলেন, যেমন— ঠাকুর ফকির, রাখাল শাহ (ধোপা বংশীয় ছিলেন)।

ভৌলাশাহ, মুনিবউদ্দীন (দৈখোরা), শাহ পাতা, পেড়া শাহ— এই মুসলমান পীর সাধকেরা হিন্দু সমাজেও পরম ভক্তির পাত্র ছিলেন।

ছোট লিখার আদিত্য বংশীয়েরা ফকির আকবরের কৃপালাভ করেন। ফকির আকবরের মোকাম হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ভক্তিভাজন।

এই প্রসঙ্গে দুয়েকজন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন জ্যোতিষীর কথাও বলতে হয়। কৌড়িয়া পরগণার দিঘলী গ্রাম নিবাসী কমলাকান্ত ভট্টাচার্য জ্যোতির্বিদ্যার দ্বারা মুর্শিদাবাদের নবাবকে মুগ্ধ করে প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করেন। আধুনিক কালে দস্তিদার বংশীয় দয়ালকৃষ্ণ দস্তিদারও অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন জ্যোতিষীরূপে পরিগণিত হতেন।

বিদেশে শ্রীহট্টবাসী

শ্রীহট্ট বঙ্গদেশেব প্রত্যন্ত অঞ্চল ও দুর্গম হলেও বহির্বঙ্গের সঙ্গে শ্রীহট্টের যোগ বহুকালের। তীর্থযাত্রা উপলক্ষে শ্রীহট্টবাসী শুধু উত্তর ভারত নয় দক্ষিণভারতেও যেতেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈতাচার্য, বঞ্চিত ঘোষ, রামকৃষ্ণ গোসাঞি— এঁরা প্রায় সারা ভারতের তীর্থ দর্শন করেন। মহাপ্রভুর শ্রীহট্ট আগমনের বর্ণনা দিয়ে 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে তিনি 'বিক্রমপুরের নূরপুর থেকে সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হন, সেখান থেকে উত্তর পূর্বাভিমুখ হয়ে ব্রহ্মপুত্র তীরে লাঙ্গলবন্দ পৌঁছান ও ব্রহ্মপুত্রে স্নানান্তে এগারসিন্দুর আগমন করেন, পরে এগারসিন্দুর থেকে তৎপূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ বেতাল গ্রামে গমন করেন; এর অল্পদূরে ঢোলদিয়া, ভিটাদিয়া প্রভৃতি প্রাচীন পল্লী। মহাপ্রভু ভিটাদিয়াতে লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর গৃহে অতিথিরূপে উপনীত হন ... তারপর তিনি শ্রীহট্টে শুভাগমন করেন'। (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশের উপসংহার দ্রষ্টব্য)। সম্ভবতঃ ময়মনসিংহের ভিতর দিয়ে যাতায়াতের এই পথটিই ছিল পশ্চিমবঙ্গে যাবার সর্বজনপরিচিত পথ।

শ্রীহট্টের বাইরে শ্রীহট্টবাসীর প্রধান আশ্রয় ছিল নবদ্বীপ ও শান্তিপুর। নবদ্বীপের মায়াপুর পল্লী ছিল প্রধানতঃ শ্রীহট্টবাসী অধ্যুষিত। নবদ্বীপে অনেকেই টোল খুলেছিলেন যেমন মহেশ্বর

ন্যায়ালঙ্কার, কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, রত্নগর্ভ ভাগবতাচার্য। এরপর নাম করতে হয় কাশীর। শ্রীহট্টের বহু পণ্ডিত কাশীতে গিয়ে খ্যাতিলাভ করেন, যেমন গঙ্গারাম শিরোমণি, রামকিঙ্কর বিদ্যারত্ন, মথুরানাথ বিদ্যাভূষণ, তিনভাই— কাশীরাম বিদ্যালঙ্কার, রূপরাম সার্বভৌম ও রাধাকান্ত শিরোমণি, রঘুনাথ ভট্টাচার্য।

অন্যান্য স্থানে পাণ্ডিত্যের জন্য স্বীকৃতিলাভ করেন— কোচবিহারে গৌরীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার ও গোপীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (দুই ভাই), পুঠিয়ায় গঙ্গারাম শিরোমণি, রামগোপাল ন্যায়পঞ্চানন, কাছাড় রাজসভায় রতিকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, জয়ন্তীয়ার রাজসভায় হরিশঙ্কর ভট্টাচার্য, ত্রিপুরার রাজসভায় বনমালী সিদ্ধান্ত ও হরিশ্চন্দ্র পণ্ডিত, নাটোরে রূপরাম সার্বভৌম।

কোনো কোনো ছাত্র শ্রীহট্ট থেকে মিথিলায়ও যেতেন, যেমন হরিনাথ ন্যায়বাগীশ, মথুরানাথ বিদ্যাভূষণ।

এসব স্থানের মধ্যে কাশীতে শ্রীহট্টবাসীর প্রতিপত্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয় — কৃষ্ণহরি বিশারদ ও তাঁর ছেলে গঙ্গাহরি বিদ্যারত্ন এবং এঁদের সমসাময়িক গৌরহরি চক্রবর্তী কাশীর বাঙ্গালী সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। গৌরহরি চক্রবর্তী ছিলেন কাশীর প্রবল প্রতিপত্তিশালী উকিল।

মুসলমান শাসনকালে দিল্লীতে বিশেষভাবে খ্যাত্যাপন্ন হন— জাতূকর্ণ গোত্রীয় মুরারি বিশারদ, বাণিয়াচঙ্গের অধিপতি গোবিন্দখাঁকে দিল্লী বাসকালে ইনিই পরামর্শ দিয়ে প্রাণ বাঁচান। উনিশ শতকে আগ্রায় চিকিৎসাবৃত্তিতে খ্যাতিলাভ করেন ব্রজসুন্দর ভট্টাচার্য।

নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদে অনেক শ্রীহট্টবাসী প্রতিষ্ঠালাভ কবেছিলেন। মুর্শিদাবাদেব দেওয়ান ছিলেন ভরত রায়। মুর্শিদাবাদের দেওয়ানখানার সর্বোচ্চ পদে আরোহণ করেন জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি। এই দেওয়ানখানায় চাকরিতে ঢুকে পদোন্নতি লাভ করে ভাগলপুরের দেওয়ান হন শ্যামরায়। মুর্শিদাবাদের নবাবদের বিশেষ আস্থাভাজন জ্যোতিষী ছিলেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য।

মুর্শিদাবাদে ব্যবসায় কার্যে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিলেন জোড়ারায়, দুর্লভদাস ও হুকমত রায়।

আরো দুজন শ্রীহট্টীয় দেওয়ানের কথা বলা কর্তব্য— পঞ্চেশ্বরবাসী সম্পদসেন ছিলেন ঢাকা নবাবের দেওয়ান ও দিগলীর বিজয়রাম দাস ছিলেন চট্টগ্রামের দেওয়ান। বাসু ঘোষ বংশীয় শঙ্কর ঘোষের দুই পুত্র যাদব ও মাধব ফার্সিতে সুপণ্ডিত ছিলেন ও রাজস্ব সংগ্রহে ঢাকার নবাবেব সহকারী হন। ঢাকাদক্ষিণবাসী পরশুরাম দাস দিল্লীতে ফার্সি ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন— সেখানে তিনি 'ভাইয়াজি' নামে পরিচিত ছিলেন।

শিক্ষা

সাধারণভাবে শ্রীহট্টে শিক্ষার মান ছিল উন্নত। অধিকাংশ ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে টোল বা চতুষ্পাঠী ছিল। বিভিন্ন বিদ্যায় শ্রীহট্টের ছাত্রেরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে মাত্র ক'জনের পরিচয় দিচ্ছি—

গঙ্গারাম শিরোমণি (দ্রাবিড় দেশে ব্যাকরণ শিক্ষা করেন, কিছুদিন কাশীতে ছিলেন), হরিনাথ ন্যায়বাগীশ (ন্যায়), কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, রামকিঙ্কর বিদ্যারত্ন, মথুরানাথ বিদ্যাভূষণ, রামগোপাল ন্যায়পঞ্চানন ও তাঁর তিনপুত্র কাশীরাম— রূপরাম,— রাধাকান্ত, রামরাম ভট্টাচার্য, শ্যামানন্দ ভট্টাচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, চণ্ডীচরণ তর্কভূষণ, গোবিন্দ সার্বভৌম, বিষ্ণুদাস তর্কপঞ্চানন (ত্রিপুরার সভাপণ্ডিত), শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, শ্রীরাম বিশারদ, রমানাথ বিশারদ, শিবচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগদীশ তর্কালঙ্কারও শ্রীহট্টীয় বংশে জাত।

শ্রীহট্টের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পঞ্চখণ্ডের 'অনিপণ্ডিত' প্রসিদ্ধ স্থান— এখানে বহু বিদ্বানের জন্ম হয়। শ্রীহট্টের পণ্ডিতদের মধ্যে দুজনের নাম স্বতন্ত্রভাবে বলা প্রয়োজন।

ঢাকাদক্ষিণের বাণীনাথ বিদ্যাসাগর কাতন্ত্রের বিদ্যাসাগরী টীকা লেখেন। তাঁর বংশ 'সাগরের বংশ' নামে বিখ্যাত।

মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ছিলেন এই পণ্ডিত সমাজের মধ্যমণি। তিনি সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশের কাছে পাঠ সমাপন করে নবদ্বীপেই টোল খুলেছিলেন। তিনি কাব্যপ্রকাশের 'ভাবার্থ চিন্তামণি' নামক টীকা লিখে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন। 'স্মার্ত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্বের প্রতি কটাক্ষ করে তিনিও অষ্টাবিংশতি "প্রদীপ" প্রণয়ন করেন।' দেশপ্রদীপ গ্রন্থে তিনি তাঁর স্বদেশ পঞ্চখণ্ডের বর্ণনায় বলেছেন—

যত্র শ্রীবাসুদেবো জলধিতনয়া সারদা সর্বদাঽত্র।
যত্রাস্তে পঞ্চখণ্ডে সতত বুধসভা পালদত্তৌ ক্ষিতীশৌ॥
বাসস্থানং সুরম্যং ফলমিতি সুরসাং বেষ্টিতং ত্বিক্ষুনদ্যা
তদ্রাজ্যং স্বর্গতুল্যং ত্রিভুবনবিদিতং তত্র সন্তোব সন্তঃ॥

এই মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারই নবদ্বীপের পণ্ডিতসভায় সগর্বে বলেছিলেন

সর্বত্র ত্রিবিধা লোকাঃ উত্তমাধমমধ্যমাঃ
শ্রীহট্টে মধ্যমো নাস্তি চট্টলে নাস্তি চোত্তমাঃ॥

শ্রীহট্টবাসী পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থের মধ্যে রামরাম ভট্টাচার্য প্রণীত 'তন্ত্ররত্নমালা', মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত 'সিদ্ধান্ত প্রদীপ', 'কালপ্রদীপ', 'আহ্নিকপ্রদীপ' প্রভৃতি, রামগোপাল ন্যায়পঞ্চানন কৃত 'কাল নির্ণয়', 'সম্বন্ধ নির্ণয়' ইত্যাদি, বলভদ্র ভট্টাচার্য লিখিত 'শ্যামল বর্ম চরিত', গোবিন্দ চক্রবর্তী কৃত 'শুদ্ধি দীপিকার' টীকা, বীরেশ্বর দণ্ডীকৃত বীরেশ্বরী টীকা, প্রজাপতি কৃত চণ্ডীর টীকা, গৌরীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত 'জ্ঞানদীপ', গোবিন্দ সার্বভৌম প্রণীত 'সাবদোদয' নাটক।

সংস্কৃতের মতো ফার্সি সাহিত্য চর্চারও বড় কেন্দ্র ছিল শ্রীহট্ট। পৈলের বিখ্যাত সাধক পীর বাদশাহের বংশে অনেকেই ফার্সি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন— এঁরা অনেকে দিল্লীর সম্রাটকুমারদের শিক্ষকতা করেছেন বলে জনশ্রুতি আছে। এই বংশের সঙ্গে যুক্ত রেহানউদ্দীন মনোহর ফার্সি কবিতা লিখে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে 'বুলবুলে বাংলা' উপাধি পেয়েছিলেন। তরফবাসী 'মুল্‌ক-উল-উলামা' সৈয়দশাহ ইস্রাইল ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফার্সিভাষায় 'মদানেল ফওয়ায়েদ' নামে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তরফের সৈয়দ মুসা আরাকানপতির বন্ধু ছিলেন। তাঁর অনুরোধে কবি আলাওল 'সফিউল মুলুক বদিউজ্জমাল' বইটি লিখেছিলেন।

সাহিত্য

মধ্যযুগে শ্রীহট্টের কবিদের দ্বারা সৃষ্ট গ্রন্থের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছে—

মুরারি গুপ্ত, যদুনাথ কবিচন্দ্র, শঙ্কর ঘোষ, 'বঞ্চিত' লিখিত বৈষ্ণব পদাবলী ;

গোপীনাথ দত্ত রচিত মহাভারতের 'দ্রোণপর্ব', 'নারীপর্ব' ;

হরগোবিন্দ আদিত্য ও শ্রীচন্দ্র রায় প্রণীত মালসী ও দুর্গাবিষয়ক গান ;

নারায়ণ দেব, ষষ্ঠীবর, রাধানাথ দত্ত, বিনোদ রায়, আনন্দরাম চক্রবর্তী প্রণীত পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্য ;

রাধাচরণ দাস লিখিত জীবনী কাব্য 'বঞ্চিত চরিত' ;

মনোহর সেন রচিত কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য 'কৃষ্ণবিজয়' ও রাধানাথ দত্ত লিখিত 'কৃষ্ণলীলা' ;

রামানন্দ প্রণীত— 'রসতত্ত্ববিলাস',

রাধানাথ দত্ত কৃত 'সূর্যব্রত পাঁচালী', 'রাধানাথসঙ্গীত'

শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর বিরচিত বাংলা 'রাজমালা', ইত্যাদি।

মহাভারত অনুবাদক কবি সঞ্জয়ও সম্ভবতঃ শ্রীহট্টবাসী।

রঘুনাথ রচিত 'বাবাম্বর' নামে একটি কৌতূহলোদ্দীপক পাঁচালী ওড়িয়া লিপিতে লিখিত রূপে ওড়িশায় পাওয়া গেছে।

পূর্বোক্ত কবিদের মধ্যে মুরারি গুপ্ত, যদুনাথ কবিচন্দ্র, শঙ্কর ঘোষ, নারায়ণ দেব, ষষ্ঠীবর প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে স্বনামধন্য।

শ্রীহট্টের পার্শ্ববর্তী রাজ্য জয়ন্তীয়া ও কাছাড়েও বাংলা সাহিত্যের চর্চা ছিল। জয়ন্তীয়াবাসী বাঙালীকবি বিরচিত কাব্য— রত্নাবলী ও অদ্ভুতভারত। জয়ন্তীযাবাসী সঙ্গীত বচয়িতা ছিলেন শিব ওঝা, রামরায় মজুমদার, মোহন রাম ধর ও রাজা রাজেন্দ্র সিংহ।

কাছাড়ে রচিত বাংলা গ্রন্থের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ভুবনেশ্বব বাচস্পতি প্রণীত 'শ্রীনাবদীয় কথামৃত' (১৭৩০ খ্রী.)।

স্ত্রীজাতির স্থান

মধ্যযুগের সমাজে স্ত্রী জাতির স্থান ছিল সংকীর্ণ। অন্তঃপুরে তাঁদের জীবন কিভাবে কাটতো তাব কোনো বিশদ বিবরণ অপ্রাপ্য। তবু কয়েকজন অসাধারণ মহিলার সন্ধান পাওয়া যায়।

নয়াগ্রামে বাণেশ্বর ভট্টাচার্যের সহধর্মিণী অপূর্ণা দেবী জ্যোতিষশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য 'দ্বিতীয় খনা' বলে অভিহিত হতেন। ইটার নন্দীউটা গ্রামেব কৃষ্ণদাস চূড়ামণির পরিবাব একটি প্রাচীন

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ পরিবার। এই বংশের রামভদ্র অল্পবয়সে পাণ্ডিত্যের জন্য দেওয়ান শ্যামরায়ের কাছ থেকে ভূমি পেয়েছিলেন। রামভদ্রের স্ত্রী সর্বাণী দেবী ছিলেন সুশিক্ষিতা 'একদিন তিনি শিষ্য যাদব রাম অর্জুনকে একটি কবিতা পাঠান,

জিতধূম প্রসেকায় জিত ব্যজন বায়বে।
মশকায় ময়াকায় সায়মারভ্য দীয়তে॥

এই শ্লোক পেয়ে শিষ্য পরদিন একটি মশারি এনে সর্বাণীদেবীকে দেন।'

সুঘরের মজুমদার বংশের গঙ্গাগোবিন্দ শিষ্ট ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। রামশ্রীবাসী খোন্দকার নামক এক ব্যক্তি তাঁর জমি দখল করতে চাইলে গঙ্গাগোবিন্দ প্রতিকারেব জন্য মুর্শিদাবাদে যান। গঙ্গাগোবিন্দেব পত্নী বামপ্রিয়া ছিলেন দৃঢ়চেতা। 'গঙ্গাগোবিন্দের অনুপস্থিতিকালে খোন্দকার তাঁর বাসস্থান ও সন্নিহিত স্থান আত্মসাৎ করতে উদ্যত হন। তখন এই তেজস্বিনী বুদ্ধিমতী রমণীর বুদ্ধির কাছে খোন্দকারের কূটকৌশল ও জনবল বিফল হয়।'

হবিগঞ্জের বামৈর ব্রাহ্মণ চৌধুরী বংশের ভবানী দেব্যা বাল্যবিধবা ছিলেন, কাশীধামে গিয়ে যোগসিদ্ধা হন। 'ঐ সময়ে বারাণসীতে গিয়ে লোকে যেমন মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দেখত তেমনি এই যোগিনীকেও দেখে বিস্মিত হত।'

এই বকম প্রতিভাসম্পন্ন মহিলাদের সামান্য পরিচয়ই পাওয়া গেছে, কিন্তু হিন্দু সমাজে স্ত্রীজাতিব আসন উচ্চে ছিল তা বোধগম্য হয়।

সতীদাহ

মধ্যযুগের সতীদাহ প্রথা শ্রীহট্টেও বেশ প্রচলিত ছিল। এগারসতী, সতরসতী প্রভৃতি পরগণার নাম দেখে তা কিছুটা আন্দাজ করা চলে। শত শত সতীদাহের মধ্যে মাত্র এই কয়টি সতীর বিবরণ পাওয়া যায়—

গোবিন্দবাটী গ্রামের হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্যের পত্নী অহল্যা দেবী, চৌয়ালিশের শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কারের স্ত্রী, পূর্বোক্ত রামভদ্রের বিদুষী স্ত্রী সর্বাণী দেবী, বানিয়াচঙ্গের বিশারদ বংশীয় রামরামের স্ত্রী (এই ভদ্রমহিলার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যেত বলে প্রসিদ্ধি ছিল), হাউলি—সোণাইতা নিবাসী মধুসূদন ভট্টাচার্যের পত্নী প্রভাবতী দেবী, সতরসতী পরগণার সাধুহাটী গ্রামের গঙ্গারাম শিরোমণির স্ত্রী শৈলজা দেবী, বরমচাল পরগণার আলীনগর গ্রামের দুর্গাচরণ চক্রবর্তীর পত্নী রুক্মিণী দেবী, আগনার সিদ্ধপুরুষ ঠাকুর পরশের স্ত্রী জয়ন্তী দেবী (ইনিও পরম সাধিকা ছিলেন, অধিকন্তু শাকুনিক বিদ্যা জানতেন)। সবচেয়ে বিস্ময়কর সংবাদ— রঘুনাথ শিরোমণির দাদা ইটার রঘুপতির বংশে পরবর্তী যুগে ছয়জন মহিলা 'সতী' হন। এঁরা হলেন উমাকান্তের স্ত্রী ভবানী দেবী, রামেশ্বরের স্ত্রী মালতী দেবী, হরকৃষ্ণের স্ত্রী অপূর্ণ দেবী, শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী সুশীলা দেবী, বাণীনাথের স্ত্রী সুদক্ষিণা দেবী, রাধাকৃষ্ণের স্ত্রী বিজয়া দেবী। অপূর্ণ দেবী, সুশীলা দেবী, সুদক্ষিণা দেবী এঁরা তিনজন ছিলেন মালতী দেবীর পুত্রবধূ। আর একটি লক্ষণীয় বিষয়— সতীরা সকলেই উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণ পরিবারের বধূ।

হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক

শাহজলালের অভিযানের ফলে যেভাবে গৌড় গোবিন্দ ও তরফের আচাক নারায়ণ রাজ্যচ্যুত হন এবং যেভাবে শাহজলালের কোনো কোনো অনুচর রাজ্য দখল করেছিলেন তাতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক না থাকারই কথা। সন্দেহ নেই নিম্নবর্ণের অনেক হিন্দু বিজয়ী জাতির ধর্ম স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার কবেছিল, কিন্তু বলপূর্বক ধর্মান্তরিত ব্যক্তির সংখ্যাও কম ছিল না। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই বলপ্রয়োগ বেশি ঘটেছিল। ইটার বাজা সুবিদনারায়ণেব চারপুত্র, বাণিয়াচঙ্গের রাজা গোবিন্দ খাঁ এই ভাবেই ধর্মান্তরিত হন। সর্বানন্দ রায় হয়তো নিজ ইচ্ছায় সরওয়ার খাঁ-তে রূপান্তরিত হন, কিন্তু সমাজেব প্রতিপত্তিশালী হিন্দুদের জাতিনাশ করার একটা প্রবণতা যে মুসলমান শাসনকর্তাদের মধ্যে ছিল তা সুস্পষ্ট। চৈতন্য জীবনীতে সুবুদ্ধিরায়ের কাহিনী সবার জানা আছে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে মনে হয় হিন্দু-মুসলমানেব প্রাথমিক সংঘর্ষ ঘটে যাবার পর খুব একটা প্রচণ্ড বিরোধিতাব ভাব ছিল না; মধ্যযুগের শেষার্ধে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্রীহট্টেব শাসনকর্তা বা ফৌজদার নিযুক্ত হতেন সাধারণতঃ উচ্চবংশীয় মুসলমান, কিন্তু একজন নবাব যে হিন্দু ছিলেন তা আমরা দেখেছি। উচ্চপদাধিকারী হিন্দু অনেক ছিলেন। আনন্দরাম গুপ্ত (রায়) থেকে মানিকচাঁদ পর্যন্ত প্রায় তিনশ বছর ধরে শ্রীহট্টের দেওয়ান ছিলেন একই হিন্দু পরিবারের ব্যক্তিরা। কানুনগো, দস্তিদার, পাটওয়ারি, খাজাঞ্চি— রাজস্ব বিভাগেব এই পদগুলিতে সম্ভবত মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যা বেশি ছিল। খাজাঞ্চি ও পোদ্দার এই দুটি পদ ছিল একান্তভাবে হিন্দুর। সৈন্য বিভাগেও হিন্দুর স্থান ছিল (সেনাপতি হরগোবিন্দ ও সুবেদাব কল্যাণসিংহ)। কোনো কোনো মুসলমান শাসক, যেমন নবাব ফরহাদ খাঁ, হিন্দুদেব গুণগ্রাহী ছিলেন তা তাঁদেব দলিল ও দানপত্রাদি দেখে অনুমিত হয়। হিন্দু জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসকদেব উপর সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের আস্থা ছিল। ব্যবসাবাণিজ্যেও হিন্দুরা ছিলেন অগ্রণী। বহু হিন্দু ফার্সিভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিলেন বলে রাজদরবারে তাঁদের প্রতিপত্তি ছিল। কখনো কখনো মুসলমান জমিদারেবা হিন্দুদের দূত করে পাঠাতেন দিল্লীতে, যেমন গিয়েছিলেন ইটার দেওয়ানদেব দূত হয়ে রাজারাম।

গঙ্গারাম পণ্ডিত, রামভদ্র দেওয়ান, মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, হরিশঙ্কর বিদ্যালঙ্কাব প্রভৃতি হিন্দু পণ্ডিতদের ভূমিদান কবে নবাবরা যেসব সনন্দ দিতেন তাতে পাওয়া যায় নবাব নজীব আলী খাঁ, নবাব মোহম্মদ আলী খাঁ, নবাব হায়দর আলী খাঁ, নবাব ফরহাদ খাঁ প্রভৃতির নাম। মুসলমান জমিদার, দেওয়ান, কানুনগো এমন কি নবাবের দেওয়া রাজপণ্ডিতির সনদ পাওয়া গেছে প্রচুর।

এইসব দলিলে মুসলমান ব্যক্তিরা বহুস্থলে স্বাক্ষরের সময় নিজের নামের পূর্বে 'শ্রী' শব্দ ব্যবহার করেছেন (যথা 'শ্রীমহাম্মদ সফি')। ওই যুগেও দেখা যায় অনেক দলিল সংস্কৃতে বা সংস্কৃতমিশ্রিত বাংলায় লিখিত।

হিন্দু সাধক ও সিদ্ধপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে বহু ধনীমুসলমান ভূমি ও সম্পত্তি দান করেছিলেন। বেগমপুর গ্রামের নামকরণের হেতু জমিদার চান্দ খাঁর বেগম আদিদেব বংশীয় বাক্‌সিদ্ধ সদাশিবের সেবার জন্য গ্রামটি দান করেছিলেন। এইভাবে সিদ্ধপুরুষ নিত্যানন্দকে ভূমি দান

করেছিলেন জমিদার মোহাম্মদ আলী, তপস্বী গঙ্গারামের তপঃক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়ে দেন ইটার রাজবংশীয় বৃদ্ধ দেওয়ান ইস্রাইল খাঁ, বঞ্চিত ঘোষের বংশীয় নিত্যানন্দ ওরফে নিমাই পণ্ডিতকে 'দ্বারপণ্ডিত' নিযুক্ত করেছিলেন ইটার মনসুর নগরের জমিদার দেওয়ান গফুর মিয়া। বঞ্চিত ঘোষ ও জগন্মোহন গোসাঞি এই দুজন সাধকের কাছেই বহু মুসলমান ভক্তের আগমন হত।

অপরদিকে মুসলমান পীর-দরবেশরাও হিন্দু ভক্তদের দ্বারা সমাদৃত হতেন। ভৌলা শাহ, মুনিবউদ্দীন, শাহ পাতা, পেড়া শাহ প্রভৃতি সাধকেব কথা পূর্বে বলা হয়েছে। অর্জুন বংশীয় রতিরামের ভ্রাতা চণ্ডীচরণ 'মজিদ' নামক মুসলমান সাধককে অনেক জমি দিয়েছিলেন, সেখানে পরে গড়ে ওঠে মজিদপুর গ্রাম। ছোটলিখার আদিত্যরা ফকির আকবরের 'মোকাম' প্রস্তুত করে দেন।

গীতবাদ্য

প্রাচীন শ্রীহট্টে গীতবাদ্যেব প্রচলন ছিল এবং গীতবচয়িতা ছিলেন অনেক। বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীতের অনেক প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। কেশবপুরের রাধারমণ দত্তের কৃষ্ণলীলা পদাবলী বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। 'বঞ্চিত ঘোষও' অনেক পদ রচনা কবেন। তাঁর একটি বিখ্যাত পদ—

ওহে নাথ কৃপার সাগব হরি।
তব কৃপা হলে এ ভব তরিয়া
দেশেতে ফিরিতে পারি ॥ ধু ॥

রাধাকৃষ্ণ নাম দড়াইয়া না লইনু
ভবের সম্পদ পাইয়া।
ওপারে পড়িয়া ডাকিহে তোমারে
দিন গেল মোর গইয়া ॥

নাম নিরঞ্জন পতিত পাবন
এ বেদ পুরাণে কয়।
(পড়ি) এভব সংসারে ডাকিহে তোমারে
খণ্ডাহ শমন ভয় ॥

জনমে জীবনে রাম না গাইনু
আপন করম দোষে।
দীনবন্ধু নামে ভরসা করিয়াছি
অধম বঞ্চিত ঘোষে ॥

'বঞ্চিত' উঁচুদরের সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, শোনা যায় চৌতাল কীর্তন তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত হয়।

জগন্মোহনী সম্প্রদায়ের 'নির্বাণসঙ্গীত' তাঁদের সমাজে বিশেষ সমাদৃত। এরূপ একটি নির্বাণ সঙ্গীতের নিদর্শন রামকৃষ্ণ গোসাঞি রচিত—

সাধুরে ভাই
পূর্ণব্রহ্ম গুরু কেমন ভাবে পাই ?
ছাড়িয়া সকল মায়া প্রভুর পদে লও ছায়া
অন্তকালে আর লক্ষ্য নাই।
অবিনাশে কর মন, বুদ্ধি কর স্থিতি
হেলায় তরিবা ভব পাইয়া মুকতি।
হীন রামদাসে বলে সেবায় বড় হীন
কৃপা করি রাখ পদে না ভাবিও ভিন॥

মুসলমান পীর সাধকেরাও অনেকে সঙ্গীত রচনা করতেন। কুতুব-উল-আউলিয়া সাহেবের একটি বিচিত্র সঙ্গীত উদ্ধৃত করছি, এটিতে বাংলা, ফার্সি, হিন্দি আরবি, সংস্কৃত সবরকম শব্দই প্রযুক্ত হয়েছে—

রাগিণী-আহিরী

মুই তোর কি দোষ কৈল রে জানম্ মুই তোর কি দোষ কৈল ?
আরজু ফরদম রুহ্ এ তু দিদম্ তন মন পাগল ভৈলু।
হামচুঁ মজনু বাহ্‌রে তু লেয়লি ভাবিয়া ব্যাকুল হৈলু রে জানম্।
ইম্‌রুজ ফজরে দিল্‌বরে জানম্ আসিবার বলিয়া গেলে!
রুজ গুজাশ্তা কাম রসিদা আফ্‌তক তুই ঘরে না আইলে রে জানম্।
জুল্‌ফে কুসাদি জানান বুর্দি ভুলিয়া রইলে মোরে!
রুজনা মুর্‌দম্ মবনা অফ্‌তম রাইত কেনে না তুমি আইলা রে জানম্
চস্‌মে চুঁ আহুঁ চিনি বুলমদ্, দান্দানে চুঁদানে আনার।
এস্‌কে তোমরা ছিনা গৃফ্‌দার হি তক পুড়িলে মোরে বা জানম্!
হরফে অনছতু মারানা মুদি কালুবালা চিত্তে ধইলু
আলে মুল গয়ের তুরেহিম রওসন মুই তোর অন্ত না পাইলু রে জানম্
লাতক না তু মির বহমুতাল্লে কুতুবে মান্দামে হিয়া
ইন্নাল্লা ইনফেরু জনুবা ভুলিয়াছ নি তুমি বা জানম্ মুই তোর কি দোষ কৈলু ?

শ্রীহট্টের চেয়ে জয়ন্তীয়ার সঙ্গীতের মান বোধ হয় উন্নততর ছিল। জয়ন্তীয়ার কীর্তন, বিশেষতঃ মহিলাদের কীর্তন সুরুচি সুন্দর ও উচ্চাঙ্গের। অচ্যুতচরণ চৌধুরী জয়ন্তীয়ার মহিলাদের রাসসঙ্গীতকে 'কিন্নরগীতি' আখ্যা দিয়েছেন। রাজা রাজেন্দ্র সিংহ স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ ও গীত রচয়িতা ছিলেন— তাঁর ঝুলন গীতি প্রসিদ্ধ।

বিভিন্ন বাদ্যের মধ্যে একটি অভিনব বাদ্যের নাম পাওয়া যায়— ডম্প। চৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠ তিন পার্ষদ গোবিন্দ, মাধব ও বাসু ঘোষ তাঁর কীর্তনে প্রধান গায়ক ছিলেন। এঁরা রাঢ় দেশের কুলাই গ্রামবাসী ছিলেন। কিন্তু এঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র শঙ্কর ঘোষের বংশধরেরা শ্রীহট্টের গয়ঘরে বসতি স্থাপন করেন— এঁদেরই বংশে জন্ম নেন 'বঞ্চিত' ঘোষ। শঙ্কর ঘোষ সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, 'ডম্প' বাদ্য করে মহাপ্রভুর প্রীতি অর্জন করেছিলেন। 'বৈষ্ণব বন্দনা' গ্রন্থে পাওয়া যায়—

বন্দিব শঙ্কর ঘোষ অকিঞ্চন রীতি
ডম্পের বাদ্যেতে যেবা প্রভুর কৈল প্রীতি॥

বেশভূষা

ভদ্র পুরুষের পোশাক ছিল ধুতি ও চাদর। ধুতি মিহি হত না, হাঁটুর নিচে নামতো না। বাড়ির বাইরে যেতে হলে চাদর ও নিমা, শীতকালে মিরজাই অবশ্যই ব্যবহার করতে হতো। শীতকালে দরিদ্র ব্যক্তিরা যুগীয়ানা গিলাপ ও ভদ্র ব্যক্তিরা শাল ব্যবহার করতেন। 'দরবারে বা রাজদ্বারে যেতে চাপকান, আচকান, লাটুদার পাগড়ী ও পায়ে নাগরা জুতা পরতেন'।

স্ত্রীলোকদের শ্রেষ্ঠ শাড়ির মধ্যে ছিল মেঘডম্বর, চন্দ্রকোণা, রাসমন্ডল প্রভৃতি। অলঙ্কারের মধ্যে ছিল— 'মাথায় টীকা; কানে ঠেক, কানফুল, কড়ি; নাকে নথ ও বেশর; গলায় মালা, হাঁসলি, পাঁচলহরী বা সাতলহরী, হাতে শঙ্খ, কঙ্কণ, বলয়; বাহুতে বাজুবন্ধ, বাজু; পায়ে বেকি, খাড়ু, ঘুঙ্গুর ও পাজের।' মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারে রূপার অলঙ্কারের চল ছিল।

জয়ন্তীয়ার নারীরা ব্যবহার করতেন

উপর কানে অলঙ্কার— লং,

নিম্ন কানের অলঙ্কার— ছুচী,

গলার অলঙ্কার— প্রবাল রচিত সোনার মালা, স্বর্ণময় গল্লার গোটা, মোহন মালা ও কণ্ঠি,

নাকের অলঙ্কার— নথ, বেশর ও ফুল,

রৌপ্য নির্মিত হাতের অলঙ্কার— শাখা,

বাহুর অলঙ্কার— বাইন দড়ী, কবজ, হাতপাট্টা,

পায়ের অলঙ্কার— খাড়ু ও পাজের,

শিশুদের পায়ের অলঙ্কার— মঠী।

বিবাহরীতি

চৈতন্য জীবনীগুলিতে ভদ্র হিন্দু পরিবারে বিবাহের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা সারা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল— শ্রীহট্টও এর ব্যতিক্রম নয়। বিবাহ উৎসবে আজকের মতো তখনো স্ত্রী আচারের প্রাধান্য ছিল। তবে একটি বিষয়ে শ্রীহট্টে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সপ্ত প্রদক্ষিণকালে কন্যাকে বহন না কবিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ রীতির প্রচলন বেশিদিন আগেকার কথা নয়। লাতুর মুনসেফী আদালতেব উকিল মুনশী গৌরীচবণ দাস নিজেব মধ্যমপুত্রের বিবাহে এ রীতি প্রবর্তন করিয়েছিলেন। গৌরীচরণের জীবৎকাল ১৮০০-১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং কন্যা কর্তৃক প্রদক্ষিণের নব্যরীতি একশ দেড়শ বছব আগে প্রচলিত হয়।

বিবাহকালে বর কানে কুণ্ডল, মণিবন্ধে বাজুবন্ধ, গলায় হার ও মাথায় শোলার মুকুট পবে আসতেন। শ্রীহট্টের সাহা সমাজে এই রীতি দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। ববের হাতে কখনো কখনো বালাও থাকতো। ববযাত্রীরা ধুমধামের সঙ্গে লোকলস্কব নিয়ে চলতেন, দুপক্ষে লাঠিখেলাও হত কোথাও কোথাও। বড়লোকেরা 'সায়বাণী দোলায়' চড়ে বিবাহ কবতে যেতেন। চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার সময় মহাপ্রভু সাযবাণী দোলায় আরোহণ করেছিলেন।

শ্রীহট্ট ও জয়ন্তীয়ার বিবাহ রীতিতে কিছু পার্থক্য ছিল। জয়ন্তীয়ার সমাজ মাতৃতান্ত্রিক— বিবাহের পর বর শ্বশুরগৃহের বাসিন্দা হয়। এদের বিবাহ পদ্ধতি ছিল সহজ। বরকন্যার মনেব মিল হলেই বিবাহ সিদ্ধ, শুধু একদিন আত্মীয়স্বজনকে ভোজন করাতে হত। বিবাহবিচ্ছেদও তেমনি সহজ— একটি পান ছিঁড়ে 'নিকাশ' বললেই বন্ধন ছিন্ন হত। মাতৃতান্ত্রিক জয়ন্তীয়ায় রাজাদেব বিবাহ করার অধিকাব ছিল না— তাঁদের ভাগিনেয়রা উত্তরাধিকাবী হতেন।

দেশের সাধারণ অবস্থা

শাহজলাল কর্তৃক গৌড় অধিকারের পর শ্রীহট্টের গৌড় অঞ্চলে আর কোনো রাজবংশের অভ্যুদয় হয় নি। নবাবি আমলে শ্রীহট্ট আমিল বা ফৌজদার কর্তৃক শাসিত হত। একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন বাজ্যেব মর্যাদা তা, ছিল না, শ্রীহট্ট ছিল সুবে বাংলার একটি সরকার মাত্র। ইটা, তরফ ও লাউড় ক্রমশঃ এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত হলেও শ্রীহট্টের আয়তন ছিল খুবই ছোট। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আর. বি. পেম্বারটন লিখেছেন— শ্রীহট্ট অতি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হবাব দশ বছর পবে হিসাব কবে দেখা হয় শ্রীহট্টেব আয়তন ছিল মাত্র ২,১৬৮ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল ৪,৯২,৪৯৫ জন— অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে জনবসতি ১৭২ জন।

তিন পাশে তিনটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য ত্রিপুরা, জয়ন্তীয়া ও কাছাড়ের মধ্যে অবস্থিত শ্রীহট্টে আমিল ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীমাত্র এবং অন্ততঃ দুইবার আমিল বা ফৌজদার বহিরাগত শক্তির আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। একবার ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের সেনাপতি চিলারায়ের আক্রমণে আমিল পরাভূত হলে তাঁর ঘাড়ে বিরাট একটি করের বোঝা চাপানো হয়। (দুশো ঘোড়া, একশো হাতি, তিন লক্ষ টাকা ও দশ হাজার মোহর)। এর কিছুদিন পরে ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্য শ্রীহট্ট বিজয় করেন। শ্রীহট্ট বেশ কিছুকাল ত্রিপুরার অধীনে করপ্রদ রাজ্য ছিল। আসামের আহোম রাজাদের ভয়েও শ্রীহট্টের আমিলকে সন্ত্রস্ত থাকতে হত। আহোম রাজ রুদ্রসিংহের গৌহাটিস্থিত প্রতিনিধি 'বড়ফুকন' যেরকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভঙ্গীতে শ্রীহট্টের ফৌজদারকে লিখেছেন---- 'আর জয়ন্তা ও কাছারিও আমার ঠাঁই নিমকহারাম করিলেক। তার কারণে ৺বে তারে যে অবস্থা করিলেন তাহাক তুমি দেখিয়াছ। অতএব তোমার মাঝে যেমন বিগডি নয় সেই করিবা'— তাতে ফৌজদারকে ভীত ও সন্ত্রস্ত বলেই অনুমান করা যায়।

নবাবি আমলের শেষভাগে শ্রীহট্টের শান্তি বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয় মগ ও পোর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার এবং খাসিয়া ও কুকি সম্প্রদায়ের ক্রমাগত হানার ফলে। মুর্শিদকুলিখাঁর 'জমা কামেল তোমার' থেকে জানা যায় জলদস্যুদের দমনের জন্য 'আমলে নাওরা' (নৌসৈন্য বিভাগ ও তার জায়গীর) স্থাপিত ছিল। 'এই বিভাগে অনেক ফিরিঙ্গি সৈন্য ও ৭৬৮টি সমরতরী ছিল, এর ব্যয় ঢাকা ও শ্রীহট্টকে বহন করতে হত'। এজন্য শ্রীহট্ট থেকে আদায় হত ৪৬,৭৬৬ টাকা।

লাউড় সীমান্তে খাসিয়ারা এবং ত্রিপুরী সীমান্তে বিশেষতঃ প্রতাপগড় অঞ্চলে কুকিরা বারবার আক্রমণ চালাতে থাকে। এই আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা আমিলের ছিল না। কাছাড় সীমান্ত পার হয়ে আহোমরাও অনেকবার হানা দেন। একজন নবাব এজন্য বুন্দাশিলে (বদরপুরে) একটি কেল্লা স্থাপন করে কিছু পোর্তুগীজ গোলন্দাজ মোতায়েন করেন।

সাধারণ মানুষের জীবনে আরো দুটি উপদ্রব ছিল। নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়ে একটি কুপ্রথা ছিল 'খোজা' বানানো। শ্রীহট্ট থেকে খোজা রপ্তানি করা এমন লাভজনক ব্যবসায়ে দাঁড়ায় যে জাহাঙ্গীর আইন করে এই প্রথা রদের চেষ্টা করেন। যারা খোজার উপযোগী বালক সন্ধান করে ফিরত তাদের বলা হত 'খোজকর'। এদের ভয়ে মানুষ সন্ত্রস্ত ছিল।

জয়ন্তীয়ায় দেবীর কাছে নরবলি দেবার নিয়ম থাকায় প্রায়ই শ্রীহট্ট থেকে তারা লোক অপহরণ করতো। খাসিয়ারাও নাগদেবতার পূজায় রক্তদানের জন্য মানুষের সন্ধানে ফিরতো। এর উপর কুকিদের অতর্কিত আক্রমণ ছিল বীভৎস অত্যাচারে পূর্ণ। নবাবি আমলের শেষ ভাগে জনজীবনে শান্তির অভাব ঘটেছিল বলে অনুমিত হয়।

এত অশান্তি ও দুর্যোগের মাঝেও শ্রীহট্টে প্রচুর টোল চতুষ্পাঠী ছিল, পাণ্ডিত্যের চর্চা ছিল, পণ্ডিতের সমাদর ছিল, সাহিত্য-সঙ্গীত-সংস্কৃতির বিস্তার হয়েছিল। শ্রীহট্টে অদ্বৈত শ্রীচৈতন্য ছাড়াও ঠাকুরবাণী, বৈষ্ণব রায়, বঞ্চিতের মতো ধর্মগুরু আবির্ভূত হয়ে জনসাধারণকে প্রভাবিত করেছিলেন। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু পরিবারে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের চর্চা যেমন ছিল সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে তেমনি ছিল উর্দুর চর্চা, এবং ফার্সি ভাষায় হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়েই দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। সাধারণভাবে সমাজের নৈতিকমান উঁচু ছিল। তবে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে ঘাটুগানের প্রসার যেভাবে বাড়ছিল ও খোজা বানানোর লোভ ছিল তাতে এদের নৈতিক মান বিষয়ে উঁচু ধারণা হয় না।

সম্ভবতঃ জীবনযাত্রায় কিছুটা অনিশ্চয়তা ছিল বলে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েই জ্যোতিষ ও অলৌকিকতার প্রতি আকর্ষণ দেখা দেয়। মুর্শিদাবাদের নবাবদের জ্যোতিষীপ্রীতি সুবিদিত। শ্রীহট্টে অনেক খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ ছিলেন, এমন কি কোনো কোনো মহিলাও জ্যোতিষচর্চা ও সফল ভবিষ্যদ্‌বাণীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

জয়ন্তীয়া ও কাছাড়ের সঙ্গে শ্রীহট্টের সাংস্কৃতিক যোগ যেমন নিবিড় ছিল তেমনি ছিল ত্রিপুরার সঙ্গেও। নবাবি আমলেও ত্রিপুরাকে বাদ দিয়ে শ্রীহট্টের কথা কল্পনা করা যেত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও বর্তমান শ্রীহট্ট জেলার একটি অংশ ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, আবার ত্রিপুরার কোনো কোনো অঞ্চল (যেমন কৈলারগড় বা কৈলাসহর) শ্রীহট্টের এলাকাভুক্ত বলে গণ্য হতো।

শ্রীহট্টে যাতায়াতের পথ দুর্গম ও বিপদ্‌পূর্ণ হলেও ভ্রমণে শ্রীহট্টবাসীর আনন্দ ছিল। দক্ষিণভারত ও উত্তরভারত দুই প্রান্তের তীর্থেই শ্রীহট্টবাসী যেতেন। রাজকার্য উপলক্ষে অনেকেই দিল্লীতে গিয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এক সময় মিথিলায়, পরবর্তীকালে কাশীতে, শ্রীহট্টের ছাত্রেরা কীর্তিস্থাপন করে এসেছেন। নবাবি আমলের শেষ ভাগেই শ্রীহট্টের সন্তান বিদ্যাধর ভট্টাচার্য সুদূর রাজস্থানে গিয়ে জয়পুর শহরটিকে আধুনিক পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত করেন।

শ্রীহট্টের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়— আধুনিক যুগ

পট পরিবর্তন — রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলন — বিচ্ছিন্ন করার দাবী — শিক্ষাবিস্তার — মুরারি চাঁদ কলেজ — স্ত্রীশিক্ষা — শাস্ত্রচর্চা ও সংস্কৃত ভাষা সেবা — ধর্মগুরু — তীর্থ ও দেবস্থান — সমাজসংস্কার ও সেবা — নবযুগের হিন্দু সমাজ — একালের মুসলিম সমাজ — খ্রীষ্টান সমাজ — মণিপুরী সমাজ — শিক্ষায় বিদেশীদের দান — অর্থনৈতিক উন্নতি — শ্রীহট্টের কয়েকজন মনীষী (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, জয়গোবিন্দ সোম, রাধানাথ চৌধুরী, রামকুমার নন্দী মজুমদার, রাজা গিরীশ চন্দ্র রায়, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, পণ্ডিতা রমাবাই, বিপিনবিহারী দাস, তারাকিশোর চৌধুরী, সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, অচ্যুতচরণ চৌধুরী, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য সরস্বতী, সারদাচরণ শ্যাম, কামিনীকুমার চন্দ, বৈকুণ্ঠ চন্দ্র গুপ্ত, রমাকান্ত রায়, গুরুসদয় দত্ত, মহেন্দ্রনাথ দে, কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী) — একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্বঃ হাসন রজা — সাহিত্যে নবযুগ — লোকগীতি ও কোষগ্রন্থ — সিলেটী নাগরী — মহিলা সাহিত্যিক — সাংবাদিকতা — সাহিত্যসম্মেলন ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠান — আধুনিক সাহিত্যিক বৃন্দ — সংকলন গ্রন্থ — ইংরাজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি — সঙ্গীত-নৃত্য-চিত্রকলা — কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষক ও কৃতি ছাত্রছাত্রী — গ্রন্থাগার — কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি — বিবিধ কথা (শ্রীহট্ট সহরের আয়তন, বেশভূষা, আহার্য, খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ)

শ্রীহট্টের সমাজ চিত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়— আধুনিক যুগ

পট পরিবর্তন

চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম শাসনকালে তরফ, ইটা, প্রতাপগড় প্রভৃতি স্থানে অনেক ভূস্বামী শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। আকবরের আমলে লাউড় মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও লাউড়ের রাজাকে সেসময় সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং ভূমি-রাজস্ব তাঁকে দিতে হত না। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রথম থেকে শ্রীহট্টে কোনো শক্তিশালী সরকারের বা প্রতাপান্বিত জমিদারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ বাংলার দেওয়ানী লাভ করলে শ্রীহট্টেও ইংরাজ অধিকার বিনা বাধায় বিস্তৃত হয়। পূর্ববঙ্গের রাজস্ব আদায়ের জন্য ঢাকায় রেভিনিউ বোর্ড স্থাপিত হয়েছিল। এই বোর্ড থেকে শ্রীহট্টে প্রথম রেসিডেন্ট পাঠানো হয় মিষ্টার থ্যাকারেকে। থ্যাকারে দেখতে পান উদ্ধত শ্রীহট্টবাসীর কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা বেশ কঠিন। তখনো নবাবী আমলের রীতি অনুযায়ী শ্রীহট্টের শাসনভার ন্যস্ত ছিল ফৌজদারের হাতে। কোম্পানীর আমলেও প্রথম দিকে ক'জন 'নবাব' ফৌজদার রূপে কাজ করেছেন। নবাবি আমলের দেওয়ান মানিকচাঁদ তখনো কর্মরত, পরবর্তী রেসিডেন্টের আমলেও মানিকচাঁদ কাজ করেছেন ; ইনিই শ্রীহট্টের শেষ দেওয়ান। ধীরে ধীরে ইংরাজকে রাজস্ব আদায় ব্যতীত শাসনভারও গ্রহণ করতে হয়। শ্রীহট্টে তখন কোনো আদালত ছিল না, নবাবি বিচারালয় ছিল তরফের সুলতানসিতে। ইংরাজ শাসকেরা এ সকল অব্যবস্থা দূর করে শাসনযন্ত্রকে দৃঢ় করবার প্রয়াস পান। যে সকল দুর্বিনীত জমিদার বশ্যতা স্বীকার করতে চান নি, যেমন প্রতাপগড়ের রাধারাম, তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন তাঁরা। জয়ন্তীয়ার রাজা ছত্রসিংহ শ্রীহট্টের ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত এলাকার প্রজাদের নিগৃহীত করলে মেজর হেনিকার সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে জয়ন্তীয়াবাসীকে দমন করেন। সৌভাগ্যবশতঃ পরবর্তী রেসিডেন্ট মিষ্টার লিণ্ডসে সাহসী সুশাসক ছিলেন। একদিকে তিনি রাজস্ব আদায় সুশৃঙ্খল করেন, অন্যদিকে বিদ্রোহ দমন করে আইন-শৃঙ্খলা সুরক্ষিত করেছিলেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শ্রীহট্টের মুসলমানেরা মোহরম উৎসবের দিন অকস্মাৎ এক ব্যাপক হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। লিণ্ডসে কঠিন হাতে হাঙ্গামা দূর করলে বিদ্রোহীরা আর কখনো মাথা তুলতে পারে নি। তাঁর আর একটি সুকীর্তি খাসিয়াদের শায়েস্তা করা। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে খাসিয়ারা আর সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় নি।

লিণ্ডসের আমলে আরো বহু বিষয়ে শ্রীহট্টের উন্নতি হয়; যথা কৃষিকাজ (চা, কফির চাষ), ব্যবসা (কাঠ ও চূণের কারবার), দেওয়ানী বিভাগের সংস্কার (আইন প্রবর্তন), রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্ত ('পুণ্যাহ পর্বে শ্রীহট্টের প্রথম জমিদারের কপালে তিনি স্বয়ং চন্দনের ফোঁটা ও গলায় ফুলের মালা দিতেন')।

লিণ্ডসে শ্রীহট্টে প্রায় দশ বছর ছিলেন— এই সময়ের মধ্যে বারবার বন্যায় শ্রীহট্ট বিধ্বস্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি কার্যভার ত্যাগ করেন তখন দেশের সর্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করছিল। লিন্ডসে শ্রীহট্টের অধিবাসীদের 'মামলাবাজ' এবং মুসলমানদের জিঘাংসাপরায়ণ বলেছেন— কিন্তু শ্রীহট্টবাসীর সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক বিলাত যাবার পরও ছিন্ন হয় নি।

লিণ্ডসে পরবর্তী রেসিডেন্টরা নদীর তীরে বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কাজে প্রবৃত্ত হন এবং কর্ণওয়ালিসের উপদেশে জরিপ আরম্ভ করেন। এসময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা দশসনা বন্দোবস্ত যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়। সে অনুসারে অধিকাংশ ভূমিই জোতদখলকারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়; এর সুফল পরে সাধারণ মধ্যবিত্তরাও ভোগ করেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দেও শ্রীহট্ট জেলার আয়তন ছিল মাত্র ২১৬৮ বর্গমাইল। ক্রমশঃ ইংরাজ রাজত্বের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধির ফলে কাছাড় ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। সেই বছর সমগ্র আসামও ইংরাজ শাসনে আসে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়ন্তীয়া ব্রিটিশ শাসনাধীন হল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর তিনবার মাত্র জেলার শান্তি বিঘ্নিত হয়েছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে একই দিনে মোহরম ও রথযাত্রার অনুষ্ঠান হওয়ায় হিন্দু-মুসলমানে এক হাঙ্গামা বাধে। পরবর্তীকালে যিনি মণিপুরের রাজা হয়েছিলেন সেই গম্ভীরসিংহ তখন অনুচরসহ শ্রীহট্টে বাস করছিলেন। গম্ভীরসিংহের মণিপুরী সৈন্যদের বিক্রমে মুসলমান হাঙ্গামাকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের কালে চট্টগ্রামের তিন শ সীমান্ত রক্ষক সৈন্য বিদ্রোহী হয়ে ওখানকার কালেক্টরীর টাকা লুঠ করে ত্রিপুরার মধ্য দিয়ে শ্রীহট্টে প্রবেশ করে। লাতু বাজারের কাছে মালগড় টিলায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে মেজর বিঙ-এর সৈন্য বাহিনীর লড়াই হয় ও পরাজিত বিদ্রোহীরা পালিয়ে যায়।

পার্বত্য কুকিরা ১৮২৬, ১৮৪৪, ১৮৪৭, ১৮৪৯, ১৮৬২ ও ১৮৭১ সালে সমতলে এসে লুটপাট ও নরহত্যা চালায়। ১৮৬৯ সালে একবার সৈন্য পাঠিয়ে তাদের কিছু জব্দ করা হয়। অবশেষে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তারা উত্তর লুশাইর শাসনকর্তা ক্যাপ্টেন ব্রাউনকে হত্যা করলে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে সমগ্র লুশাই প্রদেশ দখল করে নেওয়া হয়।

শাসনব্যবস্থার উন্নতি সত্ত্বেও প্রাকৃতিক বিপর্যয় কয়েকবার জনসাধারণের অশেষ কষ্ট ঘটায়। ১৮৬৯ ও ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দুবার দুটি প্রচন্ড ভূমিকম্পে শ্রীহট্টের গুরুতর ক্ষতি হয়।

শ্রীহট্টের ইতিহাসে এসময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা--- আসাম প্রদেশে শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্তি। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর নবগঠিত আসাম প্রদেশের অঙ্গরূপে শ্রীহট্টকে যোগ করা হলে জেলার সর্বত্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। জনসাধারণের অসন্তোষ দূর করার জন্য সেবছর ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক স্বয়ং শ্রীহট্টে এসেছিলেন। শ্রীহট্ট শহরে সুরমা নদীর তীরে চাঁদনী ঘাটের সিঁড়ি তাঁরই সম্মানার্থে নির্মিত হয়েছিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট আসাম সহ পূর্ববঙ্গ নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। বঙ্গভঙ্গের এই ঘটনাও শ্রীহট্টে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে শ্রীহট্ট ও আসাম পুনরায় পূর্বের মতো এক প্রদেশরূপে গণ্য হতে থাকে।

রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলন

দেশ বিভাগের পূর্ববর্তী একশো বছরের ইতিহাস রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ, রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসার ও আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির ইতিহাস। পশ্চিমবঙ্গে তথা সারা ভারতে যে চেতনার তরঙ্গ উঠেছিল তা শ্রীহট্টেও ছড়িয়ে পড়ে। সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শ্রীহট্টকে স্পর্শ করেনি সত্য কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে সচেতনতা ও পরাধীনতার গ্লানিবোধ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনকে অধিকার করতে থাকে।

কবি প্যারীচরণ দাস যখন কলকাতায় কোনো অফিসে কেরাণীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন সেসময় একদিন অফিস থেকে ফেরবার পথে ওয়েলিংটন স্কোয়ার অঞ্চলে এক সাহেবের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। ধস্তাধস্তির সময় প্যারীচরণের একটি অনিচ্ছাকৃত আঘাতে সাহেবের মৃত্যু ঘটে। আদালতে সত্য কথা বলায় প্যারীচরণকে অল্প শাস্তি---- তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু এই ঘটনার পর প্যারীচরণ কলকাতা ত্যাগ করে শ্রীহট্টে চলে আসতে বাধ্য হন এবং 'শ্রীহট্টপ্রকাশ' পত্রিকা বার করেন। প্যারীচরণকে বলতে পারি শ্রীহট্টে স্বাদেশিক চেতনার অগ্রদূত। কলকাতায় যখন কিশোরীচাঁদ মিত্র পদচ্যুত হচ্ছেন, বঙ্কিমচন্দ্র লাঞ্ছিত হচ্ছেন, কৃষ্ণদাস হরিশ্চন্দ্র নির্যাতিত হচ্ছেন সেসময় সুদূরে শ্রীহট্টে প্যারীচরণও একইভাবে নিগ্রহ বোধ করে ক্ষুব্ধ মনে দেশের গৌরব উদ্ধারের স্বপ্ন দেখছিলেন।

প্রায় একই কালে আর একটি ঘটনা শ্রীহট্টের জনমানসে তরঙ্গ তোলে। এক তরুণ বাঙালী আই. সি. এস. অফিসার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহট্টে কর্মে নিযুক্ত থাকা কালে ইংরাজ কর্তৃপক্ষের চক্রান্তে ও অবিচারে পদচ্যুত হন। এই ঘটনাটি সুরেন্দ্রনাথের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেয় ও ভারতের ইতিহাস নূতন পথে যাত্রা করে। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার শ্রীহট্টে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে ; দুলালচন্দ্র দেব প্রমুখ উকিল ও সমাজ নেতারা সরকারি আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

এসময় দেশে যে সুস্পষ্ট স্বাদেশিক কর্মপদ্ধতির সূচনা হয় তার নেতৃত্ব দেন বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, রাধানাথ চৌধুরী, রমাকান্ত রায় প্রমুখ এবং শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর 'দেবীযুদ্ধ' কাব্য ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে ইন্ধন যোগায়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বঙ্গবিভাগ হলে শ্রীহট্টে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সুরমা উপত্যকা সমিতি দুই জেলার সর্বত্র স্বদেশী প্রচার ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সভা করতে থাকেন। অনেক জমিদারও এসময় প্রজাদের স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহিত করেন। ব্যবসায়ীরা অনেক স্থানে বিদেশী দ্রব্য বিক্রয় ত্যাগ করেন। স্থানীয় উৎপাদন— তাঁতের কাপড়, কালি, কলমের নিব, দেশলাই প্রভৃতি কিনতে লোকে আগ্রহী হয় ও লিভারপুলের লবণ ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় বেচাকেনা একরকম বন্ধ হয়ে যায়। বিপিনচন্দ্র পালের উদাত্ত আহ্বানে স্কুল কলেজের ছাত্রেরা দলে দলে বেরিয়ে আসে। ছাত্র ও শিক্ষকদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত না থাকার জন্য সরকারি নির্দেশ বার হলে শ্রীহট্টের জিন্দাবাজারস্থিত জাতীয় বিদ্যালয়ের মত আরো কটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় হবিগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, বানিয়াচঙ্গ ও লাখাইতে। ১৯০৯ সালে হবিগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয়ে এক প্রদর্শনীতে নাইট্রিক অ্যাসিড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরির প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছিল এবং সেখানে লালা লাজপৎ রায়, অরবিন্দ ঘোষ ও অজিত সিংহের প্রতিকৃতি টাঙানো হয়েছিল। শ্রীহট্টের মুসলমানেরা প্রথমদিকে স্বদেশী আন্দোলনে কিছুটা আকৃষ্ট হলেও এ আন্দোলনে ক্রমশঃ হিন্দুধর্মীয় ভাবধারা ও আচার আচরণের অনুপ্রবেশ দেখে সরে যেতে শুরু করেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা এবং গোঁড়া মোল্লাদের প্ররোচনায় তাঁরা প্রভাবিত হন। বিস্ময়ের কথা শ্রীহট্টের মাহিষ্য সমাজ বঙ্গ বিভাগ সমর্থন করেন। সুনামগঞ্জ ও ঢাকা থেকে ইস্তাহার প্রকাশ করে তাঁরা রাজদ্রোহমূলক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তা সত্ত্বেও স্বাদেশিক আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হয় নি---- ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জলসুকার রাজনৈতিক সম্মেলনের সাফল্য জনগণের মনে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করে।

স্বামী দয়ানন্দ (পূর্বনাম গুরুদাস চৌধুরী) শিলচরের কাছে যে অরুণাচল আশ্রম স্থাপন করেছিলেন তাতে রাজদ্রোহের প্রস্তুতি চলছে এবং বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এই অজুহাতে পুলিশ আশ্রম বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করে। দয়ানন্দের শিষ্য মহেন্দ্রনাথ দে 'প্রজাশক্তি' নামে একটি পত্রিকা বার করতেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জুলাই একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে পুলিশ মৌলবীবাজারে জগৎসীতে দয়ানন্দের আশ্রমে আক্রমণ চালায়। সংঘর্ষের সময় পুলিশের গুলিতে মহেন্দ্রনাথ দে নিহত হন; দয়ানন্দকে গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

এই ঘটনার জের সহজে মেটে নি। মৌলবীবাজারের মহকুমা হাকিম মিঃ জি. গর্ডন বিপ্লবীদের আক্রমণের লক্ষ্য হন। ১৯১৩ সালের ২৭ মার্চ রাত্রে এক যুবক তাঁর বাংলোতে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে ঢুকেছিলেন কিন্তু অন্ধকারে কাঁটা তারের বেড়ায় বাধা পেয়ে হাত থেকে বোমা ফসকে পড়ায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। পরে জানা যায় যুবকটির নাম লোকেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ঢাকা অনুশীলন

সমিতির সদস্য। গর্ডনকে তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবে বদলী করা হলেও মে মাসে বিপ্লবীরা আরেকবার তাঁর উপর আক্রমণ চালান— এবার নিহত হয় গর্ডনের চাপরাশি। এর পর গর্ডন চাকরি ছেড়ে স্বদেশে পালিয়ে যান।

বঙ্গবিভাগ রদ হলে শ্রীহট্ট পুনরায় আসামের অঙ্গীভূত হয়।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে শ্রীহট্ট পুনরায় উত্তাল হয়ে ওঠে। ঐ বছর ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর শ্রীহট্ট সহরে সুরমা উপত্যকা রাজনৈতিক সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম। উপস্থিত ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, আক্রাম খাঁ। নভেম্বর মাসে করিমগঞ্জ, জকিগঞ্জ, বীরশ্রী, লাউতা, কুরুয়া, হবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে খিলাফৎ সভা আহূত হয়েছিল। ক্ষীরোদচন্দ্র দেব প্রভৃতি নেতারা অসহযোগ আন্দোলনকে জোরদার করে তোলেন। ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল, মদনমোহন মালব্য, অ্যানি বেসান্ট, জিন্না প্রভৃতি নেতাদের সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জনের আনুকূল্যে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। পরবছর জানুয়ারি মাসে শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের বহু ছাত্র কলেজ ত্যাগ করেন। শ্রীহট্ট মাদ্রাসার অনেক ছাত্রও লেখাপড়া ছেড়ে খিলাফতে যোগ দেন— ২৫ জানুয়ারি এঁরা একটি শোভাযাত্রাও বার করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সংবাদে জেলার চাবাগানগুলিতে কুলিরাও দীর্ঘ দিনের শোষণ থেকে মুক্তি পাবার আশায় আনন্দিত হয়। মে মাসের ২ তারিখে করিমগঞ্জ মহকুমার চরগোলা ও লঙ্গাইর তেরোটি চাবাগানের কুলিরা অকস্মাৎ ধর্মঘট ঘোষণা করে। এরা দলে দলে চাঁদপুর স্টেশন চত্বরে সমবেত হয়, উদ্দেশ্য ছিল পদ্মা পার হয়ে গোয়ালন্দ থেকে ট্রেন ধরে দেশের অভিমুখে রওয়ানা হবে। কিন্তু চাঁদপুর স্টেশনে সমবেত কুলিদের উপর ২১ মে তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নির্দেশে গুর্খা সৈন্যরা নৃশংস অত্যাচার করে। সমগ্র দেশে এনিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

১৯২১ সালের ৪ ও ৫ নভেম্বর দিল্লীতে কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে আইনঅমান্য ও খাজনা বন্ধের আন্দোলন বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুরমা উপত্যকায় খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন প্রবল বেগে চলছিল, কিন্তু দুয়েক জায়গায় কিছু হিংসাত্মক ঘটনার সূত্রপাত হয়। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চৌরিচৌরার ঘটনায় গান্ধীজি অকস্মাৎ সমস্ত আন্দোলন বন্ধ করে দেন।

১৯২১-২২ সালে ছিন্ন কোরাণের মামলা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গোলাপগঞ্জ থানার অধীনে মাইজভাগ গ্রামে পুলিশ মগফুর মিয়া নামক এক ব্যক্তির কোরাণ ছিঁড়ে ফেলেছিল— 'জনশক্তি' পত্রিকায় এই খবর প্রকাশ করায় সম্পাদক সতীশচন্দ্র দেব ও মুদ্রক অনাথবন্ধু দাসকে দন্ডিত করা হয়। বিচারে তাঁরা সসম্মানে মুক্তি পান। বিচারক ছিলেন ন্যায়পরায়ণ জেলা জজ বি. এন. রাও।

১৯২২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কানাইঘাটে পুলিশ একটি জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে। সুরমা উপত্যকার কমিশনার মিঃ ওএবস্টার নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরে কানাইঘাটে পিটুনীপুলিশ বসিয়ে জনসাধারণের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

পুলিশের উৎপীড়ন এসময় প্রচন্ড তালে চলেছিল। জাতীয় বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্যামাচরণ দেব প্রমুখ শত শত নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। অসহযোগের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচারেও সরকার পক্ষ কম কসরৎ করেন নি— এই প্রচারের জন্য শুধু এক বছরে ব্যয়িত হয়েছিল ৪৭৮৩. টাকা। কিন্তু স্থানীয় নেতাদের মধ্যে আমজদ আলী ছাড়া আর কারো সমর্থন তাঁরা জোটাতে পারেন নি।

১৯৩০ সালে শুরু হয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, বসন্তকুমার দাস, হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্ত, নীরেন্দ্রনাথ দেব, ধীরেন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত, শিবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি। লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য ধীরেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত নোয়াখালি অভিমুখে যাত্রা করেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জের জনসাধারণকে নির্দেশ দিলেন যেন চৌকিদারী ট্যাক্স না দেওয়া হয়।

মুরারিচাঁদ কলেজে দ্বারিকানাথ গোস্বামী ও অন্যান্য ক'জন ছাত্র একটি সোস্যালিস্ট চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় কলেজের ছাত্রেরা ক্লাস বর্জন করলে অধ্যক্ষ রবার্টস্ ২৬ জন নেতৃস্থানীয় ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করেন। আসামের তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা কানিংহাম সাহেব ১৯মে তারিখে এক কড়া সার্কুলার পাঠিয়ে বলেন যেসব ছাত্র রাজনীতি করতে চায় তাদের অভিভাবকেরা যেন স্কুল কলেজ থেকে তাদের সরিয়ে নেন এবং অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসে যত ছাত্র পড়ে প্রত্যেকের অভিভাবককে চুক্তিনামায় সই দিতে হবে। স্বভাবতঃই এতে বিক্ষোভ বেড়ে যায়।

৭ মে তারিখে হরতালের ডাক দিয়ে বলা হয় সেদিন ১৪৪ ধারা ভেঙে শোভাযাত্রা বার করা হবে। সেই শোভাযাত্রায় ছিলেন শিবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, বসন্তকুমার দাস, নীরেন্দ্রনাথ দেব, সুরেশচন্দ্র দেব, ধীরেন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি প্রায় পঞ্চাশজন জন নেতা। শোভাযাত্রার উপর আসাম রাইফেল্স্-এর গুর্খা সৈন্যরা সেদিন নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ চালিয়েছিল। সেসময় যে সব উকিল মোক্তার আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন তাঁদের সনদ কেড়ে নেওয়া হয়। আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে কত ব্যক্তি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন বলা শক্ত। একমাত্র হবিগঞ্জ আদালতেই ২৪ জুলাই অবধি ষাট জন জাতীয়তাবাদী কারাদণ্ডে দন্ডিত হন।

গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার পর কোনো কোনো কর্মী ১৯৩২ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পুনরায় শুরু করার চেষ্টা করলেও তা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও বিপ্লবী কার্যক্রম শ্রীহট্টে কতটা অনুসৃত হয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনো বলা সম্ভব নয়। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হেম সেন ও সুশীল সেন দুই ভ্রাতা অল্পবয়সেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। যতদূর সংবাদ পাওয়া যায় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের বিপ্লবী সূর্য সেন ও রাজেন দাস কিছুদিন করিমগঞ্জে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা শিলচর, হাইলাকান্দি, হবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যুগান্তর দলের কার্যক্রম প্রসারের চেষ্টা করেন। অনুশীলন দলের

প্রতুল গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও শ্রীহট্ট কাছাড়ে এসেছিলেন। তাঁরা যুবকদের লাঠিখেলা ছোরা খেলা শেখাতেন। ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের সীমান্তের একটি জনবিরল স্থানে তাঁরা বোমা তৈরির গোপন কারখানা বানাতে চেয়েছিলেন। শ্রীসঙ্ঘের সুধীন নাগ ও অনিল দাস মৌলবীবাজারে তাঁদের সঙ্ঘের শাখা স্থাপন করেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মার্চ ভগৎ সিংহের ফাঁসির পর মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্ররা ভগৎ সিং ও দীনেশ গুপ্তের ছবি নিয়ে শোভাযাত্রা বার করে। শ্রীহট্টে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ যে ক্রমশঃ বাড়ছিল তার প্রমাণ ১৯৩২-৩৩ সালে পঞ্চাশটি বন্দুক চুরি হয়েছিল এবং মৌলবীবাজারে গুদাম ভেঙে কার্তুজ ও গুলি চুরি করার চেষ্টা হয়। স্বদেশী ডাকাতির সংখ্যাও বেড়ে চলে। ১৯৩৩ সালের ১২ জানুয়ারী চারজন বিপ্লবী দিনের বেলা দুই রানারের হেপাজত থেকে পাঁচ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেন। ফেব্রুয়ারি মাসে আর একটি ডাকাতিতে তিন হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। মার্চ মাসে ইটাখলা রেল স্টেশনে মেল ডাকাতি ঘটে। সেপ্টেম্বর মাসে আর একটি মেল ডাকাতিতে নগদ দুহাজার টাকা লুঠ হয়। ৫ ডিসেম্বর কজন সন্ত্রাসবাদী যুবক ৭,৬৮০. টাকা সমেত মেলব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। ৮ ডিসেম্বর আজমিরিগঞ্জ ডাকঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

১৯৩০ সালের পর থেকে বামপন্থী আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ জোরদার হতে থাকে। বিশেষতঃ চা-শ্রমিকদের সংগঠনগুলিতে বামপন্থী কর্মীরা সক্রিয় ছিলেন। বামপন্থী নেতাদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন বীরেশ মিশ্র, চন্দ্রবিনোদ দাস, চিত্তরঞ্জন দাস, অঙ্গিরা শর্মা, লালা শরদিন্দু দে, অচিন্ত্যকুমার ভট্টাচার্য, করুণাসিন্ধু রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, প্রবোধানন্দ কর, জ্যোতির্ময় নন্দী মজুমদার, সত্যব্রত দত্ত, যজ্ঞেশ্বর দাস, শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায় প্রভৃতি।

লীলা রায়ের কর্মক্ষেত্র শ্রীহট্টে না হলেও তিনি শ্রীহট্টের কন্যা এবং এখানকার রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল।

এ প্রসঙ্গে শ্রীহট্টের ছাত্রনেতা সুধাংশু শর্মার কথাও বলতে হয়। তিনি কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

বিচ্ছিন্ন করার দাবি

১৮৭৪ সাল থেকে শ্রীহট্ট আসামের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সুরমা উপত্যকার অধিবাসীদের সঙ্গে আসামবাসীদের সম্পর্ক ক্রমশঃ তিক্ত হচ্ছিল। সরকারি চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে শ্রীহট্টের উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে দ্বার প্রায় রুদ্ধ ছিল। তা সত্ত্বেও অসমীয়া নেতা ও কর্মচারীবৃন্দ শ্রীহট্টবাসীদের আধিপত্য সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ উত্থাপন করে প্রদেশের দুই অংশের মধ্যে এক বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলছিলেন। সত্য বটে, আসামের এক কালের মুখ্যমন্ত্রী সাদুল্লা শ্রীহট্টকে বিযুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু তার প্রধান কারণ ছিল

সুরমা উপত্যকার সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা সরে গেলে আসামের মুসলমানেরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। অবশেষে অসমীয়া নেতারা সুকৌশলে শ্রীহট্ট জেলায় এক গণভোটের আয়োজন করান। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে গণভোটে শ্রীহট্টের পাকিস্থানভুক্তির পক্ষে রায় দেওয়া হয়। ভোটের ব্যবধান ছিল প্রায় ৫২ হাজার। সে অনুসারে করিমগঞ্জের সামান্য একটু অংশ বাদ দিয়ে সমগ্র শ্রীহট্ট জেলা পূর্বপাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়।

শিক্ষাবিস্তার

আধুনিক যুগে শ্রীহট্টের উন্নতির প্রধান কারণ শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শাসনকার্যে ফার্সি ভাষার প্রচলন ছিল; উনিশ শতকেও দীর্ঘদিন ফার্সির চল রয়ে গিয়েছিল, বিশেষতঃ আদালতের কাজে। বিপিনচন্দ্র পালের পিতা উকিল রামচন্দ্র পাল ফার্সিনবীশ ছিলেন। বিপিনচন্দ্র নিজেও শেখ সাদীর পন্দেনামা দিয়ে বিদ্যারম্ভ করেন। তখনো দেশের বিভিন্ন স্থানে ফার্সি শেখানোর সুব্যবস্থা ছিল। বাণিয়াচঙ্গের কমল নারায়ণ বিশ্বাস (জন্ম ১২৩৫ বঙ্গাব্দ) ফার্সি, হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃত ও বাংলায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ বাণিয়াচঙ্গে ফার্সি ভাষা শেখাতেন--- পরে ওখানকার বালিকা বিদ্যালয় ও নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হন।

শ্রীহট্ট ন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক দীননাথ সেন ছিলেন আর একজন ফার্সিবিদ--- তাঁর নাম ছিল মুনশী দীননাথ। আখালিয়ার মুনশী দেবীপ্রসাদ রায় আরবি, ফার্সি, হিন্দি, উর্দু, বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় লিখেছিলেন *Polyglot Grammar*। আখালিয়ার আর এক ফার্সি ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি জয়গোপাল দাস 'বিদ্যোদয়' নামে যে বইখানা লিখেছিলেন বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়ের' পূর্বে ওখানা ছিল শিশুদের জন্য রচিত সর্বোৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক।

দেশের নানা স্থানে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। মৈনার কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী নিজব্যয়ে স্বগ্রামে যে উচ্চশ্রেণীর বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তা ছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়।

ইংরাজি শিক্ষার জন্য লোকের আগ্রহ ছিল, দাবিও বাড়ছিল। প্রথম যুগে ছাত্রদের ইংরাজি শিক্ষার স্পৃহা কত বলশালী ছিল রায়নগরবাসী গোবিন্দ চরণ দাসের (জন্ম ১৮৩৬) জীবন তার উদাহরণ। তিন বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন, নিদারুণ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ঢাকায় পড়াশোনা চালান। সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কিছুকাল ময়মনসিংহে শিক্ষকতা করে শ্রীহট্ট মিশন স্কুলে চলে আসেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টে গভর্ণমেন্ট স্কুল স্থাপিত হলে দুর্গাকুমার বসুকে প্রধান শিক্ষক করা হয় এবং দ্বিতীয় শিক্ষক হন গোবিন্দ চরণ। ইনি এরপর নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপেও কাজ করেন।

শ্রীহট্টে শিক্ষার প্রসারে নবকিশোর সেনের দান অপরিসীম। ইনি পৈল, শ্রীহট্ট সহর ও কলকাতায় লেখাপড়া করেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগে বি. এ. পাশ করেছিলেন। কিছুদিন শ্রীহট্টের মিশনারী স্কুলে কাজ করবার পর শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর অব স্কুলস্ হন। রাজা গিরীশচন্দ্রকে শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী হবার প্রথম সুপরামর্শ দিয়েছিলেন নবকিশোর। তাঁর অন্য সৎকীর্তি শ্রীহট্ট ছাত্রভান্ডার ও সিলেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা।

দুলাল চন্দ্র দেব ছিলেন সেকালে শ্রীহট্টের সর্বপ্রধান আইনজীবি। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এ ও বি. এল. পরীক্ষা পাশ করে দুলালচন্দ্র শ্রীহট্ট সহরে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন ও কালক্রমে সরকারি উকিলের পদ লাভ করেন। রাজা গিরীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর যখন তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল তখন দুলালচন্দ্র সরকারের সাহায্য আদায় করে এই শিক্ষায়তনগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। দুলালচন্দ্র নিজেও এক সময় আইনশিক্ষার্থী ছাত্রদের অধ্যাপনা করে প্লীডারশিপ পরীক্ষা পাশ করতে সাহায্য করেছেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুফতী স্কুল স্থাপিত হয়— এর প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রকাশবাবু নামক এক ব্যক্তি। চার বছর পরে ন্যাশনাল স্কুলের কর্তৃপক্ষ এই স্কুল কিনে নিয়ে নতুন গৃহ প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন প্রধান শিক্ষক হন বিপিনচন্দ্র পাল, তাঁর সহযোগী ছিলেন রাধানাথ চৌধুরী। কিছুকাল পরে বিপিনচন্দ্র কলকাতায় চলে গেলে রাধানাথ একাই স্কুলটি চালান।

শ্রীহট্টে শিক্ষাবিস্তারে রেভারেন্ড প্রাইজের (Pryse) নামোল্লেখ না করলে গুরুতর অন্যায় হবে। তিনি ১৮৫৯ সালে নয়াসড়ক ও শেখঘাটে দুটি এম-ই স্কুল স্থাপন করেন। রেভারেন্ড প্রাইজের স্কুলেই শিক্ষকতা শুরু করেন নবকিশোর সেন ও গোবিন্দচরণ দাস। প্রাইজ সাহেব শিক্ষাবিস্তারকেই জীবনের ব্রত মনে করতেন বলে শেষের দিকে খ্রীষ্টীয় মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। তিনি ভারতীয়দের সঙ্গেই থাকতেন। তাঁর মৃত্যুর পর পারলৌকিক কৃত্যের ব্যয় শ্রীহট্টবাসীরা বহন করেন ও প্রাইজের নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন।

শ্রীহট্ট সহরে একদা YMCA-র একটি শাখা ছিল সত্য, কিন্তু শিক্ষাবিস্তারে রেভারেন্ড প্রাইজের দানের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্তনে যেসব ছাত্র কৃতিত্ব দেখান তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন জয়গোবিন্দ সোম। ইনি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। জয়গোবিন্দ শ্রীহট্টের প্রথম এম. এ.।

উনিশ শতকে খ্যাতনামা যেসব শিক্ষক ছাত্রদের বিদ্যা দান করেছেন, চরিত্র গঠন করেছেন তাঁদের প্রভাব পরবর্তীযুগেও অনুভব করা যেত। বিংশ শতকে বহু স্কুল স্থাপিত হয়— ছাত্রের সংখ্যাও বাড়ে। সাধারণতঃ স্কুলের পাঠ্য বই ছাড়া এই বইগুলি পড়তে তাঁদের উৎসাহ দেওয়া হত— Smile প্রণীত Self-help, Duty, Character; Lord Avebury রচিত Pleasures of Life; Booker T. Washingtor লিখিত Up From Slavery; গারফিল্ডের জীবনী From Log Cabin to White House।

রাজা গিরীশচন্দ্র রায় মাতামহের নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন— বর্তমানে তা রাজার স্কুল নামে সুপরিচিত। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় মুরারিচাঁদ কলেজ। এটি তাঁর জীবনের মহত্তম কীর্তি। এরও আগে থেকে তিনি পরিচালনা করছিলেন 'গিরীশচন্দ্র বঙ্গবিদ্যালয়'। এছাড়া বহু ছাত্রাবাস তাঁর বদান্যতার উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও গিরীশচন্দ্র আজীবন বিদ্যায়তনগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থ যুগিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মুরারিচাঁদ কলেজ সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়।

শ্রীহট্ট জেলায় উচ্চ শিক্ষার জন্য আগ্রহ বাড়তে থাকলে মহকুমা সহরগুলিতেও কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৃতীয় দশকে স্থাপিত হয়েছিল হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজ— এরপর আসে শিলচর গুরুচরণ কলেজ, শ্রীহট্ট মহিলা কলেজ, শ্রীহট্ট মদন মোহন কলেজ, সুনামগঞ্জ কলেজ ও করিমগঞ্জ কলেজ। দেশ বিভাগের পূর্বেই শ্রীহট্টের প্রতিটি মহকুমায় একটি করে কলেজ ছিল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট শহরে যে সরকারি সংস্কৃত কলেজটি স্থাপিত হয়েছিল তার মান ছিল বেশ উঁচু। শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়রূপে শিলচর নর্মাল স্কুলের ঐতিহ্যও প্রাচীন।

মুরারিচাঁদ কলেজ

মুরারিচাঁদ কলেজ কেবল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় ; অর্ধশতাব্দী যাবৎ শ্রীহট্টের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই কলেজ। রাজা গিরীশচন্দ্রেব জীবনতুল্য এই প্রতিষ্ঠান প্রমোদচন্দ্র দত্ত, কামিনীকুমার চন্দ, নলিনীকান্ত রায় দস্তিদার প্রভৃতি দিকপালদের সযত্ন পরিচর্যায় বিশাল মহীরুহের মতো আশ্রয় ছায়া বিস্তার কবে। সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের পূর্বেই এই কলেজে অধ্যক্ষতা করেছেন প্রমদাকুমার বসু এবং অধ্যাপনা করেছেন বিপিনবিহারী গুপ্ত, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাগোবিন্দ ভবানী প্রভৃতি স্বনামধন্য অধ্যাপক। সরকাবি পবিচালনার আওতায় আসার পর অধ্যক্ষ হয়েছেন অপূর্বকুমার দত্ত (কেমব্রিজের বিখ্যাত ছাত্র), ববার্টস্, টমসন, আবুদুল্লাহ আবু সয়ীদ, সতীশচন্দ্র রায় (সবাই আই. ই. এস. পর্যায়ভুক্ত), হর্ষনাথ সেন ও লক্ষ্মীনাথ চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন ইংরাজি সাহিত্যে— সুবেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, শশিমোহন চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী, দিগিন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শশিভূষণ দাস, বাংলায়— নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রাধারমণ দাস, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সংস্কৃতে— বনমালী বেদান্ততীর্থ, নলিনীমোহন শাস্ত্রী, আশুতোষ বিশ্বাস, কুঞ্জলাল দত্ত, শ্রীনাথ শাস্ত্রী, সর্ব্বোপরি পদ্মনাথ সরস্বতী স্বয়ং ; অর্থনীতিতে— দীনেশচন্দ্র দত্ত, গিরীন্দ্র দত্ত ; ইতিহাসে— কিশোরীমোহন গুপ্ত, নিমাইচাঁদ শীল ; গণিতে— সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য, রসিক রঞ্জন দেব ; দর্শনে— সুরেন্দ্রলাল কুণ্ডু ; পদার্থবিদ্যায়— প্রমোদকুমার রাহা, উপেন্দ্রকুমার দত্ত, সুশান্ত নন্দী ; রসায়নে— যতীন্দ্র দত্ত, নরেন্দ্র দেব ; জীববিদ্যায়— হীরালাল চৌধুরী প্রভৃতি। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক সীতানাথ প্রধান এ কলেজে বসে গবেষণা করে ডক্টরেট

পান। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ঋগ্‌বেদের কাল। বিদ্যাবত্তা ও চরিত্র গৌরবে এই অধ্যাপকেরা ছিলেন মুরারিচাঁদ কলেজের মেরুদণ্ডস্বরূপ। পরিতাপের বিষয়, আসাম সরকারের অনুদার ও অদূরদর্শী নীতির ফলে পরবর্তীকালে মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যাপক নিয়োগে যথেষ্ট মান-অবনয়ন ঘটে। সম্প্রদায় বা উপত্যকা বিশেষের যে সকল প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয়েছিল তাঁদের অনেকেই ছিলেন শিক্ষাজগতের কলঙ্ক। এরকম একজন অধ্যাপক নারীহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে আদালত কর্তৃক দণ্ডিতও হয়েছিলেন। অবশ্য মুরাদিচাঁদ কলেজের কৃষ্ণপক্ষের কথা আমাদের বিবেচ্য নয়।

মুরারিচাঁদ কলেজ সহরের বাইরে— অতি রম্য পরিবেশে একটি টিলার উপরে স্থাপিত হয়েছিল। টিলাটির নাম থ্যাকারে টিলা; ঔপন্যাসিক থ্যাকারের পিতামহ একদা এখানে বাস করতেন। কলেজের একজন ছাত্র একটি সুন্দর কলেজ সঙ্গীত রচনা করেছিলেন:

ধন্য মোদের কলেজ; সাবাস মোদের কলেজ,
সুরমা তীরের আমরা মরাল
　　কলেজ মোদের রংমহল,
অন্ধধরার বন্ধ কোঠায়
　　বন্যা আলোর আনব ঢল।
গিরির শিরে শের গিরীশের
　　হায়দরী হাঁক ঐ শোনা যায়,
আয় শ্রীভূমির সবুজ কোলের
　　সবুজ পরাণ আয় ছুটে আয়॥

আশ্চর্যের বিষয় এই গানটিও সাম্প্রদায়িক আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিল।

স্ত্রী শিক্ষা

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে প্রথম নজর দেন শ্রীহট্ট সম্মিলনী। তাঁরা ছাপানো প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে মেয়েদের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেওয়া হত। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মসমাজও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করেন। রাজচন্দ্র চৌধুরী ও তাঁর পত্নী এই ব্যাপারে ছিলেন অগ্রণী। শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরী ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও এটির অবৈতনিক প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হন। পরে তিনি পাতিয়ালা রাজ্যের স্কুল বিভাগে উঁচু পদে নিযুক্ত হন। হেমন্ত কুমারী বাংলা, ইংরাজি ও হিন্দিতে বক্তৃতা দিতে দক্ষ ছিলেন; ১৯০১ সালে কলকাতা থেকে 'অন্তঃপুর' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।

রাজচন্দ্র— হেমন্তকুমারীর মতো শিলচরের শ্যামাচরণ দেবও ছিলেন স্ত্রী শিক্ষা-প্রসারে নিবেদিতপ্রাণ।

শ্রীহট্ট শহরে ওয়েলশ প্রেসবিটেরিয়ান মিশন একটি বালিকা বিদ্যালয় অনেকদিন চালিয়েছিলেন— পরে এটি কিশোরীমোহন বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। হবিগঞ্জ শহরেও মিশনারীদেব পরিচালিত একটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। শ্রীহট্ট সহরের মেয়েদের সরকারী বিদ্যালয়টি শ্রীযুক্তা সুমতি মজুমদার, শ্রীযুক্তা আশালতা খাস্তগীর প্রভৃতি শিক্ষাবিদদেব পরিচালনাগুণে উন্নত শ্রেণীর স্কুলে পবিণত হয়। এই স্কুল থেকে শ্রীমতী কনক পুরকায়স্থ ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় এর আগে কোনো ছাত্রী প্রথম হন নি।

প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার, আখালিয়াবাসী সদয়াচরণ দাসেব কন্যা শ্রীযুক্তা সরোজিনী দাস শ্রীহট্টের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট। ইনি পরে অকস্‌ফোর্ডে লেখাপড়া করেন। মুবারিচাঁদ কলেজ থেকে ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম বি. এ. পাশ করেন অধ্যক্ষ অপূর্বকুমার দত্তের কন্যা শ্রীযুক্তা বীণা দত্ত।

শাস্ত্র চর্চা ও সংস্কৃত ভাষা সেবা

শ্রীহট্টবাসী সুপ্রাচীন কাল থেকে শাস্ত্র চর্চায় অনুরক্ত। সংস্কৃত ভাষার সেবার জন্যও প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন শ্রীহট্টের বহু সুসন্তান। অদ্বৈতাচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, রাজগোবিন্দ সার্বভৌম, বাণীনাথ বিদ্যাসাগর, তারকচন্দ্র কৃতিরত্ন, বীরেশ্বর দন্ডী, রতিকান্ত সিদ্ধান্ত, বলভদ্র ভট্টাচার্য, মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার— এঁরা যাঁরা প্রাচীনকালে সংস্কৃত ভাষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তাঁদেব কথা পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

বর্তমান কালে সংস্কৃত ভাষাব চর্চা কবে শ্রীহট্টের যে সব সুসন্তান ধন্য হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নামোল্লেখ করা যাচ্ছে— আনন্দময় ব্রহ্মচারী, কালীকিশোর তর্করত্ন, কালীকমল কাব্যবিনোদ (পঞ্চখন্ড অনিপণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা), কালীকুমার ভট্টাচার্য, কালীচরণ তর্কবাগীশ, কালীসদয় বিদ্যাভূষণ, কাশীচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি (ডলাগ্রামবাসী), কৈলাসচন্দ্র স্মৃতি-কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, দয়ালকৃষ্ণ তর্কতীর্থ, নবকুমার শাস্ত্রী (কাশী ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা), বিরজানাথ তর্কপঞ্চানন, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, মহেন্দ্রনাথ কাব্য সাংখ্যতীর্থ, রামকমল শাস্ত্রী, রামনাথ বিদ্যারত্ন, সূর্যকুমার তর্কসরস্বতী প্রভৃতি।

একালের চারজন পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন— রামনাথ বিদ্যারত্ন, কালীকিশোর তন্ত্ররত্ন, বিরজানাথ তর্কপঞ্চানন, পদ্মনাথ সরস্বতী।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সম্পর্কসূত্রে পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব বিখ্যাত হন। ইনি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপণ্ডিত। শ্রীহট্টের আরেকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা ব্রত গ্রহণ করেন। ইনি শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, সপ্ততীর্থ।

বাণিয়াচঙ্গের শিবচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন কেবল পাণ্ডিত্যের জন্য নয়। 'শ্রুতিধর' হিসাবেও বিখ্যাত ছিলেন।

সুশ্রুতের টীকাকার সুবিখ্যাত কবিরাজ চক্রপাণি দত্ত শ্রীহট্টে এসেছিলেন এবং তাঁর বংশের একটি শাখা শ্রীহট্টে বসবাস করেন। প্রধানতঃ চক্রপাণির প্রেরণায় এদেশে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। আধুনিক কালে যিনি কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজ বলে পরিগণিত হতেন সেই যোগেন্দ্রনাথ ষড়দর্শনতীর্থের আমল পর্যন্ত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বহু শ্রীহট্টবাসী যশ অর্জন করেছেন।

ধর্মগুরু

শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-ঠাকুরবাণীর দেশে যেসব মহাপুরুষ ধর্মগুরুর জন্ম হয়েছে তাঁদের কথা প্রথম অধ্যায়ে কিছু বলা হয়েছে। নবাবি আমলের শেষভাগে এবং আধুনিকযুগের সূত্রপাতের সময়েও অনেক সাধুমহাত্মার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে।

বাণিয়াচঙ্গের মহাদেব পঞ্চানন ও বেজোড়ার রমানাথ বিশারদ সহপাঠী ছিলেন। কালীসাধক মহাদেব সিদ্ধপুরুষ রূপে বিখ্যাত।

ছাতিআইন গ্রামবাসী রুদ্রদেব ভট্টাচার্য (মুনি গোসাঞি) ত্রিপুরার কসবা কালীবাড়িতে সাধনা করতেন— মহারাজ গঙ্গাধর মাণিক্য তাঁর গুণানুরাগী ছিলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।

শরচ্চন্দ্র তপস্বী (১২৪৬—১৩০৬ বঙ্গাব্দ) কাশীতে অধ্যয়ন শেষে বৃন্দাবনে যোগাভ্যাস করেন। সেখানে তিনি 'শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন।

বামৈ পরগণার সিংহগ্রামবাসী ভোলানাথ শিরোমণি কালীঘাটে মায়ের বাড়িতে থাকতেন এবং সিদ্ধপুরুষরূপে সবার শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন।

ইটা পরগণার ক্ষেমসহস্র গ্রামবাসী হরিবল্লভ করের পুত্র দুর্গাপ্রসাদ (জন্ম ১৮৫১) সহপাঠী নিত্যানন্দের জননী মনোমোহিনীকে মনে মনে গুরুরূপে বরণ করে বাড়িতে বসে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। 'দুর্গাসাধু' নামে তিনি বিখ্যাত। তাঁদের পারিবারিক ব্যবসায় ছিল ধাতুর বাসন তৈরী করা। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাপ্রসাদের মৃত্যু হয়।

ব্রহ্মানন্দ পুরী শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ না করলেও শ্রীহট্ট তাঁর সাধনক্ষেত্র। তিনি বাণিয়াচঙ্গে বাস করতেন।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য দুলালীর তিলকরাম গুপ্তের কাছে দীক্ষিত হয়ে সহজধর্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

বেগমপুরের পশ্চিমে বাণাই হাওরের ঠিক পূর্বতটে হিজল গাছের একটি কুঞ্জ ছিল। এখানে পাঁচজন পীর লোকহিতার্থ মোকাম স্থাপন করেন— এর নাম পাঁচ পীরের মোকাম। হাওরে পথভ্রান্ত মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য এঁরা সারারাত দুটি অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে রাখতেন। পাঁচ পীরের অন্যতম হারু দরবেশ প্রথম জীবনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চাকরান্‌ভোগী বেহারা ছিলেন।

শক্তি সাধনায় খ্যাতিমান সাধক মহাদেব পঞ্চানন, ইটার রঘুদেব ভট্টাচার্য, বুরুঙ্গার উমাকান্ত বিশারদ, পঞ্চখণ্ডের মধুসূদন ভট্টাচার্য ও নর্তনের কামদেব চক্রবর্তীর মতো 'দেবীযুদ্ধ' প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চৌধুরীও ছিলেন উচ্চস্তরের সাধক।

জনশ্রুতি এই, প্রসিদ্ধ যোগীসাধক তিব্বতীবাবা (পূর্বনাম নবীন কিশোর চক্রবর্তী) শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। লোকের বিশ্বাস তিনি প্রায় তিনশ বছর জীবিত ছিলেন। ইনি তিব্বতে পরমানন্দ ঠক্কর নামক মহাপুরুষের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে দীর্ঘকাল তিব্বতে বাস করেন। এরপর প্রায় ছয় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে চীন, মঙ্গোলিয়া ও সাইবেরিয়া ভ্রমণ করে আসেন। প্রত্যাবর্তন কালে তিনি কিছুকাল ব্রহ্মদেশে অবস্থান করেছিলেন। ভারতে ফিরে প্রথম দিকে তিনি মাদ্রাজ অঞ্চলে ছিলেন, ওখানে বহু ব্যক্তিকে তিনি দীক্ষা দেন। তিব্বতীবাবা উৎকট রোগ থেকে অনেককে মুক্ত করেছেন তাঁর নিজস্ব চিকিৎসা প্রণালীতে। এজন্য তাঁর কাছে বিস্তর জনসমাগম হতো। হাওড়ায় তাঁর দ্বারা স্থাপিত 'বেদান্ত আশ্রম' বিদ্যমান।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরো একজন শ্রীহট্টবাসী ধর্মগুরু সর্বভারতীয় মর্যাদা লাভ করেন। ইনি সন্তদাস বাবাজী মহারাজ। এঁর পূর্বাশ্রমের নাম তারাকিশোর চৌধুরী। ছাত্রজীবনে কলকাতায় ইনি বিপিনচন্দ্র পাল ও সুন্দরীমোহন দাসের সমসাময়িক ছিলেন। ওকালতি ব্যবসায়ে প্রভূত বিত্তলাভ করলেও অতৃপ্ত তারাকিশোর সংসার ত্যাগ করেন।

আধুনিককালে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুমন্ডলীতে বেশ কজন শ্রীহট্টবাসীকে দেখা যায়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী অব্যক্তানন্দ, স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী প্রেমেশানন্দ (ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য), স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী চণ্ডিকানন্দ, স্বামী জগদানন্দ, স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী বামদেবানন্দ, স্বামী বিযুক্তানন্দ, স্বামী সৌম্যানন্দ, স্বামী শিবরামানন্দ, স্বামী স্বাহানন্দ প্রভৃতি।

তীর্থ ও দেবস্থান

শ্রীহট্টের প্রাচীন তীর্থ ও দেবস্থান সমূহ— গোটাটিকরের গ্রীবা মহাপীঠ, ফালজোরে বামজঙ্ঘা মহাপীঠ, লাউড়ের পাহাড়ে পণাতীর্থ, উত্তরাঞ্চলে শ্রীশ্রী জৈন্তেশ্বরী দেবীর মন্দির

ও রূপনাথ শিব, রামেশ্বর শিব, আদম আইল পাহাড়ে মাধবকুন্ড ও গঙ্গাধর শিব, কাছাড় সীমান্তে সিদ্ধেশ্বর শিব, শ্রীমঙ্গলে নির্মাই শিব, চুণারুঘাটে তুঙ্গনাথ শিব, চূড়খাইয়ে হাটকেশ্বর শিব, ঢাকাদক্ষিণে মহাপ্রভুর বাড়ি, বিশ্বনাথ থানার বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবরায়ের পাট, নবিগঞ্জ থানার শতকে ঠাকুরবাণীর পাট, শ্রীহট্ট সহরের প্রান্তে যুগলটিলার আখড়া, আজমিরিগঞ্জ থানায় বিথঙ্গলের আখড়া, পঞ্চখন্ড ও জগন্নাথপুরের বাসুদেব মন্দির প্রভৃতি নতুন কালেও ভক্তি ও শ্রদ্ধার কেন্দ্ররূপে জনপ্রিয়।

আধুনিককালে শিলচর শহরের প্রান্তে অরুণাচল আশ্রমটি খ্যাতিলাভ করেছে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা যায় প্রাচীনকালে আরো কটি প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল। ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রশাসন পাঠে অনুমিত হয় পঞ্চখন্ড এলাকায় একটি বিখ্যাত দেবালয় ছিল। শ্রীমঙ্গল এলাকায় প্রাপ্ত রাজা মরুন্ডনাথের খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় ওইখানে 'অটবীক্ষেত্রে অনন্ত নারায়ণ দেবতার বলিচরু সত্রের জন্য' তিনি বিস্তর ভূমি দান করেছিলেন।

শ্রীহট্ট সহরে আম্বরখানার মহল্লার রাজারামের দীঘি থেকে একটি অতি প্রাচীন ও সুন্দর ত্রিবিক্রম মূর্তি উদ্ধার করা হয়। মূর্তিটি কালীঘাট মহল্লার নরসিংহজিউর মন্দিরে রক্ষিত। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট শহরের প্রান্তে রায়নগরের পথে ফরহাদ খাঁর পুলটি ভাঙবার সময় তার নিচের অংশ খনন করে তিন ফুট উঁচু একটি চমৎকার কষ্টিপাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে।

সমাজ সংস্কার ও সেবা

উনিশ শতকের নবজাগরণের সঙ্গে সমাজ সংস্কারের প্রেরণা অনিবার্যভাবে দেশে দেখা দিয়েছিল। বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, রাধানাথ চৌধুরী, প্যারীচরণ দাস প্রভৃতি যেমন প্রত্যক্ষভাবে সমাজ সংস্কার কার্যে হাত দিয়েছিলেন তেমনি রাজা গিরীশচন্দ্র রায়, নবকিশোর সেন, দুলালচন্দ্র দেব, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি নেতারা শিক্ষার দ্বারা জাতির মেরুদন্ড গঠনে সচেষ্ট হন। শতবর্ষপূর্বে ব্রাহ্মসমাজের যে প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল শ্রীহট্টেও তার প্রভাব অনুভূত হয়। বিপিনচন্দ্র, সুন্দরীমোহন, তারাকিশোর, রমাকান্ত রায়, সীতানাথ দত্ত— এঁদের উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ছিল। পরবর্তী যুগে রাজচন্দ্র চৌধুরী ও মহিমচন্দ্র চৌধুরী এবং গোবিন্দনারায়ণ সিংহের পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধাররূপে নানা সমাজসেবামূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। হিন্দু সমাজে রামকৃষ্ণ মিশন বিংশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই উল্লেখনীয় রূপে কাজ করে আসছেন। শ্রীহট্ট সম্মিলনী ও সিলেট অ্যাসোসিয়েশন— সমাজ সেবায় এ দুটি প্রতিষ্ঠানের দান অল্প নয়।

গত দুশো বছরে শ্রীহট্ট বহুবার বন্যার কবলে পড়েছে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এক ভয়াবহ বন্যায় শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা প্লাবিত হয়। জেলা রিলিফ কমিটির কাজে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ দেব প্রমুখ নেতারা অগ্রণী হন। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ডেপুটি কমিশনার জে. এ. ডসনও সুনাম অর্জন করেন।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন কামিনীকুমার চন্দ, প্রমোদচন্দ্র দত্ত, সুখময় চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, সারদা চরণ শ্যাম, বসন্তকুমার দাস, সতীশচন্দ্র দত্ত, শশীন্দ্র সিংহ, হেমচন্দ্র দত্ত, শ্রীশচন্দ্র দত্ত, ধর্মদাস দত্ত, হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, নগেন্দ্র নাথ চৌধুরী, মোহাম্মদ বখৎ মজুমদার, আলী আমজাদ খাঁ, মৌলবী আবদুল করিম, সৈয়দ আবদুল মজিদ, আবদুল মতিন চৌধুরী, সতীশ চন্দ্র দেব, শিবেন্দ্র বিশ্বাস, ভুবন মোহন বিদ্যার্ণব।

নবযুগের হিন্দু সমাজ

শ্রীহট্ট, কাছাড়, জয়ন্তীয়ায় ইংরাজ শাসন বিস্তৃত হবার সুফল হিন্দু সমাজ প্রথম থেকেই ভোগ করেছেন। আইন শৃঙ্খলার উন্নতি, ন্যায়বিচারের প্রবর্তন, বাঁধ ও পথঘাট নির্মাণ, ব্যবসাবাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষাবিস্তার, টেলিগ্রাফের প্রচলন, ডাকের সুব্যবস্থা, রেলওয়ে স্টিমারের নিয়মিত যাত্রা, বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কালে ত্রাণ ব্যবস্থা, পত্রপত্রিকাদির প্রচার— ইংরাজ শাসনের অনুসঙ্গী এই সুবিধাগুলি শ্রীহট্টের হিন্দু অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় গভীর ছাপ ফেলে। ঘরবাড়ি নির্মাণ, আহার বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ সর্বক্ষেত্রে ইংরাজের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। শ্রীহট্টের ঘরবাড়ি বরাবরই বাঁশ ও ছনের তৈরী, ধনী ব্যক্তিরা কদাচিৎ 'লাদাউ' দালান বানাতেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে এসব দালানকোঠাও ভেঙে পড়ে। ইংরাজেরা ঢেউটিন ও বাঁশের বা নলখাগড়ার বেড়ার উপর প্লাষ্টার করা দেয়াল দিয়ে বাংলো ধরনের যেসব গৃহ নির্মাণ করাতেন তা ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এগুলি সুদৃশ্য ও আরামপ্রদ। পোষাক পরিচ্ছদেও চোগাচাপকান পাগড়ির স্থান নেয় স্যুট। শ্রীহট্টের হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ শাসিত এবং কিছুটা রক্ষণশীল, তবু পাশ্চত্ত্য প্রভাব তাঁরা পুরোপুরি অঙ্গীকার করেছিলেন। শ্রীহট্টে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে— অথচ ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক সর্বব্যাপ্ত। বিপিনচন্দ্র পালের আত্মচরিত 'সত্তর বৎসর' নবযুগের হিন্দু সমাজের পরিবর্তমান রূপটির উৎকৃষ্ট আলেখ্য।

একটি সুসভ্য সমাজে উন্নতির পরিমাপ করা হয় নারী জাতির মর্যাদা দিয়ে। মধ্যযুগেও শ্রীহট্টে হিন্দু নারীদের মধ্যে বিদুষী বুদ্ধিমতী মহিলার অভাব ছিল না। উনিশ শতকে নারীদের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটে। সৈয়দ মূর্তাজা আলী তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন তাঁদের গ্রাম ঢেউপাশায় বসুপরিবারের এক বিধবা কন্যা জাম্ববতী দেবী গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেন। মহিলা সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয় পণ্ডিতা রমাবাই এর আগমনের ফলে। অসামান্য বিদুষী নিঃসঙ্কোচ এই মারাঠী মহিলা শ্রীহট্টবাসীকে বিবাহ করে শ্রীহট্টে বাস করায় তাঁর পূতজীবনের প্রভাব মহিলাদের উপর পড়েছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হেমন্ত কুমারী চৌধুরাণী প্রভৃতি কৃতী মহিলারাও আদর্শস্বরূপ ছিলেন। হিন্দু সমাজের প্রভূত উন্নতির মূলে একটি কারণ নারীজাগরণ।

শ্রীহট্টের উচ্চশিক্ষিত হিন্দুরা সহজেই সেসময় উচ্চপদ অধিকার করেছেন। যোগ্যতার গুণে তাঁরা আসাম প্রদেশের শাসন বিভাগে প্রধান স্থান গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আয়কর বিভাগ, ডাক বিভাগ, সার্ভে বিভাগ, একাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিস প্রভৃতি কর্মস্থানে তাঁরা সুনাম অর্জন করেন। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ, ইনজিনিয়ার, অধ্যাপক, শিক্ষক, ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক— সবরকম বৃত্তি তাঁরা গ্রহণ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। আসামের অন্তর্ভুক্ত হবার কালে শ্রীহট্টবাসীর একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায় শিলং। খাসিয়া পাহাড়ের যে পথ ধরে নির্দয় অত্যাচারীদের অভিযান চালানো হত চেরাপুঞ্জীর সেই পথ ধরেই তাঁরা শিলঙ যাতায়াতের প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করেন।

যাঁরা স্বাধীন জীবিকা অর্জন করতে চাইতেন তাঁদের কাছে ওকালতি ছিল সবচেয়ে আকর্ষক। শ্রীহট্টের হিন্দু সমাজে বর্তমান যুগের তৃতীয় দশক পর্যন্ত নেতৃস্থানীয় ছিলেন উকিলেরা। বার লাইব্রেরিগুলি ছিল সহরের বিশিষ্টতম ব্যক্তিদের মিলন স্থল, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

ইংরাজের চাকুরি স্বীকার করলেও এদেশে স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হতে সময় নেয় নি। বিপিনচন্দ্র পালের মতো মনীষী শ্রীহট্টে নতুন স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা সঞ্চার করেন। সুন্দরীমোহন, রাধানাথ প্যারীচরণ সে প্রেরণাকে ফলবতী করেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেশবাসীরা স্বাধীনভাবে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করতে থাকেন। শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর দেবীযুদ্ধ সেই স্বাধীনতা প্রিয়তার জ্বলন্ত শিখা। এসব পত্রপত্রিকা মুদ্রণের জন্য উনিশ শতকের মধ্যেই জেলার সর্বত্র বহু প্রেস গড়ে ওঠে।

প্রথম মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত শ্রীহট্টের হিন্দুদের সম্প্রসারণের কাল।

একালের মুসলিম সমাজ

ইংরাজ আগমনের পূর্ব থেকেই মুসলমান শাসকদের শক্তি ক্ষয়িত হচ্ছিল। শ্রীহট্টে ইংরাজেরা বিনাবাধায় ক্ষমতা দখল করেছিলেন। মুসলমান সমাজে ইংরাজের আধিপত্যের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ছিল ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে মোহরমের হাঙ্গামায় তার বিস্ফোরণ ঘটলেও লিন্ডসে কঠোর হাতে তা দমন করেছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে আর কখনো বিদ্রোহের ইচ্ছা জাগে নি— সিপাহী যুদ্ধের সময়েও তাঁরা ইংরাজের পক্ষাবলম্বী ছিলেন।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগেও মুসলমান সমাজে ফার্সি শিক্ষার প্রচলন ছিল, যদিও ফার্সি বিদ্যায় হিন্দুরা তাঁদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মুসলমান সমাজে ইংরাজি বিদ্যা ও উচ্চশিক্ষার জন্য আগ্রহ জন্মায়। মুফতী নুরুদ্দীন আহমেদ দরগাহ মহল্লায় স্কুল স্থাপন করেন। এ স্কুল পরে ন্যাশনাল স্কুলের কর্তৃপক্ষ কিনে নেন। সে সময় সরকারি স্কুল স্থাপিত হয়েছে, ওটি ছিল মনারায়ের টিলায়। অধিকাংশ মুসলমান ছাত্র ওই স্কুলেই লেখাপড়া করতো।

জালালপুরের মৌলবী মোহাম্মদ দাইম ১৮৬৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন। তিনি শ্রীহট্টের প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট।

মুসলমান মহিলাদের স্কুলে পড়ার সুযোগ না থাকলেও বাড়িতে অনেকেই লেখাপড়া শিখেছিলেন। সাধারণ শিক্ষিতারা 'কাছাছোল আম্বিয়া' জাতীয় ধর্মমূলক গ্রন্থাদি পড়তেন। উচ্চশিক্ষিতেরা পছন্দ করতেন মীর মশাররফ হোসেনের বই, ইসমাইল হোসেন শিরাজীর 'প্রেমাঞ্জলি' 'ঈশাখাঁ', 'রায়নন্দিনী', 'ইদ্রিস আলীর 'বঙ্কিম দুহিতা', খায়রুন্নেসা খাতুনের 'সতীর পতিভক্তি', বেগম সারা তৈফুরের 'স্বর্গের জ্যোতি'।

সৈয়দ মূর্তাজা আলী তাঁর আত্মজীবনী 'আমাদের কালের কথায়' বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের সুন্দর চিত্র এঁকেছেন।

শ্রীহট্টে তখনো কিছু বিদেশী মুসলমান পরিবার ছিল— এঁরা ছিলেন নামজাদা ব্যবসায়ী। আগা আবদুর রহমান, আগা আবদুল ওহাব, আগা খুদাবরদী, উকিল কাশিম আলী এঁরা হাতির ব্যবসা করতেন। শ্রীহট্টের হাতী নিয়ে বিক্রয় করতেন ছত্তরপুরের মেলায়। এঁদের পরিবার উর্দুভাষী ছিল। কিন্তু শ্রীহট্টের অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙালী মুসলমান পরিবারও নিজেদের মধ্যে উর্দুতে কথাবার্তা বলতেন। মজুমদার পরিবারের মহিলারাও উর্দুতে দক্ষ ছিলেন। সৈয়দ মূর্তাজা আলী বলেছেন অনেক হিন্দুও উর্দু ভালো জানতেন—রাজা গিরীশচন্দ্র রায় ও খাজাঞ্চি বাড়ির লোকনাথ শর্মা তাঁর সঙ্গে উর্দুতে আলাপ করেন। বিবাহ আসরে উর্দুতে কথাবার্তা বলা ছিল আদবকায়দা সম্মত।

মুসলমান মহিলাদের মধ্যে উলবোনা এবং সেলাইর প্রচলন ছিল। সৈয়দ মূর্তাজা আলীর মা 'উলের উপরে কাজ করে গাছ ময়ূর কুকুর ইত্যাদির ছবি আঁকতেন। 'তবে জীবজন্তুর ছবিতে মাথা কিংবা অন্য কোনো অঙ্গ বাদ দেওয়া হত। আম্মা বলতেন, পূর্ণাংগ জানদার ছবি আঁকা গোনাহ।'

মুসলমান পরিবারগুলির মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ছিলেন সুপ্রাচীন মজুমদার বংশ। এই পরিবারের কর্তা মোহাম্মদ বখৎ মজুমদারকে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কানুনগো নিযুক্ত করা হয়। ইনিই শ্রীহট্টের শেষ কানুনগো। মীর খাঁ থেকে বখৎ মজুমদার পর্যন্ত একটানা ৩৩৩ বছর এই বংশ সদর কানুনগো পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন আলী আমজাদ খাঁ, খানবাহাদুর সৈয়দ আবদুল মজিদ, খানবাহাদুর এহিয়া (জিতুমিয়া) বাণিয়াচঙ্গের জমিদার বংশ, পৃথিমপাশার জমিদার বংশ, দুহালিয়ার দেওয়ান বংশ, লক্ষ্মণশ্রীর দেওয়ান বংশ প্রভৃতি খ্যাতিমান পরিবার।

শ্রীহট্টের গজনফর আলী শ্রীহট্টবাসীদের মধ্যে প্রথম আই.সি.এস. হয়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করেন। আবদুর রসিদ ব্যবস্থাপক সভায় গৌরবজনক পদ অলঙ্কৃত করেন—এঁদের পরিবারও ছিল খুব সম্ভ্রান্ত।

উকিলদের মধ্যে মুসলমান ছিলেন খুব অল্প। নাম করেছিলেন খানবাহাদুর মসদ্দর আলী ও খানবাহাদুর আমজদ আলী। এঁরা কেউই গ্রাজুয়েট ছিলেন না।

সৈয়দ মূর্তাজা আলী বলেছেন— 'তখনকার দিনে মহকুমা শহরে "আন্‌জুমানে ইসলামিয়া" নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের জীবনী শক্তির কোন প্রমাণ পাওয়া যেত না। তবে শহরে উচ্চরাজকর্মচারী এলে এই প্রতিষ্ঠানের নিদ্রিত কর্মকর্তারা জাগরিত হতেন।

আচকান পায়জামা ও তুর্কী টুপি পরে চোখে সুর্মা লাগিয়ে ডেপুটেশনের সদস্যরা দরবার করতেন। তাঁদের দাবি ছিল 'মুসলমানদেব জন্য সরকারি চাকরি, মুসলমান উচ্চতর কর্মচারীব পোষ্টিং, ছাত্রদের হোস্টেল ও বৃত্তির বন্দোবস্ত। রাজভক্তির সবিস্তর ভূমিকা সহযোগে অশেষ সম্মান পুরঃসর এই সকল নিবেদন পত্র পেশ করা হত।'

ই. এল. কেম্প নামক এক ইংরাজ ভদ্রলোক শ্রীহট্টে পুলিশ ইনস্‌পেকটর ছিলেন। ইনি স্বেচ্ছায় মুসলমান হন— তখন তাঁর নাম হয় আজিজুর রহমান। চাকবি থেকে অবসর নিয়ে তিনি কুশীয়ারা তীরে জকিগঞ্জে বাস করতেন।

কয়েকটি বৃত্তিতে ছিল সাধারণ মুসলমানদেব অবিসংবাদিত প্রাধান্য, যেমন— রাজমিস্ত্রি, দরজি, জেলের বৃত্তি, দপ্তরীব কাজ, ছাতার বাঁট তৈরি ইত্যাদি। জেলেদের বলা হতো মাহিমাল। শ্রীহট্ট জেলায় অভিজাত সৈয়দ ও কুরেশীদের বাদ দিলে অধিকাংশই শেখ। শেখরা কিন্তু মাহিমালদের সঙ্গে "সামাজিকভাবে মেলামেশা করেন না"।

শ্রীহট্টে হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক করার সরকারি ভেদ নীতির কুফল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশেষ দেখা যায় নি। মৌলবীবাজার শহরে ১৯১৬ সালে সুরমা উপত্যকা সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হয়। এ অনুষ্ঠানে ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করা হয় সরকার থেকে। কিন্তু হিন্দু ছাত্রদের মতো মুসলমান ছাত্ররাও দলে দলে যোগ দেন। ১৯২০ সালে শ্রীহট্ট সহরে রতনমণি লোকনাথ টাউন হলে সুরমা উপত্যকা রাজনৈতিক সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইনসপেকটর আবদুল করিম। সৈয়দ মূর্তাজা আলী ঠিকই বলেছেন— 'এই সময়টা ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলনের যুগ'।

সাধারণ মুসলমান ছাত্রেরা নিজেদের সামাজিক জীবনে আনন্দ উৎসবের অভাবে কিছুটা ক্লিষ্ট বোধ করতেন। স্কুলে সরস্বতী পূজায় তাঁরা যোগ না দিলেও দূব থেকে লক্ষ করতেন। 'শ্রাবণের সংক্রান্তি দিনে ও উৎসব উপলক্ষে সুরমা নদীতে নৌকা বাইচ হত।....মনসাপূজা উপলক্ষে নৌকা দৌড় হত— এই অজুহাতে মোল্লা মৌলবীরা নৌকাদৌড়কে সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু ভাটি অঞ্চলের এই জনপ্রিয় আনন্দ উৎসবের ক্রীড়ামোদীরা মৌলানা মৌলবীদের ভ্রূকুটি গ্রাহ্য করত না।'

এটা গভীর দুঃখের বিষয় যে ১৯৩০ সালের পর থেকে হিন্দু-মুসলমানের এই প্রীতির বন্ধনে ফাটল ধরাতে সক্ষম হলেন কয়েকজন হীনমনা রাজনীতিবিদ।

খ্রীষ্টান সমাজ

শ্রীহট্টে খ্রীষ্টানের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বুন্দাশিলের কেল্লায় যে পোর্তুগীজ গোলন্দাজরা মোতায়েন হয়েছিল তারাই শ্রীহট্টের প্রথম খ্রীষ্টান অধিবাসী। উনিশ শতকে কালীঘাট মহল্লায় কিছু ফিরিঙ্গির বাস ছিল। ওয়েলশ প্রেসবিটেরিয়ান মিশন ও আরো দুয়েকটি খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠান শ্রীহট্ট ও অন্যান্য মফঃস্বল শহরে কাজ কবতো।

মণিপুরী সমাজ

মণিপুবীবা অষ্টাদশ শতকে কাছাড়ে উপনিবিষ্ট হন। কাছাড় রাজ ও মণিপুবপতিব মধ্যে কয়েকবাব যুদ্ধ হযেছিল--- তখন থেকে তাঁরা কাছাড়েব অধিবাসী। কাছাড়রাজ গোবিন্দচন্দ্রেব সেনাপতি ছিলেন গম্ভীব সিংহ। ইনি পবে মণিপুবেব রাজা হন। ব্রহ্মরাজেব সৈন্যদল মণিপুব অধিকার করলে গম্ভীব সিংহ সদলবলে শ্রীহট্টে চলে আসেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেবা ব্রহ্ম সরকাবেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবাজ পরাজিত হয়ে সন্ধি কবতে বাধ্য হন; গম্ভীর সিংহ মণিপুরেব সিংহাসন লাভ করেন। মধ্যবর্তী সময়ে তিনি যখন শ্রীহট্টে ছিলেন তাঁব সহায়তায় ইংরাজেবা খাসিয়াদেব দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গম্ভীর সিংহ শ্রীহট্ট ত্যাগ করলেও বহু মণিপুবী এদেশে থেকে যান। গম্ভীর সিংহ যেখানে বাস করতেন সেই এলাকার নাম 'মণিপুরী রাজবাড়ি'। সাতানব্বই খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে সে বাড়ি ভেঙে পড়ে। মণিপুরী রাজবাড়ি ছাড়া মাছিমপুর মহল্লায় মণিপুরীদের একটি বিরাট পল্লী গড়ে ওঠে। উপনিবিষ্ট মণিপুবী সমাজ বাঙালীদের পাশাপাশি বসবাসের ফলে বহুকাল থেকে বাঙলা ভাষার চর্চা করছেন। ওদের নিজস্ব ভাষাও বদলে গিয়ে 'বিষ্ণুপুরীয়া' ভাষায় দাঁড়ায়।

মণিপুবীদের নিজস্ব একটি সাংস্কৃতিক জীবন ছিল; বাঙালী জীবনে তার প্রভাবও অল্প নয়। মণিপুরী নৃত্য, রাসোৎসব প্রভৃতি বাঙালীদের সুপরিচিত। শ্রীহট্টের বথযাত্রায় মণিপুরীদের একটি মর্যাদাপূর্ণ আসন ছিল।

শ্রীহট্টবাসী মণিপুবীদের মধ্যে তনুসিংহ সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি-এ পাশ করে আসাম সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ম গ্রহণ করেন। সোনামণি সিংহ সংস্কৃত ও বাংলা উভয় বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পাশ করেন। শ্রীহট্টবাসী অনেক মণিপুরী ছাত্র পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। প্রখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা ইরাবৎ সিংহেব ভ্রাতুষ্পুত্র রণবীর সিংহ মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করেন।

সমরজিৎ সিংহ 'মণিপুরী' নামে বাংলা ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন স্বসমাজের মুখপত্র রূপে।

১৯০০ খ্রী. ভানুবিলের মণিপুরী প্রজাবিদ্রোহ এই শতাব্দীর একটি স্মরণীয় ঘটনা। হাজার হাজার মণিপুরী প্রজা ক্ষিপ্ত হয়ে জমিদার আমজদ আলী খাঁর কর্মচারী রাসবিহারী দাস ও নঈম উল্লা পাট্টাদারকে হত্যা করে। এই মামলা উপলক্ষে কমিনীকুমার চন্দ খ্যাতিমান হন।

শিক্ষায় বিদেশীয়দের দান

শ্রীহট্টে শিক্ষাবিস্তারে রেভারেন্ড প্রাইজের দানের কথা বলা হয়েছে। খ্রীষ্টান মিশনগুলির সেবাব্রতীরা অনেকেই বাংলা ভাষার চর্চা করতেন। এঁদের মধ্যে একটি মহিলার কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। মিস হেলেন জে. রাউল্যান্ডস্ ছিলেন কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক আরকুহার্ট সাহেবের নিকট আত্মীয়া। মিস রাউল্যান্ডস্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পেয়েছিলেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীজীবন বিষয়ে গবেষণা করে। ইনি করিমগঞ্জ কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন।

অর্থনৈতিক উন্নতি

প্রাচীনকাল থেকে শ্রীহট্ট সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল— 'আইন-ই-আকবরি' প্রভৃতি গ্রন্থে তা বলা হয়েছে। শ্রীহট্ট থেকে প্রচুর দ্রব্য রপ্তানি হতো। আধুনিক যুগের গোড়াতে এই রপ্তানি বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল— কাঠ, বড়নৌকা, কমলা, চূণ, শুকনো মাছ, হাতী, তেজপাতা ইত্যাদি। শ্রীহট্টের প্রথম রেসিডেন্ট থ্যাকারে সাহেব হাতীর ব্যবসা করে প্রচুর অর্থার্জন করেন। উনিশ শতকের শেষেও সিলেটে হাতী ব্যবসায়ী ভিন্ন প্রদেশবাসী মুসলমানের বাস ছিল। চূণের ব্যবসায় ছিল আরো লাভজনক। লিন্ডসে সাহেব চূণের কারবারে ধনী হয়ে উঠে যে পথ দেখিয়েছিলেন সে পথ ধরে ইংলিস কোম্পানী প্রায় একশ বছর একচেটিয়া রাজত্ব করেন। ইংলিশ কোম্পানীর সমৃদ্ধির ফলে এদেশের অধিবাসীরাও আর্থিক উন্নতির স্বাদ পান। কমলালেবুর ব্যবসাও ক্রমে বাড়ছিল; সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে অগুরু, পান, মধু বাঁশ, ছাতার বাঁট প্রভৃতি রপ্তানি। ত্রিপুরার কাঠের প্রধান বাজার ছিল শ্রীহট্টে। আশপাশের পাহাড় থেকে প্রচুর কাঠ পাওয়া যেত বলে শ্রীহট্ট সহরে এবং করিমগঞ্জের কাছে ভাঙ্গাবাজারে অনেকগুলি স-মিল গড়ে ওঠে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে শ্রীহট্টের বৈষয়িক জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনে চা-বাগানগুলি। দেশীয় পুঁজিপতিরা এই নতুন ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করতে থাকেন। ইন্দেশ্বর টি অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানী, কাছাড় নেটিভ জয়েন্ট স্টক কোম্পানী, হিন্দুস্থান টি অ্যান্ড ফিসারিজ,

ভারতসমিতি, অল ইন্ডিয়া টি অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানী, কালীশাসন টি কোম্পানী— এগুলি ছিল যৌথ উদ্যোগে গড়া বড় প্রতিষ্ঠান। বিদেশী কোম্পানীগুলির সঙ্গে এরা পাল্লা দিত। ব্যক্তিগত মালিকানায় চা-বাগান পরিচালনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র শ্যাম, দ্বীপেন্দ্র চৌধুরী ও আমিনুর রশিদ চৌধুরী।

শ্রীহট্টে বৃহদায়তন শিল্প বিশেষ ছিল না। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ছাতকে যে সিমেন্ট কারখানা স্থাপিত হয় এটি তার মধ্যে ছিল বৃহত্তম। (দেশ-বিভাগের পরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সদ্ব্যবহার করে ফেঁচুগঞ্জে একটি বড় সার কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে।)

জেলায় অনেকগুলি ছোটখাট ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান ছিল— দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে অবশ্য অনেকগুলি বিলুপ্ত হয়। এ প্রসঙ্গে হবিগঞ্জের বাজুকা গ্রামের মথুরানাথ ভট্টাচার্যের নামোল্লেখ করা উচিত। ইনি সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন, ব্যাকরণ ও স্মৃতি পড়েছিলেন। কবির দলে গানও বাধতে পারতেন। কিন্তু সংসারের পীড়নে তাঁকে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হতে হয়। 'তিনি গ্রামে যৌথ কারবারে লোন কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত করেন ও প্রায় পঞ্চাশ বছরকাল তা দক্ষতাব সঙ্গে পরিচালিত করেছিলেন'।

একটি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান 'আর্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী' শ্রীহট্টে জন্ম নেয়, পরে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়ে প্রভূত উন্নতি করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে শ্রীহট্ট জেলায় ভূমির দখলকারীদের সঙ্গে সরাসবি বন্দোবস্ত হওযাব ফলে প্রচুর মহালের জন্ম হয়েছিল। বাংলা দেশে শুধুমাত্র জেলার সদরে রাজস্ব গ্রহণ করা হত, শ্রীহট্টে হত প্রতি মহকুমায়। জমির উপস্বত্ব ভোগী মধ্যবিত্তের সংখ্যা শ্রীহট্টে অনেক।

পূর্বে বলেছি ইংরাজ আমলেব গোড়ার দিকে শ্রীহট্টে জনসংখ্যার চাপ ছিল অত্যধিক। প্রতি বর্গমাইলে ১৭২ জন বাস করতো। পেম্‌বাবর্টন বলেছেন পরে তা আরো বেড়ে যায়, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তা দাঁড়ায় ৩০৬ জনে। স্বভাবতঃই ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তিরা বাইরে যাবার দিকে ঝুঁকছিলেন। ইতিমধ্যে কাছাড় ইংরাজ শাসনাধীনে আসে। সে সময় কাছাড়ের সমতল ভূমিতে জনসংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশ হাজার। কাছাড়ের উর্বর ভূমির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে শ্রীহট্টবাসী ওখানে বসতি স্থাপন করেন। ক-বছরের মধ্যে চাষবাসে ব্যবসাবাণিজ্যে কাছাড়ের চেহারা পালটে যায়।

নতুন নতুন চাকরি নিয়ে শ্রীহট্টবাসী আসামের বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে যান। এই বহির্মুখীনতাও দেশের আর্থিক সমৃদ্ধিব কারণ হয়।

শ্রীহট্টের কয়েকজন মনীষী

গত দুশো বছরে শ্রীহট্টে যে সব মনীষী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হচ্ছে।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৭৯৯—১৮৫৮)

ইটার পঞ্চগ্রামে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের জগন্নাথ ভট্টাচার্যের সন্তান গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বাল্যে গ্রামের টোলে ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষা করেন। অল্প বয়সে মাকে হারান। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র পনেরো বছর বয়সে দুঃসাহসী গৌরীশঙ্কর কাউকে না বলে নবদ্বীপে চলে যান। ওখানে ন্যায় পাঠ করে 'তর্কবাগীশ' উপাধিলাভ করেন।

কলকাতায় এসে শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হলে তিনি তাঁকে সভাপন্ডিত নিযুক্ত করেন।

রাজা রামমোহন যখন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন গৌরীশঙ্কর ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়ক। কিন্তু পরে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটে। ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তিনি 'সংবাদ ভাস্কর' বার করেন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম এটি দৈনিক ছিল, পরে সপ্তাহে দুবার, আরো পরে সপ্তাহে তিনবার করে বার হতো।

সংবাদ ভাস্কর ছাড়া গৌরীশঙ্কর আর একটি ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ পত্রিকা বার করতেন— নাম ছিল 'রসরাজ'। একবার এতে কাশিমবাজারের মহারাজা কৃষ্ণনাথ সম্বন্ধে কুৎসা প্রকাশিত হলে মানহানির মোকদ্দমায় গৌরীশঙ্করের ছয়মাস কারাবাস ও পাঁচশো টাকা অর্থদন্ড হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'রসরাজ' বন্ধ করে দেন।

গৌরীশঙ্কর সুলেখক ছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাধাকান্ত দেব 'নীতিকথা' নামে একটি শিশুপাঠ্য বই প্রকাশ করেন। এটির প্রকৃত রচয়িতা গৌরীশঙ্কর।

জয় গোবিন্দ সোম (? —১৯০০)

জয় গোবিন্দ আখালিয়াবাসী সাহু বংশীয় দোল গোবিন্দ সোমের পুত্র। প্রাইজ সাহেবের উন্নত চরিত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জয়গোবিন্দ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু হিন্দু সমাজের প্রতি তাঁর বিরূপতা ছিল না। কৃতীছাত্র জয়গোবিন্দ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা, '৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এফ. এ. ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষা একসঙ্গে দেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুদিন শ্রীহট্ট জজকোর্টে ওকালতি করার পর জয়গোবিন্দ কলকাতার হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে থাকেন। ১৮৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে ইনি 'ইন্ডিয়ান খ্রীষ্টিয়ান হেরালড্' নামে একটি পত্রিকাও পরিচালনা করেন। তাঁর মৃত্যু হয় মধুপুরে।

রাধানাথ চৌধুরী (১৮৫৬—১৮৯২)

করিমগঞ্জের অন্তর্গত আগিয়ারামের কাকুরা গ্রামের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে রাধানাথের জন্ম। দারিদ্র্যের জন্য তাঁকে বহুকষ্টে লেখাপড়া করতে হয়। শিলচর ও শ্রীহট্টের স্কুলে পড়ে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দশ টাকার বৃত্তি পান। কলকাতায় মেট্রোপলিটিয়ান কলেজে দুবছর পড়লেও আর অগ্রসর হতে পারেন নি।

শ্রীহট্টে ফিরবার পর বিপিনচন্দ্র পালের সহযোগিতায় তিনি 'ন্যাশনাল স্কুল' স্থাপন করেন। বিপিনচন্দ্র এসময় 'পরিদর্শক' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিপিনচন্দ্র শ্রীহট্ট ত্যাগ করলে ন্যাশনাল স্কুল ও পরিদর্শক পত্রিকা দুটিরই দায়িত্ব পড়ে রাধানাথের ঘাড়ে। স্কুলের কাজে জয়গোবিন্দ সোমের ভ্রাতা রেভারেন্ড সনাতন সোম কিছুদিন তাঁকে সাহায্য করলেও পরে দুজনের মতবিরোধ দেখা দেয়। এ দ্বন্দ্বের পরিণামে রাধানাথই জয়ী হয়েছিলেন। পরিদশর্ক পত্রিকাটিকেও তিনি অশেষ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত করেন— কালক্রমে পরিদর্শকের নিজস্ব প্রেসও হয়।

রাধানাথের স্বদেশপ্রেম ছিল প্রগাঢ়। কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রীহট্ট থেকে প্রথম প্রতিনিধি হয়ে তিনি যান।

রামকুমার নন্দী মজুমদার (১৮৩১ —)

বেজোড়ার নন্দী বংশে কবি রামকুমারের জন্ম। শিক্ষানুরাগ ও প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও দরিদ্রের সন্তান রামকুমার বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেন নি। নিজের চেষ্টায় তিনি বাংলা, ফার্সি, সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি 'দাতাকর্ণ' নামে একটি যাত্রার পালা লেখেন। দারিদ্র্যের তাড়নায় অল্প বয়সে তাঁকে চাকরীর সন্ধানে শিলচরে যেতে হয়। ওখানকার ডেপুটি কমিশনারের অফিসে তিনি তিন টাকা মাইনেতে চাকরিতে ঢুকে উন্নতি করে শেষে খাজাঞ্চির পদ পান। এইজন্য সাধারণ্যে তাঁর পরিচয় ছিল দেওয়ান রামকুমার। তাঁর প্রধান দুটি কাব্য— 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য' ও 'উষোদ্বাহ'।

রাজা গিরীশচন্দ্র রায় (১৮৪৫—১৯০৮)

গিরীশচন্দ্রের শৈশবে নাম ছিল ব্রজগোবিন্দ। পিতা বোয়ালজুর পরগণার চরভিতা গ্রামবাসী দীপচন্দ্র নন্দী চৌধুরী। দেওয়ান মানিকচাঁদের পুত্র মুরারিচাঁদ রায় অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর বালবিধবা কন্যা ব্রজসুন্দরী জমিদারীর অধিকারিণী হন। ব্রজসুন্দরীর দত্তকপুত্র গিরিশচন্দ্র। প্রথম যৌবনে গিরিশচন্দ্র ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের আগমন উপলক্ষে শ্রীহট্টে যে দরবার হয় তাতে গিরিশচন্দ্র আমন্ত্রিত হন নি। এই অপমানে ক্ষুব্ধ গিরিশচন্দ্র উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। নবকিশোর সেন ও দুলালচন্দ্র দেবের সুপরামর্শে গিরিশচন্দ্র নিজ জেলায় শিক্ষাবিস্তার কার্যে অগ্রসর হন এবং মুরারিচাঁদ স্কুল ও মুরারিচাঁদ কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে গিরিশচন্দ্র স্থাপিত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় গৃহ ভূমিসাৎ হলে তিনি নিজে সামান্য কুটিরে বসবাস করে বিদ্যায়তনসমূহের গৃহ পুনর্নির্মাণ করান। গিরিশচন্দ্র দানবীর। কত দুঃস্থ ছাত্র, কত অসহায় পরিবার তাঁর দানের উপর নির্ভরশীল ছিল আজ তা অনুমান করাও কঠিন। শুধুমাত্র বিদ্যালয়গুলির পুনর্নির্মাণের জন্যই তিনি অন্যূন তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন।

আসামে বাঙ্গালীদের মধ্যে রাজা গিরীশচন্দ্রই প্রথম চা-বাগান তৈবি করে এই সম্মানজনক স্বাধীন ব্যবসায়ে সবার প্রবৃত্তি জন্মান।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আসামের চিফ কমিশনার সার হেনরি কটন শ্রীহট্টে এসে প্রকাশ্য দরবাবে অতি জাঁক জমকের সঙ্গে তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গিরীশচন্দ্র যখন কলকাতায় যান কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ বহু জননেতার সঙ্গে তাঁর সখ্য স্থাপিত হয়।

শরচ্চন্দ্র চৌধুরী

বুরুঙ্গা পরগণার বেগমপুর গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান শরচ্চন্দ্র চৌধুরী শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হন। বিদ্যাশিক্ষার অদম্য আগ্রহবশে তিনি পায়ে হেঁটে রাজশাহী জেলার পুঠিয়ার মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর কাছে উপস্থিত হয়ে সহায়তা প্রার্থনা করেন। শরৎ কুমারীর আনুকূল্যে শরচ্চন্দ্র বাজশাহী থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ও কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথম জীবনে শরচ্চন্দ্র ছিলেন মহারাণী শরৎসুন্দরী প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংবাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। উত্তরকালে রাজশাহী, হুগলী ও মৌলবীবাজার উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য গ্রহণ করেন। শরচ্চন্দ্র ছিলেন আবাল্য কাব্যানুরাগী। তাঁর প্রথম কাব্য 'মহাপূজা'। কিন্তু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'দেবীযুদ্ধ' কাব্য। শবচ্চন্দ্রের সুহৃৎ প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই কাব্যটির বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশ কবে বাংলার পাঠকদের সঙ্গে শরচ্চন্দ্রের পরিচয় সাধন করান। 'দেবীযুদ্ধ' পৌরাণিক কাহিনীর আবরণে স্বদেশ প্রেমাত্মক কাব্য। এর ফলে কাব্যটি রাজরোষে পড়ে। শিক্ষাব্রতী শরচ্চন্দ্র শিশুদের জন্য যে পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা উন্নত নৈতিক উপদেশে পূর্ণ এবং একসময় এর শ্লোকাবলী লোকেব মুখে মুখে ফিরতো। শরচ্চন্দ্রের অপর পরিচয় তিনি মহাসাধক। তাঁর সাধন সঙ্গীতগুলিও সর্বজন সমাদৃত হয়। কাশীধামে শরচ্চন্দ্রের মৃত্যু সাধকোচিত মহিমায় পূর্ণ।

পন্ডিতা রমাবাঈ (১৮৫৮—১৯২২)

পন্ডিতা রমাবাঈ মহারাষ্ট্রকন্যা, কিন্তু শ্রীহট্টের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে তাঁর জীবন এক বিচিত্র বন্ধনে অচ্ছেদ্যরূপে বাঁধা। রমাবাঈয়ের পিতা অনন্ত শাস্ত্রী ডোংরে পত্নীকে সংস্কৃত শেখাবার অপরাধে সমাজচ্যুত হন। পত্নীর নাম ছিল লক্ষ্মীবাঈ। অনন্ত শাস্ত্রী ডোংরে প্রথমতঃ ম্যাঙ্গালোর থেকে ত্রিশ মাইল দূরবর্তী গঙ্গামূল অরণ্যে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করে শিক্ষাদান কবতে থাকেন। কিন্তু বিদ্বেষী আত্মীয়দের বৈরিতার ফলে তিনি এই স্থানও ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর শুরু হয় তাঁর ভ্রাম্যমাণ জীবন। রমাবাঈ তখন মাত্র কয়েকমাসের বালিকা। শিশুকাল থেকে তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে প্রব্রজনে অভ্যস্ত। মায়ের কোলে বসেই রমাবাঈ পাণিনি সুত্র ও ভাগবতের শ্লোকাদি আয়ত্ত করেন। পরে মারাঠী ভাষায়ও তাঁর দক্ষতা জন্মে ও সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দেবার অপূর্ব ক্ষমতা লাভ করেন। যদিও অনন্ত শাস্ত্রী

ডোংরে আচার-আচরণে নিষ্ঠাবান ও রক্ষণশীল ছিলেন স্ত্রী-শিক্ষা ও মেয়েদের বিবাহের বয়স বিষয়ে উদার মতবাদের জন্য তিনি আমরণ নির্যাতিত হয়েছিলেন। মায়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সংসার পরিচালন নৈপুণ্য রমাবাঈয়ের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। দুঃখ দারিদ্র্য ছিল ডোংরে পরিবারের নিত্যসঙ্গী। বিশেষতঃ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় তাঁদের খুবই কষ্ট হয়। এর অল্পকাল পরে নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে রমাবাঈয়ের পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠাভগ্নীর মৃত্যু ঘটে। উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের এই নিপীড়নের ফলে রমাবাঈয়ের মনে সমাজের বিরুদ্ধে তিক্ত বিরূপতার সৃষ্টি হয়।

পিতামাতার মৃত্যুর পরে রমাবাঈ ও তাঁর ভ্রাতা শ্রীনিবাস ভ্রাম্যমান জীবনযাপন করতে থাকেন। পাঞ্জাবে থাকা কালে তীব্র শীতে তাঁদের মৃত্যুর উপক্রম হয়েছিল। অবশেষে ভ্রাতাভগ্নী ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় উপনীত হন। কলকাতার নব্যদল রমাবাঈয়ের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন; অন্যদিকে সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতরাও তাঁর পান্ডিত্য ও সংস্কৃত ভাষায় বাগ্মিতার সমাদর করে তাঁকে পন্ডিতা ও সরস্বতী উপাধিতে ভূষিত করেন। কলকাতা থেকে যাত্রা করে রমাবাঈ বঙ্গদেশ ও আসামের বড় বড় শহরে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। তাঁর নাম সারাভারতে ছড়িয়ে পড়ে, এমন কি মহারাষ্ট্রেও তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়। রমাবাঈ শ্রীহট্টে উপস্থিত হন। এই সময় তাঁর ভ্রাতার মৃত্যু হয়। শ্রীহট্টে বিপিনবিহারী দাস নামক এক শূদ্রবংশোৎপন্ন উচ্চশিক্ষিত মেধাবী যুবককে বিবাহ করতে রমাবাঈ স্বীকৃত হন। মৃত্যুর পূর্বে শ্রীনিবাস রমাবাঈয়ের বিবাহে সম্মতি দিয়ে গিয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে নিতান্ত অকালে বিপিনবিহারীর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর মাত্র অল্প কিছুদিন আগে তাঁদের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। স্বামীহীন অবস্থায় নিঃসম্বল রমাবাঈ ইংরাজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। বালিকা কন্যাকে নিয়ে রমাবাঈ চলে যান পুণায়। সেখানে অল্পকাল কাটিয়ে অসমসাহসে ভর দিয়ে তিনি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। সে বছরই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ইংল্যান্ড ব্যতীত কানাডা ও আমেরিকাতেও রমাবাঈ কিছুকাল বাস করেছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নারীদের জন্য 'শারদাসদন' স্থাপন করেন ও মধ্যপ্রদেশের দুর্ভিক্ষের সময় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

পন্ডিতা রমাবাঈ শ্রীহট্টে অল্পদিন ছিলেন। কিন্তু শ্রীহট্টের বিদ্বৎমন্ডলীতে তিনি যে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টান্তে শ্রীহট্টে স্ত্রীশিক্ষার যে বিস্তার ঘটেছিল তা কখনো বিস্মৃত হবার নয়।

বিপিনবিহারী দাস

করিমগঞ্জের মর্যাতকান্দি গ্রামের মাণিক্যরাম দাস তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পুত্র বিপিনবিহারী দাস বাল্যকাল থেকেই মেধাবী ও তেজস্বিতায় পূর্ণ ছিলেন। প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হবার পর কলকাতায় কলেজে পড়ার সঙ্গতি ছিল না বলে বিপিনবিহারী কিছুদিন আসামে

চাকরী করে অর্থ সংগ্রহ করে পরের বছর কলকাতায় পড়তে যান। সেখান থেকে বি-এ পরীক্ষা পাশ করে কিছুদিন গৌহাটির নর্মাল স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করেন। দু-বছর পরে রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

তিনি সেসময়ে বাংলা ভাষায় 'রসায়নের উপক্রমণিকা' নামে যে পাঠ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করেন (শ্রাবণ ১২৮৪) তার পরিশিষ্টে বহু পারিভাষিক শব্দ সংযোজন করেন। বাংলা ভাষায় রসায়ন বিষয়ে তখন এটিই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ছিল। বিপিনবিহারী কাব্যপ্রিয়ও ছিলেন।

এম. এ. পাশ করার পরের বছরই বিপিনবিহারী বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কাছাড়ে ওকালতি ব্যবসায় শুরু করেন এবং অল্পদিনেই তাঁর পশার জমে। ওই সময় পণ্ডিতা রমাবাঈ শ্রীহট্টে ছিলেন। শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর নামক মহারাষ্ট্রের এক তরুণ আই-সি-এস যুবক শ্রীহট্টে এসে সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে রমাবাঈয়ের চিত্তজয়ের চেষ্টা করেন, কিন্তু রমাবাঈ বিপিনবিহারীকে বিবাহ করেন।

এই বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজিস্টারি হয়েছিল, কিন্তু এর ফলে বিপিনবিহারী সমাজ কর্তৃক বর্জিত হন। বিপিনবিহারীর ইচ্ছা ছিল বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে যাবেন। সে আশা পূর্ণ হয় নি।

তারাকিশোর চৌধুরী (১৮৫৯—১৯৩৫)

হবিগঞ্জে বামৈ গ্রামের বিখ্যাত চৌধুরী বংশে তারাকিশোরের জন্ম। পণ্ডিত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ, সুন্দরীমোহন, বিপিনচন্দ্র, তারাকিশোর—ছাত্রজীবনে এঁরা ছিলেন সমকালবর্তী। মেধাবী ছাত্ররূপে তারাকিশোর আবাল্য খ্যাতিমান। এম. এ ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কিছুদিন সিলেট আদালতে ওকালতি করেন। সেখান থেকে চলে যান কলকাতায়। কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর পশার ছিল অভূতপূর্ব। বিশেষতঃ তারাকিশোর কোনো মিথ্যা মামলা হাতে নিতেন না, এই খ্যাতি তাঁকে কলকাতার আইনজ্ঞ মহলে সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্রথম জীবনে বন্ধুদের মতো তারাকিশোরও ব্রাহ্মধর্মে অনুরক্ত হন ও উপবীত ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর মন সর্বদা সদ্ গুরুলাভের জন্য ব্যাকুল ছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রামদাস কাঠিয়া-বাবার সাক্ষাৎ পান এবং ১৯১৫ সালে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় 'সন্তদাস'। ইনি 'ব্রজবিদেহী মোহান্ত' পদে বৃত হন। তারাকিশোর আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞদের অন্যতম। কুম্ভমেলায় তাঁকে 'মন্ডলেশ্বরের' মর্যাদা দান করা হয়েছিল। 'ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা', 'দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা' প্রভৃতি তারাকিশোরের রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ (১৮৫৬—১৯৪৫)

সীতানাথ দত্ত যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বিপিনচন্দ্র, তারাকিশোরের মতো উত্তরজীবনে তিনিও হিন্দুধর্মে প্রগাঢ় আস্থা প্রদর্শন করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতায়

গেলেও সীতানাথ দত্ত এফ-এ পরীক্ষা না দিয়ে বাড়িতে বসে দর্শন শাস্ত্রের চর্চা করতে থাকেন। তিনি কলকাতা কেশব একাডেমির প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দর্শন শাস্ত্রে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তির জন্য তাঁকে সিটি কলেজে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করা হয়। তাঁর জীবদ্দশায় সীতানাথ একজন শ্রেষ্ঠ দর্শনবেত্তা ও শাস্ত্রবিদের সম্মান লাভ করেছিলেন। দীর্ঘায়ু সীতানাথ ইংরাজি ও বাংলায় অন্যূন ত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা করেন যার মধ্যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, অদ্বৈতবাদ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন Hindu Theism, The Philosophy of Sankaracharya প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। সীতানাথ ইংরাজি ও বাংলা ভাষায় কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮—১৯৩২)

বিপিনচন্দ্র পালের পিতা রামচন্দ্র পাল হবিগঞ্জের তরফ পরগণার পৈলগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি নিজেও অসামান্য তেজস্বী ও ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। প্রথম বয়সে তিনি ঢাকায় সদরালার অফিসে পেশকারী করতেন। একটি তদন্ত উপলক্ষে ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ তাঁকে দুহাজার টাকা ঘুষ দিলে তা প্রত্যাখ্যান করে চাকরি ছেড়ে চলে আসেন। শ্রীহট্ট সদরে মুনসেফ নিযুক্ত হয়ে কিছুদিন কাজ করার পর বরিশাল কোর্টের হাটে বদলী হয়ে যান। পরে মুনসেফী ছেড়ে দিয়ে শ্রীহট্টে ওকালতি শুরু করে পশার জমিয়ে তোলেন। তাঁর গ্রামের লোকেরা একটি অসহায় ব্রাহ্মণ পরিবারকে অন্যায়রূপে সমাজচ্যুত করেছেন জেনে তিনি সেই ব্রাহ্মণকে নিজ পৌরোহিত্যে বরণ করে নেন। এর ফলে তাঁকেও ষোল বছর সমাজচ্যুত অবস্থায় থাকতে হয়। বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করেন—মৃত্যুর পূর্বে অবশ্য পিতাপুত্রে মিলন হয়।

বিপিনচন্দ্র শ্রীহট্টের সরকারি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ-এ. ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারায় কটক একাডেমিতে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে চলে যান। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় তাঁর সঙ্গে পরিবারের বিচ্ছেদ ঘটেছিল। কটক থেকে বিপিনচন্দ্র শ্রীহট্টে চলে আসেন। এখানে জাতীয় স্কুল স্থাপন করে ও পরিদর্শক পত্র সম্পাদনা দ্বারা তিনি সমাজসেবায় ব্রতী হন। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটায় পুনরায় শ্রীহট্ট ত্যাগ করতে হয় তাঁকে। বিচিত্রকর্মা বিপিনচন্দ্র জীবনে বহুবিধ বৃত্তি গ্রহণ করেন, যথা—ব্যাঙ্গালোরে, আর্কট নারায়ণ স্বামীর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকতা, লাহোরে ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদনা, ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির (ন্যাশনাল লাইব্রেরির প্রথমাবস্থা) গ্রন্থাগারিকতা, কলকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স ইন্‌স্‌পেকটারের কার্য প্রভৃতি। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র অকস্‌ফোর্ডে এক বছরের জন্য অধ্যয়ন করে আসেন। ১৯০৮ সালে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে দীর্ঘকাল সেখানে ছিলেন।

ছাত্রজীবন থেকে বিপিনচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা বিকশিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর বছর থেকেই বিপিনচন্দ্র এর সঙ্গে যুক্ত হন।

বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক প্রতিভার যথার্থ স্ফূর্তি ঘটে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত বিপিনচন্দ্র ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে অগ্নিক্ষরা ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত এতবড় বাগ্মী ভারতে আজ পর্যন্ত আর্বিভূত হন নি। শ্রী অরবিন্দের মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় বিপিনচন্দ্রের কারাদন্ড হয়। ১৯১১ সালেও তিনি পুনরায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

স্বাধীনচেতা বিপিনচন্দ্র নরমপন্থী রাজনীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। সুরাট কংগ্রেসে তিনি লালা লাজপত রায় ও বাল গঙ্গাধর তিলকেব সঙ্গে মিলিত হয়ে চরমপন্থী রাজনীতিব সমর্থন করেন। এই তিনজনকে তখন থেকে একত্রে 'লাল-বাল-পাল' বলে চিহ্নিত করা হতে থাকে। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনকে বিপিনচন্দ্র সমর্থন করতে পারেন নি। ১৯২১ সালে ববিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে ইনি সভাপতি রূপে গান্ধীবাদের সমালোচনা করায় সেকালের রাজনৈতিক জীবন থেকে প্রায় নির্বাসিত হন।

অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তি ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার জন্য বিপিনচন্দ্র যেবকম খ্যাতনামা ছিলেন তেমনি সুলেখক হিসাবেও তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বিপিনচন্দ্রের বাংলা রচনার মধ্যে জেলের খাতা, চরিতকথা, চরিত্র চিত্র, প্রবর্তক বিজয়কৃষ্ণ, নবযুগেব বাংলা, মার্কিনে চারিমাস, সত্তর বৎসর এবং ইংরাজিতে New Spirit, Soul of India, Swadeshi and Swaraj, Bengal Vaisnavism, Memories of my Life and Times প্রভৃতি সুপরিচিত।

বিপিনচন্দ্রের পুত্রদের মধ্যে নিরঞ্জন, জ্ঞানাঞ্জন ও প্রেমাঞ্জন নানাক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। নিরঞ্জন পাল ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক গৌরবময় যুগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

সুন্দরীমোহন দাস (১৮৫৭—১৯৫০)

শ্রীহট্ট কালেকটরীর সেরেস্তাদার উত্তর শ্রীহট্টের দিঘলী গ্রামবাসী স্বরূপচন্দ্র দাসের পুত্র সুন্দরীমোহন দাস বিপিনচন্দ্র পালের সহপাঠীরূপে সিলেট স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ. এ. ও মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. বি. পাশ কবার পব সুন্দরীমোহন শ্রীহট্টে ও কলকাতায় চাকরি করেন। কলকাতায় স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করলে তাঁর বিপুল পশার জমে ওঠে। সুন্দরীমোহন শ্রীহট্ট সম্মিলনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বিপিনচন্দ্র পাল ও সুন্দরীমোহন ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। বিপিনচন্দ্রের মতো তিনিও দেশসেবায় জীবন সমর্পণ করেছিলেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সুন্দরীমোহনও ছিলেন একজন প্রথম সারির নেতা। বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল ও জাতীয় শিক্ষা সমিতি—এই দুটি প্রতিষ্ঠানেরই জন্মলগ্ন থেকে সুন্দরীমোহন এদের সঙ্গে যুক্ত। সুন্দবীমোহনের জীবনের অমর কীর্তি 'ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিট্যুট' ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল স্থাপন। এই ইনস্টিট্যুটই বর্তমানের ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ। সুন্দরীমোহন বঙ্গদেশে চিকিৎসাবিদ্যার জাতীয়করণে অগ্র পথিক। এরজন্য তাঁকে নিজের বিশাল প্র্যাকটিসও ছাড়তে হয়েছিল। এই অক্লান্তকর্মী পুরুষ কাজের ফাঁকে ফাঁকে ধাত্রীবিদ্যাবিষয়ক যেসব গ্রন্থ লিখেছিলেন সেগুলি বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ।

ব্যক্তিজীবনে সুন্দরীমোহন ছিলেন প্রগাঢ় বৈষ্ণবভাবে উদ্‌বুদ্ধ এবং নিপুণ সঙ্গীত শিল্পী। বিশেষতঃ কীর্তনাঙ্গ সঙ্গীতে তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য। ১৯০৫ সালে তাঁর একটি সঙ্গীত 'আমরা চাই না তব শিক্ষা' জনপ্রিয় হয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সেও সুন্দরীমোহন উদাত্তকণ্ঠে গান করতেন। একদা তাঁর কীর্তন শুনতে রবীন্দ্রনাথও তাঁর গৃহে যেতেন এবং রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তাঁর স্বরচিত পালা 'নৌকাবিলাস' সুন্দরীমোহন ঠাকুরবাড়িতে গেয়ে শুনিয়ে ছিলেন। বিপিনচন্দ্র ও সুন্দরীমোহন উনিশ শতকের দুজন শ্রেষ্ঠ মনীষী।

সুন্দরীমোহনের পুত্র যোগানন্দ দাস সাংবাদিকতা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছিলেন।

অচ্যুতচরণ চৌধুরী (১৮৬৫—১৯৫৩)

করিমগঞ্জ মহকুমার মৈন্যাগ্রামবাসী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত নামক যে বিশালগ্রন্থ রচনা করেন তা একক প্রয়াসে ঐতিহাসিক বিবরণী প্রণয়নের এক দুর্লভ উদাহরণ। এ জাতীয় অসাধারণ গ্রন্থ যে কোনো দেশে যে কোনো কালে লেখককে অমরতা দান করে। এই বিশালকায় গ্রন্থটি লিখতে লিখতে অচ্যুতচরণ একে একে প্রিয় ভ্রাতা, স্ত্রী, কন্যা ও একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছিলেন। সত্যসন্ধানে ও জ্ঞানচর্চায় নিবেদিত প্রাণ অচ্যুতচরণ সকল ঐতিহাসিকের নমস্য।

অচ্যুতচরণের প্রপিতামহ কানুরাম চৌধুরী ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শান্তরাম নামে এক বৈষ্ণব মহাত্মাকে এনে প্রতাপগড়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। কানুরামের পুত্র গৌরচন্দ্র, গৌরচন্দ্রের পুত্র অদ্বৈতচরণই অচ্যুতচরণের পিতা।

অচ্যুতচরণ শ্রীহট্টের "ইতিবৃত্ত" ব্যতীত আরো বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি প্রায় সবই বৈষ্ণব সাধক জীবনী বা সাধনকথা সম্পর্কিত। তিনি বাল্যলীলা সূত্রের বাংলা অনুবাদও প্রকাশ করেন।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য সরস্বতী (১৮৬৮—১৯৩৮)

মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ সরস্বতী শ্রীহট্টের পণ্ডিত সমাজের মধ্যমণি। এঁর জন্মের পর বৎসরই মাতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁকে শৈশব থেকে লালন পালন করেন ধাত্রীমাতা তারাসুন্দরী দাসী। ধাত্রীমাতার প্রতি পদ্মনাথের ছিল অফুরন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধা। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় পদ্মনাথ আসামের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি ইংরাজি, দর্শন ও সংস্কৃত তিন বিষয়ে অনার্স লাভ করেন। ইংরাজি সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। চাকুরি ক্ষেত্রে পদ্মনাথের প্রথম নিয়োগ মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যাপকরূপে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডেপুটি ইনসপেকটার অব স্কুলস্ নিযুক্ত হন এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গৌহাটি কটন কলেজে সংস্কৃত ও ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে কাজ করতে থাকেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মনাথ মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। পরবৎসর চাকরি থেকে অবসর নেন।

পদ্মনাথের জীবনের একটি কীর্তি, তিনি শ্রীহট্টের ইতিহাস বিষয়ে যে সকল উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তা অচ্যুতচরণ চৌধুরীর হাতে সমর্পণ করেন এবং 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের' সম্পূর্ণ মুদ্রণব্যয় বহন করেন।

অন্যকীর্তি— 'কামরূপ শাসনাবলী'। সিলেটে ও অন্যত্র যেসব তাম্রলিপি পাওয়া গিয়েছিল পদ্মনাথ নিপুণভাবে তার পাঠোদ্ধার করে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একটি নতুন পথ খুলে দেন। 'কামরূপ শাসনাবলী' পুরাতাত্ত্বিক গ্রন্থ হিসাবে একটি শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য রচনা।

পদ্মনাথ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ— প্রবন্ধাষ্টক, হেড়ম্ব রাজ্যের দন্ডবিধি, হিন্দু বিবাহ সংস্কার, বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিনিরাশ, পরশুরামকুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ, রামকুমার চরিত, আলোচনা চতুষ্টয়, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ, স্যার গুরুদাস প্রসঙ্গ।

সারদাচরণ শ্যাম (১৮৬২—১৯১৬)

ইন্দেশ্বর পরগণার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে সারদাচরণের জন্ম। ইনি নিজে কৃতী ছাত্র ছিলেন— তাঁর বন্ধু সতীর্থেরাও দিক্‌পাল, যথা— বিপিনচন্দ্র, সুন্দরীমোহন, সীতানাথ, তারাকিশোর চৌধুরী। সারদাচরণ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞান বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথম জীবনে তিনি মুনসেফ পদে নিযুক্ত হয়ে শ্রীহট্ট ও মৌলবীবাজারে কাজ করেন। কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র আইন বিভাগে সাফল্য লাভ করবেন না, এই ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ ইংরাজ সরকার তাঁকে মুনসেফ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সারদাচরণ চাকরি ত্যাগ করে শ্রীহট্ট আদালতে ওকালতিতে প্রবৃত্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে পশার জমিয়ে তোলেন।

কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সারদাচরণ দেশের উন্নতির জন্য প্রভূত প্রয়াস স্বীকার করেন। সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারে তিনি ছিলেন বিশেষ উৎসাহী। সিলেট গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি এর কার্যকরী সমিতির সদস্য হন। ১৯০৬ সালে সুরমা ভ্যালি কনফারেন্সের পর যে সুরমা ভ্যালি অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয় সারদাচরণ ছিলেন তার সভাপতি। সে সময়ে এটি ছিল শ্রীহট্টের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন। ১৮৯৬ সালে সারদাচরণ প্রধানতঃ তাঁর কয়েকজন আত্মীয় ও গ্রামবাসীর সহযোগে মাত্র একলক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ইন্দেশ্বর টি অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানী স্থাপন করেন। যৌথ উদ্যোগে চা-বাগান পরিচালনার ক্ষেত্রে এই কোম্পানীটি একটি নতুন পথ দেখিয়ে শ্রীহট্টের অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে সারদাচরণ যখন মারা গেলেন তখনো তাঁর কাছে দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল অনেক।

কামিনীকুমার চন্দ (১৮৬২—১৯৩৬)

হবিগঞ্জের ছাতিয়াইন গ্রামবাসী কামিনীকুমার চন্দ শুধু শিলচরের শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন না ব্যবহারজীবি রূপে তাঁর সুনাম সমগ্র বঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। ছাত্রজীবনে তিনি সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ, নীলরতন , ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে সৌহার্দসূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দেব ভানুবিল প্রজাবিদ্রোহ মামলায় কামিনীকুমারের খ্যাতি প্রসারিত হয়।

সুরমা উপত্যকা রাজনৈতিক সম্মেলনে কামিনীকুমার ছিলেন সভাপতি। তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসের অন্যতম সহ-সভাপতি হন। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে কামিনীকুমাব আজীবন যুক্ত ছিলেন। শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের উন্নয়নেও কামিনীকুমারের সক্রিয় চেষ্টা ছিল।

কামিনীকুমার চন্দের চারজন পুত্রই দেশবিখ্যাত। জ্যেষ্ঠ— অপূর্বকুমার চন্দ আই-ই-এস, সুবিখ্যাত শিক্ষাবিদ। অরুণকুমার চন্দ— বার-এ্যাট-ল আসাম কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা ও শিলচর গুরুচরণ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। অশোককুমার চন্দ ছিলেন ভারতেব কমট্রোলাব ও অডিটর জেনারেল। অনিলকুমার চন্দ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব, বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ ও কেন্দ্রে প্রতিমন্ত্রী।

বৈকুণ্ঠচন্দ্র গুপ্ত

ইনি প্রথম জীবনে একটি চা-বাগানেব সামান্য কর্মচারী ছিলেন। তাঁব সততা ও নির্লোভতায মুগ্ধ হয়ে ইংবাজ মালিক ভারত পরিত্যাগের সময় চা-বাগানটি তাঁর কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রী করে যান। কালক্রমে বৈকুণ্ঠচন্দ্রের সুপরিচালনায় তাঁর চা-বাগান সুরমা উপত্যকাব একটি শ্রেষ্ঠ চা-বাগানে পরিণত হয় ও বহুবিধ ব্যবসায়ে তিনি জড়িত হয়ে পড়েন। বিশেষতঃ শ্রীহট্টের ইলেকট্রিক কোম্পানী তাঁর পরিবারের দ্বারাই পরিচালিত হত। উচ্চ শ্রেণীর ব্যবসায়িক প্রতিভাব সঙ্গে অতুলনীয় নৈতিক বল যুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠচন্দ্রের জীবনকে প্রবাদবাক্যে পরিণত করেছিল। শেষ জীবনে বিষয়কর্ম থেকে অবসর নিয়ে তিনি শাস্ত্রচর্চায় কাল কাটাতেন।

রমাকান্ত রায় (১৮৭৩—১৯০৬)

রমাকান্ত রায়ের জন্ম হবিগঞ্জের জলসুকা গ্রামে। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় পিতৃব্য মথুরচন্দ্রের দ্বারা তিনি প্রতিপালিত হন। রমাকান্ত ছেলেবেলা থেকে সাহসী। ছাত্রজীবনে একটি খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ে সাহস ও সত্যবাদিতার দ্বারা মুক্তিলাভ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পবীক্ষা পাশ করার পর ইনি উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কলকাতায় যান। কৃষ্ণকুমাব মিত্র ও রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে রমাকান্ত ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপান যাত্রা করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াকোহামা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইনিং ইন্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় সফল হয়ে বমাকান্ত দেশে ফিরে আসেন। প্রথম কিছুদিন কাশ্মীর রাজসরকারে চাকরি করেন, পরে চলে আসেন রাণীগঞ্জে।

যৌবনে রমাকান্ত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসবণ করে তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন ও ইয়োরোপ আমেরিকায় অধ্যয়ন করতে যান। এঁদের মধ্যে দুজন হচ্ছেন রাধামাধব রায় (বিলাতে কুপার্সহিল কলেজ থেকে ইনজিনিয়াবিং এর ডিগ্রী লাভ করে ভারতের ইন্‌জিনিয়ারিং সার্ভিসে যোগ দেন) ও সতীশচন্দ্র রায় (আই-ই-এস)। রমাকান্ত নিজের বেতন ২৫০. টাকা থেকে মাত্র ৫০. নিজের জন্য ব্যয় করতেন। বাকি টাকার দ্বারা চারজন যুবককে আমেরিকায় শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার খরচ যোগাতেন। রমাকান্তের চরিত্রগুণে সকলেই মুগ্ধ হতেন; রোগীর সেবা, পরোপকার, অতিথি সৎকার এসব ছিল তাঁর সহজাত গুণ। রমাকান্তের দেশাত্মবোধ ছিল তীব্র ও অকপট। তাঁর স্বগ্রাম জলসুকায় সুরমা উপত্যকা রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, এতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন তাঁর মামা বৈকুণ্ঠনাথ রায়। এই সম্মেলনে শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র যোগ দিয়েছিলেন। রমাকান্তের জীবন অকালে খণ্ডিত হয়।

গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২—১৯৪১)

কবিমগঞ্জ বীরশ্রী গ্রামের সন্তান গুরুসদয় দত্ত ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে গুরুসদয আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাওড়া, বীরভূম ও ময়মনসিংহের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরূপে গুরুসদয় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাতে সরকারি কর্মে তাঁর উচ্চতম পদলাভের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছিল; কিন্তু অন্তরায় ছিল তাঁর স্বদেশপ্রেম ও নির্ভীকতা। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ গুরুসদয়ের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। গুরুসদয় পেয়েছেন দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। ব্রতচারী আন্দোলনের জনক তিনি। রায়বেঁশে নাচের পুনরুদ্ধারে ও পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহে তাঁর নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। দেশের সামাজিক উন্নতি, শিক্ষা, কৃষি ও স্বাস্থ্য বিভাগের উন্নতির জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করেন। সাহিত্য সৃষ্টিতেও তাঁর দান অল্প নয়। গুরুসদয়ের পত্নী সরোজনলিনী (আই. সি. এস. বি, দের কন্যা) সর্বপ্রকার মঙ্গলকর্মে স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণীর ব্রত পালন করেছেন। গুরুসদয়ের মতো বিচিত্র প্রতিভাশালী ব্যক্তি দেশে খুব কমই দেখা যায়।

মহেন্দ্রনাথ দে (— ১৯১২)

জগৎশী গ্রামবাসী দোলগোবিন্দ দের পুত্র মহেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল রত্ন। বি. এস. সি. পাশ করার পব মহেন্দ্রনাথ কিশোরগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু সে সময় ময়মনসিংহে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে শিক্ষক ও ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ হওয়ায় মহেন্দ্রনাথ পদত্যাগ করেন। এরপর গণিত শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়ে যাদবপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপনা করেন। দেশহিতব্রতী মহেন্দ্রনাথ হবিগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে দেশে ফিরে আসেন।

এখানে থাকা কালে মহেন্দ্রনাথের উদ্যোগে মাসিক 'মৈত্রী' ও সাপ্তাহিক 'প্রজাশক্তি' প্রকাশিত হয়েছিল।

মহেন্দ্রনাথ সংস্কৃত বাংলা ইংরাজী ও ফরাসী ভালো জানতেন। ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায়ও তাঁর কিছু কিছু জ্ঞান ছিল। জগৎশী দয়ানন্দ আশ্রমে পুলিশেব আক্রমণেব সময় গুলিতে আহত হয়ে মহেন্দ্রনাথ মাবা যান।

কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবি

শ্রীহট্টেব ব্যবহারজীবিদের মধ্যে রামচন্দ্র পাল, দুলালচন্দ্র দেব, বাধাবিনোদ দাস সুনাম সম্পন্ন ছিলেন। পববর্তীকালে খ্যাতি লাভ করেন কামিনীকুমার চন্দ, প্রমোদচন্দ্র দত্ত, সতীশচন্দ্র দত্ত, বসন্তকুমাব দাস, হেমচন্দ্র দত্ত, ধর্মদাস দত্ত প্রভৃতি। অরুণকুমার চন্দ ব্যারিস্টারি শুরু করলেও রাজনীতির আকর্ষণে তা ত্যাগ করেন।

মিরাশীর দত্ত বংশীয় প্রমোদচন্দ্র দত্ত শুধু উকিল নয় মন্ত্রী হিসাবেও কৃতী ছিলেন। ইনি দীর্ঘকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটেব সদস্য ছিলেন। ধর্মদাস দত্ত শ্রীহট্টেব সরকারী উকিল ছিলেন এবং মহিলা কলেজের অবৈতনিক অধ্যক্ষও ছিলেন অনেকদিন। হেমচন্দ্র দত্ত শিলচবের কীর্তিমান উকিল, তাঁর পুত্র শিশির দত্ত, আই. সি. এস. স্বনামধন্য।

বসন্তকুমাব দাস দেশসেবার জন্য বিশাল প্র্যাক্টিস ত্যাগ কবেছিলেন। আসামে তিনি ছিলেন সর্বপ্রধান কংগ্রেস নেতা। দেশ বিভাগের পবে তিনি পাকিস্তানেব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং আই. এল. ও-র আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব কবেছিলেন। তাঁব সম্পাদিত ও অনূদিত গীতা সুভাষচন্দ্রের প্রিয় ছিল।

একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্ব : হাসন রজা

লক্ষ্মণশ্রী গ্রামেব জমিদাব আলীরজা চৌধুরীব পুত্র দেওয়ান হাসন বজা চৌধুরী ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হাসন রজা মবমীয়া সাধক ছিলেন— মবমীয়াভাবে উদ্বুদ্ধ হযে তিনি অনেক গান ও কবিতা বচনা কবেন। রবীন্দ্রনাথ অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হিবার্ট বক্তৃতামালায় হাসনের একটি গান উদ্ধৃত কবায় তাঁর খ্যাতি বিষযে অনেকে অবহিত হয়েছেন। হাসনেব আচাব-আচবণ ও জীবনযাপন পদ্ধতি নিয়ে অনেক অনেক কথা বলছেন আজকাল। হাসন বজা বিচিত্র উজ্জ্বল রঙের পোষাক পবতেন ও দিনেব বেলাযও একটি লণ্ঠন জ্বালিযে হাতে নিয়ে চলতেন ; এর অর্থ মানুষ প্রকৃতপক্ষে অন্ধকারে নিমগ্ন হয়ে আছে।

হাসন রজাব শ্রেষ্ঠগ্রন্থ 'হাসন উদাস'— এটি উচ্চাঙ্গের মরমীয়া কাব্য। এছাড়া আর একটি কাব্য আছে 'সৌখীন বাহার'। এই বইযেব আলোচ্য বিষয় স্ত্রীলোক, ঘোড়া ও কুড়াপাখির

আকৃতি দেখে প্রকৃতি বিচার। হাসন রজা সৌখিন ব্যক্তি ছিলেন। অন্য জমিদারের মতো তাঁরও কুড়াপাখি ও ঘোড়া পুষবার সখ ছিল। কুড়াপাখির সাহায্যে জংলীপাখি ধরা অনেকের সখ ছিল। হাসন রজার অনেক দামী ঘোড়া ছিল, সেগুলোর নাম জঙবাহাদুর, চান্দমাদি, খোদাদাদ, বাংলা বাহাদুর, মুল্কি, ইছিয়ার ডরী, মিটসন প্রভৃতি।' প্রায়ই তাঁর ঘোড়া শ্রীহট্টের ঘোড়দৌড়ের মাঠে বাজি জিততো। একবার জঙবাহাদুর ঢাকার নবাবের অপরাজিত ঘোড়া দরিয়াবাজকেও হারিয়ে দিয়েছিল।

বর্ষায় সুনামগঞ্জের রাস্তা কর্দমাক্ত হলে হাসন রজা অনেক সময় লোকের কাঁধে চড়ে বাজারে ভ্রমণ করতেন। সৈয়দ মূর্তাজা আলী লিখছেন— 'শোনা যায়, হাসন রজা একবার ঢাকা এসে সদরঘাটে কাদা দেখে তাঁর সঙ্গী লোকদের কাঁধে চড়েছিলেন। তাঁকে মানুষের কাঁধে চড়তে দেখে কুট্টিরা ভিড় করে টিটকারি দিতে থাকে। কাজেই হাসন রজাকে ঢাকা শহরে মানুষ চড়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হয়।'

তাঁর বাড়িঘর জমিদার বাড়ির যোগ্য নয় বলে কেউ কেউ অনুযোগ করলে হাসন উত্তর দেন—

লোকে বলে যে ঘরবাড়ি ভালা নায় আমার
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যের মাঝার।
ভালা করিয়া ঘর বানাইমু বাঁচমু কতদিন আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাকনা চুল আমার।
আগে যদি জানত হাসন বাঁচব কত দিন
ঘরবাড়ি বানাই রাখত করিয়া রঙিন।
এই ভাবিয়া হাসন রজা ঘর দুয়ার না বান্ধে
কোথায় নিয়া রাখব আল্লায় তার লাগিয়া কান্দে।

রবীন্দ্রনাথ হাসন রজার যে গানটি উদ্ধৃত করেছিলেন তা হল—

আমা হইতে আসমান জমিন আমা হইতে সব
আমি হইতে ত্রিজগৎ আমি হইতে রব। (রব—আল্লাতালা)

হাসনের আর একটি গান :

বাত্তি জ্বালাইয়া দেখ শ্যাম রাধার ঘরে করে কাম।
কেহ বলে রাধার কানু, হাসন রজা বলে দিলারাম।
প্রেমের বাত্তি জ্বালাইয়া দেখ তারে নিরখিয়া
হৃদমন্দিরে বিরাজ করে হাসন রজা ধরে নাম।

হাসন রজার মৃত্যু হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে।

সাহিত্যে নবযুগ

উনিশ শতকে ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষার প্রসারে ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে শ্রীহট্টের লেখকদের সৃষ্টিতেও পরিবর্তন সূচনা হয়— সাহিত্যের আদর্শ এবং রূপ দুই-ই বদলাতে থাকে।

গ্রামাঞ্চলে তখনো মনসামঙ্গল, পাঁচালী প্রভৃতি পঠিত হত। দুয়েকজন কবির রচনা তখনো প্রাচীন রীতির অনুসরণ করছিল। লালা আনন্দরাম বা উকিল রত্নগোবিন্দ চৌধুরী তখনো প্রাচীন ধাঁচের ব্রজবুলি পদ লিখতেন, যেমন রত্নগোবিন্দের নামে প্রচলিত একটি পদ

নীপমূলে সুন্দব শ্যাম চন্দ
হেরইতে সহচরি ভৈ গেনু ধন্দ।
রোমাবলিগণ তৈখনে জাগি
বিহিপায়ে মাগল লোচন লাগি।
বিহি যব্ না পূরল তাকর আশ
স্বেদছলে রোদন করু পরকাশ। ইত্যাদি

শ্রীহট্ট সহরের রাসবিহারী দত্ত ও রত্নগোবিন্দ চৌধুরীর মধ্যে এজাতীয় কবিতার রচনার প্রতিযোগিতা হত। কবির লড়াই জনপ্রিয় ছিল— বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কবিব লড়াই জীবন্ত ছিল। কবিওয়ালাদের প্রভাব উনিশ শতকের মধ্যভাগে অনেক কবির কাব্যে অনুভব করা যেত। বাণিয়াচঙ্গের কমলনারায়ণ বিশ্বাস (জন্ম ১৮২৮ খ্রীঃ) ফার্সি, হিন্দি, সংস্কৃতে দক্ষ ছিলেন, স্বয়ং একজন গায়কও ছিলেন। তাঁর রচিত একটি গান উদাহরণ স্বরূপ উদ্‌ধৃত করা যায়—

মা কালি! দুঃখের কালি কেন মাখালি আমাকে।
লেগেছে যে কালি
বুঝি চিরকালি
ঘুচাও মনের কালি কাল নিবারিকে।
যায় না মনের কালি
কালে দিলে কালি
যাবে অন্তকালি দেখে মন-কালি।
মরণ আজিকালি
তুমি মহাকালী
ব্রজে কৃষ্ণকালী দক্ষিণা কালিকে।
যে পদকমল হরহৃদ্‌কমলে
সে পদ কমলে বঞ্চিত কমলে
নয়ন কমলে হের মা কমলে বদন কমল কোমল হাসিকে।।

মৈনাবাসী রাজীবলোচন দাসের 'পদ্যপ্রসূন' কাব্যও প্রাচীন রীতির অনুবর্তী। হাসন রজার রচনার কথা বলা হয়েছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র সাত বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্য আধুনিকতার স্পর্শবিহীন। সে কাব্যের ভাববস্তু ভারতীয় চিন্তাব সুপ্রাচীন ভান্ডার থেকে সংগৃহীত। তিনি সূফী বাউল ধারার কবি।

উনিশ শতকের মধ্যভাগেও রাধানাথ পদ্মাপুরাণ ও স্ত্রীগেয় গীতাবলি 'রাধানাথ সঙ্গীত' রচনা করেছিলেন। দুটি নাটকও এসময় লেখা হয়— কমলনারায়ণ বিশ্বাসেব 'বৃষকেতু' ও কৃষ্ণচরণ দাসের 'বিজয়মাধব' নাটক।

প্রকৃত অর্থে কাব্যে নবযুগের সূচনা করেন প্যারীচরণ দাস। পদ্যপুস্তক, ভারতেশ্বরী, মিত্রবিলাপ, রণরঙ্গিণী প্রভৃতি তাঁর রচিত কাব্য। প্যারীচরণের কাব্যের মূল সুর স্বদেশপ্রাণতা ও শ্রীহট্টের নৈসর্গিক সৌন্দর্য—

যে দেশের বনশোভা অতুলন ভবে,
প্রকান্ড দীঘল দ্রুম আপন গৌরবে
উচ্চশিরঃ ; ঝোপঝাড়ে সুষমাব সীমা
বিভূষণা বনবধূলতার মহিমা।

* * *

অদূরে পাহাড় শোভে নীল নভঃ তলে
কত নদী নির্ঝরিণী উপবীত গলে,
অপূর্ব গম্ভীর মূর্তি প্রশান্ত দর্শন
দেখ দূরে, যেন যোগী যোগে নিমগন।

রামকুমার নন্দী মজুমদার প্রণীত 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য' বাঙালী কাব্যরসিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এটি মধুসূদনের বিখ্যাত কাব্যের উত্তরচ্ছলে লিখিত। বামকুমারের অপর কাব্যদ্বয় 'উষোদ্বাহ' ও 'দশমহাবিদ্যা' এবং নাটক 'বলদমহিমা' সেকালে প্রশংসিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের কবিদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ব্যক্তি শরচ্চন্দ্র চৌধুরী। তিনি 'মহাপূজা', 'আর্যসঙ্গীত'. 'চিতোবের বীর গান', 'সুরেন্দ্রকারাগার' প্রভৃতি কয়েকটি কাব্য রচনা করেন। 'দেবীযুদ্ধ' আসলে একটি রূপক কাব্য। এর রূপকাবরণের অন্তরালে ছিল ইংরাজ বিদ্বেষ। ব্রিটিশ সরকার এটির প্রচার নিষিদ্ধ করে দেন, কিন্তু শরচ্চন্দ্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল।

নবযুগের সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ গদ্যের আবিষ্কার ও দ্রুত সমৃদ্ধি। শ্রীহট্ট বাসীদের মধ্যে প্রথম গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি। তাঁর 'পুরাণ বোধোদ্দীপনী' ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্য তখন সদ্য হাঁটতে শিখেছে। বিদ্যাসাগরের পূর্বে এবং প্রায় মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের সমকালে কৃষ্ণচন্দ্র নবলব্ধ গদ্য রীতির প্রয়োগে যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন।

সংবাদ ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যও শক্তিশালী গদ্য লেখক ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের আমলে।

নবযুগের সাহিত্যিকদের শীর্ষে দাঁড়িয়ে আছেন বিপিনচন্দ্র পাল। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বিপিনচন্দ্র পাল আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রধান স্থপতিদের অন্যতম। বিপিনচন্দ্র মুখ্যত সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর গদ্য শৈলী আজো অনুকরণযোগ্য। জেলের খাতা, চরিতকথা, নবযুগের বাংলা, মার্কিণে চারিমাস, চরিত চিত্র প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। বিশেষতঃ 'সত্তর বৎসর' গ্রন্থটির রচনা সৌষ্ঠব তুলনাহীন। বিপিনচন্দ্র কৃত বঙ্কিম মূল্যায়ন কিংবা মূর্তিপূজাতত্ত্ব যিনিই পাঠ করেছেন তিনিই জানেন সমালোচকরূপে তাঁর আসন কত উঁচুতে।

পুরাতত্ত্বমূলক ও ঐতিহাসিক গবেষণামূলক রচনায় অচ্যুতচরণ চৌধুরী ও পদ্মনাথ সরস্বতীর কৃতিত্ব সুবিদিত। কামরূপ শাসনাবলী ও শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গবেষণা জগতের দুটি প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু এঁরা অন্যবিধ গদ্য রচনায়ও সুদক্ষ ছিলেন।

শ্রীহট্টের লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রথম গ্রন্থ লেখেন উপেন্দ্রকুমার কর। গ্রন্থটির নাম 'গীতাঞ্জলির সমালোচনার প্রতিবাদ'। ভারতচন্দ্র চৌধুরীর লিখিত 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থটি সুধী সমাজে আদৃত হয়েছিল। 'গৌতম বুদ্ধ' প্রণেতা রমেন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্ভাবনাময় জীবন অকালে অবসান হয়। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখেছেন কয়েকটি জীবনী— সারদানন্দ প্রসঙ্গ, ব্রহ্মানন্দ লীলা-কথা, প্রেমানন্দ-প্রেমকথা।

লোকগীতি ও কোষগ্রন্থ

স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শ্রীহট্টের অনেক লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় এই সঙ্কলনটি প্রকাশিত না হলেও কিছুকাল পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছে।

অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 'বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি', নামে যে কোষগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তাতে শ্রীহট্টবাসী অনেক মুসলমান কবির সন্ধান পাওয়া যায়।

পীর শাহজলালের আগমনের পরে শ্রীহট্টে মুসলমানদের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এদের একটি বড় অংশ ধর্মান্তরিত হিন্দু। এদের আচার-আচরণ ও লোকগীতে এখনো কিছু হিন্দু ভাবধারার জের লক্ষ করা যায়। মহরমের একটি জারি গানে বলা হয়েছে—

আগে আল্লা নিরঞ্জন শূন্যে তোমার সিংহাসন
যখন আছিলা তুমি না ছিলা কোনজন।

এই পদে নিরঞ্জন শব্দের প্রয়োগ কৌতূহলজনক। শ্রীহট্টের মুসলমান কবিদের অনেকেই সুফী বা মরমিয়া ভাবের সাধনা করতেন।

'সিলেটী নাগরী'

শ্রীহট্টের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক শ্রেণীর গ্রন্থ প্রচলিত— এগুলি যে হরফে ছাপা তা দেখতে অনেকটা দেবনাগরী হরফের মত হলেও প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন জাতীয়। একে বলা হয় 'সিলেটী নাগরী'। সিলেটী নাগরীতে হকিকতে সিতারা, হজনামা, বাহরাম, জহুরা, চন্দ্রমুখী, এস্কে দেওয়ানা, খবর নিশান, রমণী দর্পণ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ ছাপা হয়। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নামক গ্রন্থে সিলেটী নাগরীর উল্লেখ আছে।

অধিকাংশ গ্রন্থ ছাপা হত কলকাতায় তালতলার কোনো কোনো প্রেসে।

মহিলা সাহিত্যিক

শ্রীহট্টের মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন 'হাজিবিবি' নামে প্রসিদ্ধ সহিফাবানু। ইনি বাংলা ও উর্দু দুই ভাষাতেই কবিতা লিখতেন। 'সহিফাসঙ্গীত', 'ইয়াদপারে সহিফা', 'ছাহেবানের জারি'-র লেখিকা এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে 'অন্তঃপুর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। রত্নবালা দে বিশ্বাস রচিত 'পৌরাণিক সতীচিত্র' নামক দীর্ঘ রচনাটি একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। লেখিকার মৃত্যুর পর তাঁর স্বামী উমেশচন্দ্র দে বিশ্বাস এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। হেমপ্রভা কর 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। অধ্যক্ষা সুপ্রভা দেবচৌধুরী ইংরাজি বাংলা দুভাষাতে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন ও একটি কাব্য প্রকাশ করেছেন। সবিতা দাস (চট্টোপাধ্যায়) লিখেছেন বাংলা সাহিত্যে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের দান বিষয়ে গ্রন্থ। মালতী শ্যাম ও জ্যোৎস্না চন্দ বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সুরমা ঘটক তাঁর স্বামী ঋত্বিক ঘটক সম্বন্ধে একটি স্মৃতিকথা রচনা করেছেন। তরুণ কবিসমাজে রুচিরা শ্যামের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।

সাংবাদিকতা

সংবাদপত্র সেবায় শ্রীহট্টবাসীদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য 'সংবাদ ভাস্কর' ও 'রসরাজ' সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। সাংবাদিকরূপে বিপিনচন্দ্র পালের আসনও ছিল উঁচুতে,— তিনি সম্পাদনা করেন Swaraj, The Hindu Review, The Independent, The Tribune (লাহোর)। বিপিনচন্দ্রের সমকালে রাধানাথ চৌধুরী 'পরিদর্শক' সম্পাদনায় খ্যাতি অর্জন করেন। সংবাদপত্রের

সঙ্গে যুক্ত শ্রীহট্টবাসীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— প্যারীচরণ দাস (শ্রীহট্ট প্রকাশ), ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব (জনশক্তি), অচ্যুতচরণ চৌধুরী (কমলা, শ্রীহট্টদর্পণ), সতীশচন্দ্র দেব (শ্রীভূমি), লালা প্রসন্নকুমার দে (শ্রীহট্ট মিহির), শশীন্দ্র সিংহ (The Weekly Chronicle), নবনীকান্ত গুপ্ত ও নীরেন্দ্রনাথ দেব (The Sylhet Chronicle), চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (সুরমা), চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ (হিতবাদী), উমাপদ ভট্টাচার্য পঞ্চতীর্থ (আনন্দবাজার), সুরেশচন্দ্র দেব (Hindusthan Standard, Nation, Modern Review প্রভৃতি), বিরজানাথ ভট্টাচার্য (Forward, আনন্দবাজার), সরোজ সেন (আনন্দবাজার), আলতাফ হোসেন (Dawn), আবদুল মতিন চৌধুরী (যুগভেরী প্রভৃতি), অমিতাভ চৌধুরী (আনন্দবাজার, যুগান্তর), তুষার পণ্ডিত (আনন্দবাজার), অমিত নাগ (মূলতঃ ফ্রি-ল্যান্স, অমৃত বাজারের সঙ্গে যুক্ত), অমিয় দেবরায় (ফ্রি-ল্যান্স, আনন্দবাজারের সঙ্গে যুক্ত), ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য (মাসপয়লা), জ্যোতির্ময় নন্দী মজুমদার (স্বাধীনতা, কালান্তর), স্বামী স্বাহানন্দ (The Vedanta Kesari, Madras), দ্বারেশ শর্মাচার্য, (যুগান্তর), অনাথবন্ধু দাস (যুগবাণী), নলিনীকুমার ভদ্র (প্রবাসী), যোগানন্দ দাস (শনিবারের চিঠির প্রথম সম্পাদক, অন্যান্য পত্রিকা), লীলা রায় (জয়শ্রী), সৈয়দ মুজতবা আলী (আনন্দবাজার), শশধর সিংহ (Hindusthan Standard), বিধুভূষণ চৌধুরী (যুগশক্তি), রমেশচন্দ্র দাস (নবযুগ) প্রভৃতি।

গিরিজাভূষণের সম্পাদনায় ব্যঙ্গরসাত্মক পত্রিকা 'বার্ষিক ফুলতত্ত্ব প্রকাশিকা' ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর পয়লা এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হত। এটি কবিতার আকারে লিখিত হত।

উচ্চস্তরের সাহিত্য পত্রিকারূপে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'মাসিক বিজয়া', অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি সম্পাদিত মাসিক 'কমলা' এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব সম্পাদিত বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শন সংক্রান্ত আলোচনা পত্র 'শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ' বাঙলার বিদ্বৎ সমাজে সংবর্ধিত হয়েছিল। কল্যাণী থেকে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীবাসুদেব ধর্মবিষয়ক উচ্চাঙ্গের ত্রৈমাসিক পত্র।

তরুণতর লেখকদের পত্রিকারূপে রোহীন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 'ডাক', সুখময় বসু সম্পাদিত 'পদক্ষেপ', শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য সম্পাদিত 'অতন্দ্র', 'শতক্রতু', অরিন্দম সেনগুপ্ত সম্পাদিত Anvil সবিশেষ উল্লেখ্য।

শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত আরো দুয়েকটি অচিরস্থায়ী কিন্তু উৎকৃষ্ট পত্রিকার মধ্যে নাম করা চলে। শিবধন বিদ্যার্ণব সম্পাদিত 'সুচিন্তা', জ্ঞানাঞ্জন পাল সম্পাদিত 'সংহতি' ও জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বৈজয়ন্তীর'। জগদীশ ভট্টাচার্যের 'কবি ও কবিতা' এখনো নিয়মিত রূপে ছাপা হয়। শ্রীহট্ট সহরের একটি দ্বিমাসিকপত্র 'বলাকা' এককালে তরুণ লেখকদের মুখপাত্ররূপে বিশেষ জনপ্রিয় হয়, এ পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও প্রগতিশীল লেখকদের অনেকের রচনা মুদ্রিত হয়েছে।

সাহিত্য পত্রিকা 'বিবর্তন', 'শিখা' প্রভৃতি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মফঃস্বলের সাপ্তাহিক পত্রের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল 'স্বাধিকার', 'পল্লীবাণী'।

মনোজিৎ দাস সম্পাদিত 'মাৎ-কথা' পত্রিকাটির মাত্র এক সংখ্যা বার হয়েছিল। এর সমস্ত লেখা, মায় বিজ্ঞাপন, সিলেট-কাছাড়ের উপভাষায় লেখা হয়েছিল।

সাহিত্য সম্মেলন ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠান

বিংশশতাব্দীতে শ্রীহট্টে বেশ কয়েকটি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় করিমগঞ্জ সহরে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে, সভাপতিত্ব করেন শরচ্চন্দ্র চৌধুরী। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ভুবনমোহন বিদ্যার্ণবের সভাপতিত্বে তৃতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয়। সরকার এতে রাজনীতির গন্ধ পেয়ে ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করেন। শ্রীহট্ট সহরে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় প্রগতিলেখক ও শিল্পী সম্মেলন। সভাপতিরূপে বুদ্ধদেব বসু যে ভাষণ দেন তাকে প্রগতি সাহিত্যের একটি চমৎকার ইস্তাহাররূপে গণ্য করা যায়। এর আগে শ্রীহট্ট সহরে প্রগতিলেখকেরা আরেকবার মিলিত হয়েছিলেন। সে অনুষ্ঠানে মুল্‌ক রাজ আনন্দ, সজ্জাদ জহির প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট সহরে অনুষ্ঠিত সুরমা উপত্যকা সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সজনীকান্ত দাস। সেই সঙ্গে গোপাল হালদারের সভাপতিত্বে ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পীদের একটি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে একটি সাহিত্য সভায় ভাষণ দেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৫ ও ৪৬ সালের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীহট্টের সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ স্থাপিত হয় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রধানতঃ অধ্যাপক শশিমোহন চক্রবর্তীর উদ্যোগে, রায়বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য পরিষদের জন্ম। পদ্মনাথ সরস্বতীর সমগ্র গ্রন্থসংগ্রহ সাহিত্য পরিষদের লাইব্রেরিতে স্থান পায়। পুরাতাত্ত্বিক অনেক নিদর্শন এবং পুঁথিও তাঁরা সংগ্রহ করেন। সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব পত্রিকা ছিল। স্বকীয় ভবনের উদ্বোধন উৎসবে সভাপতিত্ব করেছিলেন কালিদাস নাগ।

দেশবিভাগের পূর্বে শ্রীহট্ট সহরে যে সকল সাহিত্য সমিতি গঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে 'ক্ষীরোদ সাহিত্য সভা', 'বাণীচক্র', 'কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ', 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' সবিশেষ উল্লেখনীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে শ্রীহট্টে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের শাখা স্থাপিত হয়। এর প্রাণপুরুষ ছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ শুধু অভিনয় ও সঙ্গীতে জোয়ার আনেন নি, তাঁদের প্রেরণায় কবি ও গল্প লেখকেরাও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

সারদাচরণ শ্যামের স্মৃতিরক্ষাকল্পে ইন্দেশ্বর টি কোম্পানী ১৯৩৬ সালে 'সারদা স্মৃতিভবন' নামে একটি বৃহৎ সভাগৃহ নির্মাণ করেন। প্রশস্ত মঞ্চযুক্ত এই হলটির গঠন ছিল কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের অনুরূপ। লোকনাথ রতনমণি টাউন হল ব্যতীত 'সারদা স্মৃতি ভবনেও' বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। সহরের সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশে এই ভবনটির দান কম নয়।

আধুনিক সাহিত্যিকবৃন্দ

১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীহট্ট থেকে একদল সাহিত্যিক শান্তিনিকেতনে যান। এঁদের মধ্যে একজন তরুণ যুবক ছিলেন যিনি শ্রীহট্টের সাহিত্য চর্চায় প্রকৃত অর্থে আধুনিকতার সঞ্চার করেন। ইনি কবি অশোকবিজয় রাহা। শ্রীরাহা প্রসিদ্ধ বংশের সন্তান (এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন প্রসিদ্ধ উকিল বীরেন্দ্রকুমার রাহা, অধ্যাপক প্রমোদকুমার রাহা, ডাক্তার সত্যেন্দ্রকুমার রাহা)। অশোকবিজয় রাহার কবিখ্যাতি ছাত্রজীবনেই ছড়িয়ে পড়ে। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকা ও প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে তিনি প্রথম থেকে জড়িত। তাছাড়া কবি অমিয় চক্রবর্তী ও অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর পুরোনো সুহৃৎ। শ্রীহট্টের তরুণ কবিদের প্রায় সবার উপরে অশোকবিজয় রাহার অল্পবিস্তর প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রধান কাব্য ডিহাং নদীর বাঁকে, রুদ্র বসন্ত, ভানুমতীর মাঠ, জলডম্বরু পাহাড়, রক্তসন্ধ্যা, উড়োচিঠির ঝাঁক, যেথা এই চৈত্রের শালবন। কবিতার শিল্পরূপ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে তাঁর দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ আছে। সম্প্রতি লিখেছেন 'বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ'।

অন্তঃশীলা ও সোনার হরিণের কবি রসময় দাস অশোকবিজয় রাহার সমসাময়িক। এঁর কাব্যে ছন্দোকুশলতা ও প্রশান্তি বিশেষ হৃদ্য। পণ্ডিচেরিবাসী সমালোচক নলিনীকান্ত গুপ্তের 'বাংলার প্রাণ' গ্রন্থে অশোকবিজয় রাহা ও রসময় দাসের কাব্যের মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ রয়েছে। রসময় দাসের কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি।

কবি প্রজেশকুমার রায়ের শক্তি ছিল হালকা চালের কবিতায়। ইনিও 'কবিতা' পত্রিকার লেখক। যাত্রারম্ভ, চাঁদ ও রাহু, জনসমুদ্র, এক যে ছিল, একটি ফুলের গুচ্ছ ইত্যাদি বেশ কয়েকটি কাব্য প্রজেশকুমার লিখেছিলেন। 'জনসমুদ্র' বইটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নাম করেছিল। গদ্য রচনা ও অনুবাদ কার্যেও প্রজেশকুমারের দক্ষতা ছিল। দুঃখের বিষয় দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক আক্রমণের মুখে প্রজেশকুমার নিহত হন।

কবি মৃণালকান্তি দাশ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের পর থেকে পরমানন্দ সরস্বতী নামে লিখেছেন। তিনি প্রথম খ্যাতিলাভ করেন 'আকাশ' ও 'দিগন্ত' এই দুটি কাব্য লিখে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'নিরুক্ত' এবং বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' এই দুটি পত্রিকার সঙ্গেই মৃণালকান্তির যোগ ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও পরমানন্দ সরস্বতীর কবিসত্তা ছিল নিত্যনবসৃষ্টিপরায়ণ। তাঁর কবিতায় একটি রক্তাক্ত হৃদয়ের জ্বালা বিকীর্ণ হয়েছে। তাঁর নতুন কাব্যের মধ্যে বিশিষ্ট 'অক্ষর', 'আহিতাগ্নি'।

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য ও জগদীশ ভট্টাচার্য শক্তিমান কবি হলেও সম্ভবতঃ আধুনিক কবি বলে গণ্য হবেন না। জগদীশ ভট্টাচার্য শনিবারের চিঠির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'কলেজবয়' ছদ্মনামে লেখা তাঁর ব্যঙ্গ কবিতার সংকলন 'ব্ল্যাক বোর্ড' সম্ভবতঃ তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য।

রামেন্দ্র দেশমুখ্য অশোকবিজয় রাহা বা মৃণালকান্তির মতো ব্যাপক প্রভাব বিস্তার না করলেও শক্তিশালী কবি। তাঁর প্রধান কাব্য 'শতপুষ্প'।

দেশ বিভাগেব পব শ্রীহট্ট কাছাড়ে ক'জন নবীন কবি শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিমল চৌধুরী, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, উদয়ন ঘোষ, জিতেন নাগ, উমা ভট্টাচার্য, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, রুচিরা শ্যাম, শান্তনু ঘোষ, রণজিৎ দাস ও মনোতোষ চক্রবর্তী। 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' নামে এঁদের কবিতার একটি চমৎকার সংকলন গ্রন্থ বেরিয়েছে।

নতুন কবিদের মধ্যে শোভন সোম, অতুলরঞ্জন দেব, করুণাসিন্ধু দে, পীযূষ রাউত, কিশোবরঞ্জন দে-র কথা না বললে অন্যায় হবে। করিমগঞ্জের প্রাক্তন ছাত্র মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা থেকে কয়েকটি কবিতাব বই বাব কবেছেন। তিনি 'পুনর্মূল্যায়ন' নামে একটি সাহিত্য সাময়িকীও সম্পাদনা করেন।

গল্প-উপন্যাসে শ্রীহট্টীয় লেখকদের কৃতিত্ব কবিদের মতো উঁচুদরের হয় নি। কিন্তু ক'জন লেখকের কথা বলা কর্তব্য। শ্রীহট্ট কাছাড়ের পটভূমি নিয়ে লেখা সবচেয়ে পুরোনো কাহিনী সম্ভবতঃ হারাণচন্দ্র রাহা প্রণীত 'বণচণ্ডী'। দীনবন্ধু মিত্রের কমলেকামিনী নাটকেও মণিপুর কাছাড়ের একটি পুরোনো কাহিনী ব্যবহৃত হয়েছে। ('যুবনাশ্ব' মনীশ ঘটক রচিত 'কনখল' উপন্যাসে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীহট্টের জীবনযাত্রার চিত্র পাওয়া যায়)। শ্রীহট্টের লেখকদের রচিত প্রাচীনতম উপন্যাসের অন্যতম বিপিনচন্দ্র পাল রচিত 'শোভনা' (১৮৮৪)। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে হেমনলিনী নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন লাবণ্যচন্দ্র গোস্বামী। ত্রিশের দশকে 'অন্ধের বাঁশী' ও 'বাগিচার কুলি' শ্রীহট্টের জীবনধারার চিত্রসমন্বিত এই দুটি উপন্যাস লেখেন ইঞ্জিনিয়ার সাহিত্যিক লাবণ্যকুমার চৌধুরী। (মূলক বাজ আনন্দের Two Leaves and a Bud উপন্যাসটিরও প্রকৃত পটভূমি শ্রীহট্টেব চা-বাগান)। দেশ বিভাগের পবে প্রকাশিত এঁর তৃতীয় উপন্যাস 'মা ও সন্তান' গ্রন্থেরও পটভূমি শ্রীহট্ট।

ত্রিশেব দশকে কলকাতার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছোটগল্প লিখে নাম করেন বীরেন দাশ ও মন্মথকুমার চৌধুরী। কৃষ্ণময় ভট্টাচার্যের ছোটগল্প গ্রন্থ 'এদিক ওদিক', 'প্রবাহ' এবং উপন্যাস 'বরুণা' প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়। ছোটগল্প লেখক হিসাবে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন সত্যভূষণ চৌধুরী। তাঁর 'সগরল' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'লালসিং' গল্পটি প্রবাসীর পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হবার পর অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দুয়েকটি ভালো গল্প লিখেছিলেন অমিয়াংশু এন্দ।

'নবমিকার' লেখক ক্ষীরোদচন্দ্র দেব (কর্মজীবনে আইনজ্ঞ ও আসাম বিধানসভার সদস্য) অকালে মারা যান। নবমিকার গল্পগুলির প্লট বিদেশী কিন্তু যে কৌশলে ক্ষীরোদচন্দ্র এদের ভারতীয় পরিবেশে স্থাপন করেছেন তা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। 'আম গাছ'-এর মতো উপভোগ্য গল্প বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী নেই।

দ্বারেশ শর্মাচার্যের 'ভৃগুজাতক', 'ছক ও ছবি', 'অপরূপা', 'গোধূলির রঙ', 'ছায়া মিছিল' এই উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি সমাদৃত হয়েছে। তরুণ লেখক বনমালী গোস্বামীর কাহিনী গ্রন্থও উপভোগ্য।

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ অনেকদিন সুইডেনে ছিলেন। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তা সুইডিশ লেখিকা সেলমা লাগেরলফের একটি উপন্যাস তিনি মূল সুইডিশ ভাষা থেকে অনুবাদ করে 'প্রবাসীতে' প্রকাশ করেছিলেন।

শ্রীহট্টের কথাসাহিত্যিক মণ্ডলীতে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক নিঃসন্দেহে সৈয়দ মুজতবা আলী। মুজতবা আলীর গল্পের পটভূমিকা দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত, মানুষগুলিও বিচিত্র। লেখকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বিচিত্রতর। সব জড়িয়ে মুজতবা আলী তাঁর গল্প উপন্যাসে নতুন জীবনরসের আস্বাদ এনে দিয়েছেন। অবিশ্বাস্য, চাচাকাহিনী, শবনম, তুলনাহীনা,— প্রতিটি গ্রন্থেই মুজতবা আলীর নব নব উদ্ভাবনশালিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ 'চাচা কাহিনীর' গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের বড় সম্পদ। এক সিলেটি লস্করের জীবন নিয়ে লেখা 'নোনামিঠে' গল্পটি মুজতবা আলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মুজতবা আলীর স্থান সম্ভবতঃ নির্দিষ্ট হবে তাঁর রম্য রচনাগুলির উৎকর্ষের দ্বারা। মুজতবা আলী বিশ্বভারতীর প্রথম ছাত্রদলের অন্যতম, তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে ছিলেন দীর্ঘকাল। চাকরি করেছেন আফগানিস্থানে, বরোদায়, লেখাপড়া বন্-এ। আফগানিস্থানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে লেখা 'দেশেবিদেশে' বইটি মুজতবা আলীকে প্রথম প্রতিষ্ঠা দেয় এবং এটিকে তাঁর সফলতম সৃষ্টি বলা অযৌক্তিক হবে না। বহুভাষাবিদ বহুতথ্যজ্ঞ মুজতবা আলীর বৈদগ্ধ্য স্বতঃপ্রকাশ, কিন্তু মূলতঃ তিনি রসজ্ঞ, জীবন উপভোক্তা। রম্যরচনারূপে 'পঞ্চতন্ত্র' 'ময়ূরকণ্ঠী' 'ধূপছায়া' 'বড়বাবু' প্রভৃতি গ্রন্থ অতিশয় আকর্ষক।

কবি রামেন্দ্র দেশমুখ্য রচিত 'জনপদের ছন্দ' বইটি রম্যরচনায় উচ্চাসন পেয়েছে। কন্ট্রাকটর জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিভূল চৌধুরী (বিনয়ভূষণ লস্কর চৌধুরী) লিখেছিলেন 'পথ বেঁধে যাই', এটির প্রকাশক সজনীকান্ত দাস। 'চাকর' (মনোরঞ্জন গুপ্ত) প্রণীত চা-বাগানের কাহিনী আরেকটি উৎকৃষ্ট রম্যরচনা।

নলিনীকুমার ভদ্রের দুটি প্রসিদ্ধ ভ্রমণ কাহিনী— বিচিত্র মণিপুর ও বিশাল অন্ধ্র। সত্যনিষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনী লিখে খ্যাতি পেয়েছেন এযুগের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস। দ্বিচক্রে কোরিয়া ভ্রমণ, লালচীন, ভয়ঙ্কর আফ্রিকা, বলকান ভ্রমণ, তরুণ তুর্কী, ভবঘুরের গল্পের ঝুলি প্রভৃতি অজস্র গ্রন্থ লিখেছেন রামনাথ বিশ্বাস। অবশ্য আজকালকার উপাদেয় 'ভ্রমণ উপন্যাসের' রীতি তাঁর অজ্ঞাত ও অনায়ত্ত ছিল। কিন্তু ঘটনার যাথাতথ্যে ও সত্যবাদিতার গুণে তাঁর বর্ণনাগুলি জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী। ডাক্তার রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি বহু পত্রিকায় দেশে ও বিদেশে তাঁর ভ্রমণের বিবরণ ছাপিয়েছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'আবার চীন দেখে এলাম' আধুনিক ভ্রমণ সাহিত্যে বিশিষ্ট সংযোজন।

আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে উল্লেখনীয় নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত 'শিক্ষাব্রতীর আত্মকথা' ও সৈয়দ মূর্তাজা আলীর 'আমাদের কালের কথা'। প্রবাসীতে কয়েকজন মনীষীর জীবনকথা লেখেন হেমেন্দ্রনাথ দাস। বামদেবানন্দ প্রণীত 'রামপ্রসাদ', ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য প্রণীত 'মীরাবাঈ', প্রেমেশানন্দ প্রণীত 'রামানুজ চরিত' 'শঙ্কর চরিত' প্রভৃতিও সার্থক জীবনী সাহিত্য। অনিলকুমার চন্দ দেশ পত্রিকায় স্মৃতিকথামূলক দুয়েকটি রচনা লিখেছিলেন, সেগুলি খুব উপাদেয় হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা রাণী চন্দের 'পূর্ণকুম্ভ' প্রভৃতি গ্রন্থেও স্থানে স্থানে শ্রীহট্টের চিত্র আছে। ডঃ ভবতোষ দত্তের 'আটদশক' একটি স্মরণীয় আত্মজীবনী।

নাটকের ক্ষেত্রে শ্রীহট্টবাসী লেখকদের দান অল্প। মন্মথকুমার চৌধুরী প্রণীত 'হে বীর পূর্ণ কর', 'শব ও স্বপ্ন' 'বাঁধ ভেঙে দাও' ও গিরিশঙ্কর দাস লিখিত কয়েকটি একাঙ্ক নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। ত্রিশের দশকে কখানা নাটক লেখেন ভূপেন্দ্র শ্যাম ও বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী। নাটক রচনা, নাট্য পরিচালনা ও অভিনয়ে বিশেষ খ্যাতিমান হয়েছেন বিভাস চক্রবর্তী।

শিশুসাহিত্যে 'মাসপয়লা' সম্পাদক ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য ছিলেন বিশ্রুতকীর্তি। তাঁর 'মশার যুদ্ধ' বইটি এককালে শিশুদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল। গুরুসদয় দত্ত শিশুদের উপযোগী দুটি সুন্দর বই লিখেছিলেন— 'ভজার বাঁশী' ও 'চাঁদের বুড়ী'। অশ্বিনীকুমার শর্মা প্রণীত জাতক আখ্যায়িকা উৎকৃষ্ট শিশুসাহিত্য। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী লেখেন শিশুদের অভিনয়োপযোগী নাটক। বীরেন দাশের লেখা দু-একখানা গল্পের বই দেবসাহিত্য কুটির কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল।

সাম্প্রতিক কালে গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন দিক যাঁদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের কথা বলছি। কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর 'প্রাগৈতিহাসিক মহেন জো দড়ো' বইটি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত) এককালে সাড়া জাগায়। পরে তিনি আর বিশেষ কিছু লেখেন নি। পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রামাণ্য তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছেন। রাজমোহন নাথ একাধারে ইঞ্জিনিয়ার, সাহিত্যিক, পুরাতত্ত্ববিদ। বিশেষভাবে নাথ সম্প্রদায় বিষয়ে তাঁর কয়েকটি আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। ইনি অসমীয়া ভাষাতেও লিখে থাকেন।

অর্থনীতি বিষয়ে ভবতোষ দত্ত প্রণীত ধনবিজ্ঞান (বিশ্বভারতী প্রকাশিত) ছোট কিন্তু প্রামান্য বই। পরে তিনি বাংলায় আরো কটি আলোচনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর আগে অর্থনীতি বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ গ্রন্থ লেখেন ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ (এঁর লেখা ছোট গল্পের বইও আছে)।

দর্শনের আলোচনায় প্রথম বলতে হয় রাসবিহারী দাস কৃত 'কান্টের দর্শন' ও 'কতিপয় দার্শনিক প্রবন্ধ' বই দুটির কথা। দুরূহ কান্টদর্শনকে এত সহজ ভাষায় প্রকাশ করা আর কারো দ্বারা সম্ভব হত বলে মনে হয় না। বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের দার্শনিক আলোচনাগুলি 'দর্শন' এবং অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায় প্রবন্ধের আকারে ছড়িয়ে আছে, এখনো গ্রন্থবদ্ধ হয় নি। এগুলির উৎকর্ষ বিষয়ে পণ্ডিত মহলে দ্বিমত নেই।

ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী অর্থনীতিবিদ হলেও বিজ্ঞানের কথা সহজ ভাষায় লিখেছিলেন 'বিদ্ধি' বইয়ে।

বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান ডাক্তার রুদ্রেন্দ্রকুমার পালের। শারীর বিদ্যা ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর রচনাগুলির স্থান মর্যাদাপূর্ণ।

বাণেশ্বর সিংহ এককালে লিখেছেন কৃষি প্রসঙ্গে।

কয়েকটি উৎকৃষ্ট পাঠ্য পুস্তক লিখেছেন— ইতিহাসে কিরণচন্দ্র চৌধুরী, শিক্ষাতত্ত্বে কুলদাপ্রসাদ চৌধুরী ও ঋতেন্দ্রকুমার রায়, অর্থনীতিতে অরিন্দম সেন।

সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের রচয়িতা সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ মহাশয়। মহাভারতের সমাজ, মহাভারতের চরিতাবলী, রামায়ণের চরিতাবলী, তন্ত্র পরিচয়, ন্যায়দর্শন, মিতাক্ষরা বিভাগ ইত্যাদি তাঁর রচিত।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে দুখানা বড় বই লিখেছেন কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য।

সমাজতত্ত্ব বিষয়ে প্রাবন্ধিকরূপে সুনাম ছিল শশধর সিংহের। বিক্রমকেশরী রায়বর্মণ নতুন ধরনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পথ খুলে দিয়েছেন। নলিনীকুমার ভদ্রের আলোচনা প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত না হলেও তাঁর 'আসামের অরণ্যচারী' বইটি কৌতূহলোদ্দীপক। পূর্বভারতের জনজাতি বিষয়ে একটি মূল্যবান গ্রন্থ জ্যোতিরিন্দ্র চৌধুরী ও রবিজিৎ চৌধুরী লিখিত 'সুবনসিরির উপজাতি'।

আধুনিক কবিদের অধিকাংশ ছিলেন অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ছাত্র। তিনি আধুনিক সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তরুণদের পত্রপত্রিকায় লিখেছেনও। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে বলা যায় শ্রীহট্টের সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। পুরাণের পুনর্জন্ম ও রবীন্দ্রনাথ, জয়দেব ও রবীন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যে ট্র্যাজেডি ইত্যাদি বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন নতুন সাহিত্য, দেশ প্রভৃতি পত্রিকায়। পরিতাপের বিষয় আজ পর্যন্ত সম্প্রতি তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

নগেন্দ্রনাথ শ্যাম রবীন্দ্র কাব্যে রূপ ও রস নামে একটি বই লিখেছিলেন ত্রিশের দশকে।

বৈশাখী বার্ষিকীতে 'কবিতার শিল্পরূপ' এবং বিশ্বভারতী পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন কবি অশোক বিজয় রাহা। রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতামালাও উপভোগ্য হয়। কিছুকাল পূর্বে তিনি আর একটি দামী সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন— 'বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ'।

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য কালিদাস সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছেন সেগুলি অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন।

জগদীশ ভট্টাচার্য প্রণীত 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' এবং 'কবিমানসী' সমালোচনা গ্রন্থরূপে সুখ্যাত। 'কবিমানসী'তে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্য বিষয়ে তাঁর গবেষণা গতানুগতিকতামুক্ত এবং অনেক অপ্রত্যাশিত বিস্ময় ও অনাবিষ্কৃত তথ্যের আকর।

বাংলা সাহিত্যের সমস্যা কণ্টকিত জটিল ইতিহাসকে প্রথম খুব সহজ করে উপস্থাপন করেন ভূদেব চৌধুরী 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' গ্রন্থের দুটি খণ্ডে। তাঁর এই গ্রন্থটির অনুকরণে

পরে অজস্র ইতিহাস গ্রন্থ আবির্ভূত হয়েছে। 'বাংলার ছোটগল্প ও গল্পকার' নামক বৃহদায়তন গ্রন্থ তাঁর পরিশ্রমশীলতা ও ব্যাপক জ্ঞান চর্চার প্রামাণ্য নিদর্শন।

অরবিন্দ পোদ্দার বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নতুন পথের নির্মাতা। 'বঙ্কিমমানস' রচনা করে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. ফিল্ উপাধি লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আগে কেউ মার্কসীয় বিচার পদ্ধতি আশ্রয় করে গবেষণায় ব্রতী হয়ে ডিগ্রীলাভ করেন নি। 'মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ', 'রবীন্দ্রমানস' প্রভৃতি গ্রন্থেও শ্রীপোদ্দার মার্কসীয় রীতি অনুসরণ করেছেন। সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর বহুমুখী অনুসন্ধিৎসার আর একটি অবদান 'ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক'।

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনাকালে রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন হয়েছিলেন। তাঁর রবীন্দ্রস্মৃতিমূলক গ্রন্থটিতে নেপথ্যজগতের বহু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের আলোচনার সংখ্যা বেশী না হলেও বাংলা ও অসমীয়া লোকসঙ্গীত বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণ ও মন্তব্য গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ।

অমিয় দেব দুয়েকটি পত্রিকায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছেন।

অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ লিখেছেন 'আধুনিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি'। সত্যেন্দ্রকান্ত মজুমদারের সমালোচনা গ্রন্থ দুটি— 'বাংলার কবি' ও 'শতাব্দীর কবি'। কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য প্রণীত 'সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় শ্রীহট্টের অবদান' এবং সুধীর সেনের 'বাংলা সাহিত্যে আসামের বাঙালীদের অবদান' তথ্যভূয়িষ্ঠ রচনা। শশিমোহন চক্রবর্তী সংকলিত ও আলোচিত 'শ্রীহট্টীয় প্রবাদ প্রবচন' দামী তথ্যপুস্তক। ভূমিকাংশটি সুখপাঠ্য।

যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য ও দ্বারেশ শর্মাচার্য কবি ক্ষমানন্দকৃত মনসামঙ্গল ও রায়শেখরের পদাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করেছেন।

ডাঃ সুজিৎ চৌধুরীর দু'টি মূল্যবান গ্রন্থ— প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য এবং শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস।

সংকলন গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 'বাণীচক্র' সাহিত্য সংসদ 'কবিপ্রণাম' নামে যে রচনা সংকলনটি প্রকাশ করেন সেটি ওই সময়ে প্রকাশিত শ্রদ্ধার্ঘসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। এতে শ্রীহট্টের লেখকেরা ব্যতীত প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি লিখেছিলেন। শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সুধীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহের প্রবন্ধটি গবেষকদের অনেক তথ্য যুগিয়েছে। 'কবিপ্রণাম' কথাটিও আজকাল বহুপ্রচলিত।

রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে করিমগঞ্জ থেকে সুখময় বসু ও সুধীর সেনের সম্পাদনায় 'রবিপ্রকাশ' নামে আর একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

ইংরাজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি

ইংরাজি ভাষায় শ্রীহট্টবাসীদের লিখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থের পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। তবু কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

বিপিনচন্দ্র পালের Memoirs of My Life and Times তাঁর স্বচ্ছ ও প্রাণবন্ত ইংরাজি রচনা রীতির সুন্দর দৃষ্টান্ত। ইংরাজি ভাষায় বিপিনচন্দ্রের লেখা আরো প্রায় কুড়িটি বই রয়েছে। শশিমোহন চক্রবর্তীর The Call নামক মৌলিক গল্পগ্রন্থ লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী লে মিজারেবল্‌সের উপাখ্যান কিশোরদের উপযোগী করে Jean Vulgean নামে প্রকাশ করেন। ব্রজসুন্দর রায়ের লেখা Aims and Ideals of Ancient Indian Culture তাঁর পাণ্ডিত্যের কিছুটা পরিচয় দেয়। রাসবিহারী দাস ইংরাজিতে লিখেছেন হোয়াইট হেড, কান্ট ও শঙ্করাচার্য বিষয়ে। অধরচন্দ্র দাস লিখেছেন যুক্তিবিজ্ঞান বিষয়ে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে। বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের আলোচনার বিষয় দর্শন বিজ্ঞান ও কার্যকারণবাদ। অশোক চন্দ প্রণীত Indian Administration (George Allen & Unwin) এবং সুরেন্দ্রকুমার দে রচিত Panchayeti Raj প্রশাসনিক বিষয়ে দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। শশিভূষণ দাস দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী ইংরাজি কবিতার বিশ্লেষণ করে কটি প্রবন্ধ লিখেছেন Calcutta Review পত্রে। তাছাড়া বেরিয়েছে তাঁর লেখা Phonetics and Intonation in Spoken English, Aspects of Wilfred Owen's Potery এবং Wilfred Owen's Strange meeting— A critical study । ভবতোষ দত্ত প্রণীত ভারতে অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ বিষয়ক ইংরাজি বইটি ছোট হলেও প্রয়োজনীয়। শশধর সিংহের ইংরাজি ভাষায় লেখা স্যার আশুতোষের জীবনী ও রবীন্দ্রনাথের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা তথ্যপূর্ণ রচনা। স্বামী শঙ্করানন্দ সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা নিয়ে লিখেছেন একটি বিতর্কিত গ্রন্থ। সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ ও পদ্মনাথ সরস্বতী নিজ নিজ ক্ষেত্রে ইংরাজিতে কিছু আলোচনা করেছেন। অমল হোম সম্পাদিত ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের বিশেষ সংখ্যাগুলি নানা দামী প্রবন্ধে পূর্ণ থাকতো। এদের কয়েকটি সংখ্যায় লিখেছিলেন সুরেশচন্দ্র দেব। অপূর্বকুমার চন্দের দুয়েকটি স্মৃতিমূলক নিবন্ধ বেরোয় হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড শারদীয় সংখ্যায়। অমরেশ দত্তের একটি সমালোচনা গ্রন্থ শেকসপীয়রের ট্রাজেডি বিষয়ে লেখা। রাধাকৃষ্ণণ সম্পাদিত Contemporary Indian Philosophy গ্রন্থে রাসবিহারী দাসের আলোচনাটি ওই বইয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। মনি নাগ ও বিক্রমকেশরী রায় বর্মণ লিখেছেন সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে। 'পাণিনি' ছদ্মনামধারী ফণী দত্ত লিখতেন রাজনৈতিক প্রসঙ্গে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও শিল্প বিষয়ে আলোচনা করেছেন প্রতাপাদিত্য পাল।

শশিভূষণ দাসের ইংরাজি কাব্যের নাম I Rember, I Remember। অমরেশ দত্ত একটি আন্তর্জাতিক কাব্য রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম হন, তাঁর অনেক কবিতা পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।

শ্রীহট্টবাসী কবিদের কিছু কিছু লেখা ইংরাজিতে অনুবাদ করেন দিগিন্দ্রনাথ দাস ও নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী।

সঙ্গীত-নৃত্য-চিত্রকলা

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চার জন্য শ্রীহট্টের দস্তিদারবাড়িব খ্যাতি বহুদিনকার। যামিনী দস্তিদার ও রজনী দস্তিদার দুই ভ্রাতাই ছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। সঙ্গীত বিষয়ে রজনীবাবু কয়েকটি বই লিখেছেন। শ্রীহট্টের গায়কদের মধ্যে ববীন্দ্রসঙ্গীত বহুদিন ধরে জনপ্রিয়। সাটিয়াজুড়ীব দস্তিদার বংশীয় অনাদিকুমার দস্তিদার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সঙ্গীতের একজন শ্রেষ্ঠ কর্ণধার ছিলেন। বিশ্বভারতী ছাড়া বেতার, চলচ্চিত্র এবং রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গেও অনাদিকুমার যুক্ত ছিলেন ট্রেনার রূপে। তিনি গীতবিতানেব প্রতিষ্ঠাতা। রবীন্দ্রসঙ্গীতেব স্বরলিপি প্রণয়নে অনাদিকুমারের দান অবিস্মবণীয়। অনাদিকুমাব শান্তিনিকেতনের ছাত্র হলেও ওখানে শিক্ষা দান কবেন নি। বীরেন্দ্র পালিত দীর্ঘদিন যাবৎ শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ভবনে যোগ্যতাব সঙ্গে শিক্ষাদান করছেন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতেব রসজ্ঞ মহলে বিশেষ সমাদৃত।

শ্রীহট্ট সহরের গায়কদের মধ্যে সম্মানিত ছিলেন কুমুদরঞ্জন গোস্বামী। আধুনিক সঙ্গীতে খ্যাতিমান হন প্রাণেশ দাস। ইনি প্রধানতঃ ঢাকা রেডিওর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বচিত সঙ্গীতের স্বরলিপিসহ একটি বই আছে— 'গোধূলির বাঁশী'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে শ্রীহট্টে যখন গণনাট্য সঙ্ঘেব কার্যধারা প্রসারিত হয় এর প্রধান পরিচালক হন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। এঁব বচিত ও সুব দেওয়া কয়েকটি গণসঙ্গীত (যথা 'কাস্তেটাবে দিও জোরে শাণ') সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রথম সঙ্গীত সংগ্রহ 'বিষাণ'। সম্প্রতি তাঁব আর একটি সঙ্গীত সংকলন বার হয়েছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে বর্তমানে লোকসঙ্গীত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলা চলে। তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত নির্মলেন্দু চৌধুবী পরে কলকাতায় গিয়ে লোকসঙ্গীত গায়করূপে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

কবিগানের ঐতিহ্য বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত জীবন্ত ছিল। এযুগে কবি সঙ্গীতে ও কবির লড়াইয়ে দক্ষতা দেখিয়েছেন প্রসন্নকুমার চন্দ, ফণীন্দ্র দাস ও নলিনী চক্রবর্তী। ফণীন্দ্র দাস উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেরও বিশিষ্ট শিল্পী। তাঁব গানেব বই 'খেয়ালীব' কয়েকটি গান আজো মার্গসঙ্গীতের ভক্তদেব কণ্ঠে শোনা যায়।

১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ শ্রীহট্ট এলে শহবের উপকণ্ঠে মাছিমপুর নামক মণিপুরী পল্লীতে গিয়ে 'মণিপুরী নৃত্য' দর্শন করেন। এই নৃত্যেব সৌন্দর্য ও শালীনতা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে অভিভূত করে। শ্রীহট্ট থেকে ফেরার পর তিনি শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যের শিক্ষক আনিয়ে এই নৃত্যের চর্চা শুরু করান।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রী অমলা দত্ত (প্রমোদচন্দ্র দত্তের কন্যা) সেখানকার নৃত্য ও অভিনয়ে পারদর্শিতা দেখিয়ে কবিগুরুর প্রিয়পাত্রী হন।

শ্রীহট্টের মহিলাদের দুটি নিজস্ব নৃত্যরীতি রয়েছে— বৌ নাচ ও ধামাইল নাচ। প্রথম নাচটি নববধূকে দেখাতে হয়, দ্বিতীয় নাচটি মহিলাদের সম্মিলিত নাচ। দুটি নাচই সংযত ও সম্ভ্রমদ্যোতক। শান্তিদেব ঘোষ তাঁর বাংলার গ্রামীণ নৃত্য গ্রন্থে এই দুটি নৃত্যের চিত্রসহ বর্ণনা দিয়ে উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

চিত্রশিল্পীদের মধ্যে কলকাতায় কমার্শিয়াল আর্টে আকৃষ্ট হন অনন্ত ভট্টাচার্য, গোপেশ চক্রবর্তী ও লালা বরদাপ্রসন্ন দাস (ইনি পূর্ণ চক্রবর্তী মহাশয়ের স্টুডিওর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন)। এযুগে শ্রীহট্টের দুজন শিল্পী কমার্শিয়াল আর্টে প্রভূত আধিপত্য করছেন— রণেন আয়ন দত্ত। অপেক্ষাকৃত তরুণ শিল্পীদের মধ্যে নাম করেছেন শোভন সোম, পার্থপ্রতিম দেব। কমার্শিয়াল আর্টে অর্ধেন্দু দত্ত ও রণেন বাগচীও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন।

রাধিকাবল্লভ রায়চৌধুরী একদা দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে ইনি সন্ন্যাসীতুল্য জীবনযাপন করেন। আর্ট কলেজের কৃতী ছাত্র দ্বিজেশ ধর অল্প বয়সে মারা না গেলে চিত্রজগতে উচ্চস্থান অধিকার করতেন।

শিল্পী প্রতাপ দেব দিল্লীর একটি মন্ত্রণালয়ে শিল্প নির্দেশক।

নিজেরা শিল্পী না হলেও শিল্প বিষয়ক আলোচনা করে থাকেন প্রতাপাদিত্য পাল ও অজিতকুমার দত্ত। শ্রীপাল আমেরিকার বস্টন মিউজিয়ামের কিউরেটার। শ্রীদত্ত নয়াদিল্লী ললিতকলা অ্যাকাডেমির সহ-সচিব।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অশ্বিনীকুমার শর্মা চিত্রশিল্পে দক্ষ ছিলেন এবং ছাত্রদেরও অনুপ্রাণিত করেছেন।

কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষক ও কৃতী ছাত্রছাত্রী

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে দেশবিভাগের কাল পর্যন্ত শ্রীহট্টের শিক্ষা জগতের ইতিহাস অশেষ গৌরবে পূর্ণ। শুধু ব্যাপকতায় নয় উৎকর্ষেও শিক্ষা শ্রীহট্টের জাতীয় জীবনে এক প্রধান স্থান অধিকার করে। শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ও শ্যামাচরণ দেবের মত মনীষী উচ্চতর পদলাভের লোভ পরিহার করে শিক্ষাবিস্তারে জীবনের সকল শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। রাজা গিরীশচন্দ্র রায়, নবকিশোর সেন, দুলালচন্দ্র দেব যে শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেন প্রমোদচন্দ্র দত্ত, সারদাচরণ শ্যাম, কামিনীকুমার চন্দ, দীননাথ দাস, রাজচন্দ্র চৌধুরী, সুখময় চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ধর্মদাস দত্ত, হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী, আবদুল করিম প্রভৃতি সমাজের মধ্যমণিরা আজীবন তার সেবা ও পুষ্টিসাধন করেছেন। দুর্গাকুমার বসু, গোবিন্দচরণ দাস, রাধানাথ চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, অভয়চরণ দাস, বৈকুণ্ঠ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র চৌধুরী, রাজচন্দ্র দাস, রজনীকান্ত দাস, কেদারেশ্বর দাশগুপ্ত, অশ্বিনীকুমার শর্মা, ক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত, দিগিন্দ্রনাথ দাস, নীরদবরণ গোস্বামী, কৈলাসচন্দ্র কর প্রভৃতি দিক্‌পালগণ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিগত শতবর্ষে প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। এঁদের কাছে শিক্ষালাভ করে শুধু শ্রীহট্টের ছাত্রছাত্রী নয় বহিরাগত অনেক ছাত্রছাত্রীও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় শ্রীহট্টের যে সকল ছাত্র প্রথম দশজনের মধ্যে স্থানাধিকার করেছিলেন তাঁদের মাত্র কজনের নামোল্লেখ করছি— গুরুসদয় দত্ত, দিগিন্দ্রনাথ দাস, বিপিন দে, ক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত, কুশীমোহন দাস, নীরদ ভট্টাচার্য, রাধারমণ দাস, অনিল দেব, নীরদবরণ গোস্বামী, সুধাংশু দত্তমজুমদার, প্রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য,

দেবপ্রসাদ দাসপুরকায়স্থ, নিস্তারণ ভট্টাচার্য, বামদেব ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, কাত্যায়নীদাস ভট্টাচার্য, ধ্রুবদাস ভট্টাচার্য, পরমেশ নন্দী, অজিতকুমাব পালিত, শিবপদ গুপ্ত, দুর্গেশ দেবচৌধুরী, তুহিনাংশুশেখর ভট্টাচার্য, বনবিহারী ভট্টাচার্য, অজিতকুমার চৌধুরী, রঞ্জন সোম, বসময দাস, মীরা দেব, রণজিৎ প্রভৃতি। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট সরকাবী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী কনক পুরকায়স্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রবেশিকা পবীক্ষায় সকল ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ইতিপূর্বে আর কোনো ছাত্রী এই গৌববের অধিকাবী হন নি। আই-সি-এস পরীক্ষায় গুরুসদয় দত্ত, প্রশান্ত চৌধুরী ও শিশির দত্ত, এবং আই. পি. পরীক্ষায় কুমুদ চৌধুরী ও দীনেশচন্দ্র দত্ত বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন কবেন। আসামের প্রাদেশিক শাসনকৃত্যকে যোগ্যতা দেখিয়েছিলেন বীরেন্দ্রলাল সেন, অবনীমোহন দাম, ভূপেন্দ্র দাম, পবিত্রকুমাব দাস, উপেন্দ্র রায়, প্রফুল্ল দেব এবং প্রাদেশিক পুলিশসার্ভিসে শ্রেষ্ঠ ছিলেন নূরমিয়া ও সুবোধচন্দ্র পালিত। স্বাধীনতা পববর্তীকালে আই-এ-এস পরীক্ষায় বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, অশোক পালিত, অরুণোদয় ভট্টাচার্য এবং আই-পি-এস পরীক্ষায় সত্যেন্দ্র দে চৌধুরী, শিবপদ গুপ্ত, এস. দত্তচৌধুরী, নিরুপম সোম প্রভৃতি কৃতিত্ব দেখান। ইংরাজ আমলে অডিট সার্ভিসে উচ্চ পদাধিকারী হয়েছিলেন অশোক চন্দ, নরেশ দেব, প্রফুল্ল চৌধুবী, কল্যাণকুমাব চৌধুরী, ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। সুবেন্দ্র ধব, সতীশচন্দ্র রায় এবং অপূর্বকুমাব চন্দ আই-ই এস পর্যায়ভুক্ত হন। অ্যাকাউন্টেন্সি পবীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন দীনেশচন্দ্র দত্ত, উপেন্দ্রকুমাব চৌধুরী, লালা হিমাংশুভূষণ দাস, (শ্রীহট্টবাসীদের মধ্যে প্রথম বিলাতের ইনকরপোরেটেড অ্যাকাউন্টেন্ট হন, পরে মার্টিন কোম্পানীর চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট), সুনির্মল দত্ত প্রভৃতি। ইন্জিনিয়ারিং-এ রমাকান্ত বায়, রাধামাধব রায়, গিরীশচন্দ্র দাস, (গোবিন্দচরণ দাসের পুত্র), বিধুভূষণ চৌধুবী, মোহিত চৌধুরী, ত্রিগুণা সেন, সুরেন্দ্রকুমার দে, রাজমোহন নাথ এবং ডাক্তারি পবীক্ষায় রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, রেবতী দত্ত চৌধুরী, রাজকুমাব দাস শ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে গণনীয়।

বিশ্ববিদ্যালয়েব বিভিন্ন পরীক্ষায় উচ্চস্থান দখল করে অথবা গবেষণাকর্মে দক্ষতার দরুণ যে সব শ্রীহট্টীয় ছাত্রছাত্রী দেশের মুখোজ্জ্বল করেন তাঁদের কজনের নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য এ তালিকা একান্ত অসম্পূর্ণ, মোটামুটি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়সীমা ধরে তালিকা তৈরি হয়েছে, মাত্র দুয়েকটি নাম পরবর্তীকালের।

প্রসঙ্গক্রমে বলে বাখি, দর্শনের ছাত্র বিপিন দে শ্রীহট্টবাসীদের মধ্যে প্রথম ঈশান স্কলার।

আরেকজন ছাত্র অন্যদিকে অসমান্যতা লাভ করেন। দেবজ্যোতি বর্মণ ১৭টি বিষয়ে এম. এ. পাশ করেছিলেন।

ইংরাজি — ধর্মদাস দত্ত, ব্রজসুন্দর রায়, যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী, দিগিন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শশিমোহন চক্রবর্তী, নীরদ ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশ দেব, শশিভূষণ দাস, প্রমোদচন্দ্র গোস্বামী, আলতাফ হোসেন, অমরেশ দত্ত, অরবিন্দ পোদ্দার।

বাংলা — নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কুঞ্জলাল দত্ত, দ্বারেশ শর্মাচার্য, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্র মজুমদার, জগদীশ ভট্টাচার্য, রাধারমণ দাস, শিশিররঞ্জন কর, অশোকবিজয় রাহা, বিন্দুবাসিনী দেব, বীণা ভট্টাচার্য, ভূদেব চৌধুরী।

সংস্কৃত	— কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আশুতোষ বিশ্বাস, কুঞ্জলাল দত্ত, রাকেশচন্দ্র শর্মা, শিশিররঞ্জন কর, দীনেশচন্দ্র দাস, সচ্চিদানন্দ ধর।
দর্শন	— সতীশচন্দ্র রায়, বিপিন দে, রাসবিহারী দাস, গোবিন্দচন্দ্র দেব, যতীশচন্দ্র দাস, উপেন্দ্র সোম, অধরচন্দ্র দাস, বামদেব ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রলাল সেন, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, হরেন্দ্র দে চৌধুরী, গুরুসদয় ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, আবতি দাস।
অর্থশাস্ত্র ও রাজনীতি শাস্ত্র	— শশধর সিংহ, দীনেশচন্দ্র দত্ত, ক্ষিতীশ চৌধুরী, কুশীমোহন দাস, ভবতোষ দত্ত, তুহিনাংশু শেখর ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, সুশান্তকুমার চৌধুরী, দেবজ্যোতি বর্মণ, বিভূতি গুপ্ত, সত্যেন্দ্র দে চৌধুরী, নীতীশরঞ্জন দে, মীরা দেব, অরিন্দম সেন।
ইতিহাস	— ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, রমেন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, সুধীব দেব, শশধর চক্রবর্তী, কুলদাপ্রসাদ চৌধুরী, কিরণচন্দ্র চৌধুরী, অসীম দত্ত, সতীজীবন দাস।
উর্দু	— দীনেশ দত্ত, (হায়দ্রাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি ও উর্দুর অধ্যাপক ছিলেন)।
গণিত	— মহেন্দ্র দে, প্রতাপ ভট্টাচার্য, বামাচরণ ভট্টাচার্য, রসিকরঞ্জন দেব, ক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত, আশুতোষ সেন, উপেন্দ্রকুমার মাল, সুশীলকুমার ভট্টাচার্য, শান্তিব্রত গুপ্ত, রমা দেব।
পদার্থবিদ্যা	— শশী মালাকার, নরেশ দেব, মণি দেব, প্রমোদকুমার রাহা, হীরেন্দ্রকুমার পাল, প্রেমতোষ শ্যাম, উপেন্দ্রকুমার দত্ত, সুধাংশু দত্তমজুমদার, সমরেন্দ্র সেন।
রসায়ন	— বিপিনবিহারী দাস, সুরেন্দ্রচন্দ্র ধর, নরেন্দ্রচন্দ্র দেব, বীরেন্দ্রকুমার নন্দী, বিপিনচন্দ্র দত্ত, বিধানরঞ্জন রায়, যোগেশচন্দ্র শর্মা, বিনয়কৃষ্ণ দত্তরায়।
উদ্ভিদবিজ্ঞান	— হীরেন্দ্রকুমার নন্দী, চিত্ততোষ দত্ত, কল্যাণকুমার পুরকায়স্থ, অমল চৌধুরী, দেবেন্দ্রবিজয় দেব।
প্রাণীবিজ্ঞান	— হীরালাল চৌধুরী (এঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে)।
রাশিগণিত	— রঞ্জন সোম, অমর পালিত, বিভাস দে।
নৃতত্ত্ব	— নিরুপম শ্যাম, বিক্রমকেশরী রায়বর্মণ।
ভূতত্ত্ব	— শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

শিক্ষাতত্ত্ব — কুলদাপ্রসাদ চৌধুরী, সত্যেন্দ্র মজুমদার।

পশু চিকিৎসাবিজ্ঞান — সচ্চিদানন্দ দত্ত।

শারীর বিদ্যা — রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল।

আইন — উপেন্দ্রকুমার কর, অনাথবন্ধু শ্যাম, তপেন্দ্র পাল, কিরণচন্দ্র চৌধুরী, সুকুমার চক্রবর্তী।

ব্যারিষ্টারি — রণধীর দস্তিদার, অনঙ্গ ভট্টাচার্য, শশধর চক্রবর্তী।

কৃষি বিজ্ঞান — প্রভাতচন্দ্র চৌধুরী।

বনসংরক্ষণ — চন্দ্রশেখর পুরকায়স্থ, রাজেন্দ্রনাথ দে, রমেশচন্দ্র দত্ত।

মুরারিচাঁদ কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে প্রবোধচন্দ্র সেন ও নীহাররঞ্জন রায় ইতিহাসবিদ ও সাহিত্য সমালোচকরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এঁরা শ্রীহট্টবাসী নন, তবে বিবাহ সূত্রে শ্রীহট্টের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। দর্শনশাস্ত্রে মণিপুরী ছাত্র রণবীর সিংহের কৃতিত্বের কথা পূর্বে বলা হয়েছে।

গ্রন্থাগার

শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে গ্রন্থাগারের একটি নিবিড় যোগ রয়েছে। পঞ্চখণ্ডের 'অনিপণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থাগার' সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারেও বহু বই সংগৃহীত হয়েছিল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ সম্ভবতঃ বিনষ্ট হয়েছে। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদে বাংলা পুঁথির মূল্যবান সংগ্রহ ছিল। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত সংগ্রহে পুঁথির সংখ্যাও কয়েক সহস্র। পদ্মনাথ সরস্বতীর ব্যক্তিগত গ্রন্থ সংগ্রহ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত ছিল।

পাবলিক লাইব্রেরি সমূহের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছিল শ্রীহট্ট শহরে 'প্রাইজ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি'। বিদ্যোৎসাহী প্রাইজ সাহেবের স্মৃতিতে এটি প্রতিষ্ঠিত। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও জমিদার হেমেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের সুপরিচালনায় এই গ্রন্থাগার দীর্ঘকাল জনসাধারণের মনের খোরাক যুগিয়েছে। ১৯৩৮ সালে স্থাপিত হয়েছিল বিপিনচন্দ্র গ্রন্থাগার। দরগা মহল্লায় কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের লাইব্রেরিটিও বেশ বড় হয়ে উঠেছিল।

কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি

বিংশশতকের প্রথমার্ধে শ্রীহট্টে অনেক বিশিষ্ট অতিথির আগমন ঘটে। জলসুকার রাজনৈতিক সম্মেলনে শ্রীঅরবিন্দ উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মাগান্ধী আসেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে, সে উপলক্ষে ঈদগার ময়দানে বিরাট সভা হয়েছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি যুব সম্মেলনে ভাষণ দেন। জাতীয় নেতাদের মধ্যে এসেছেন— জওহরলাল নেহেরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন,

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, সুভাষচন্দ্র বসু, মহম্মদ আলী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভি. কে. কৃষ্ণমেনন, বিধানচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সি. এফ. এন্ড্রুজ, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে মেঘনাদ সাহা ও সাহিত্যিকদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু, নজরুল ইসলাম, কামিনী রায়, বুদ্ধদেব বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, সজনীকান্ত দাস প্রভৃতি ভাষণ দিয়ে গেছেন। শরৎচন্দ্র শিলচরে একটি সাহিত্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। শোনা যায় 'শেষপ্রশ্নের' নায়িকাচরিত্র ওখানকার একটি মেয়ের আদলে গড়া। রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আগমন উপলক্ষে এই গানটি রচিত ও গীত হয়েছিল—

মাতৃভাষার দৈন্য নেহারি কাঁদিল তোমার প্রাণ
হৃদয় কমলে শ্রেষ্ঠ আসন বাণীরে করিলে দান।
গাহিলে গান নবীন ছন্দে   পূরিল বঙ্গ নবীন আনন্দে
উঠিল বঙ্গ পুলকে শিহরি,   শুনিয়া নবীন তান।
এ নহে দামামা, নহে রণভেরী   এ যে বাঁশরীর গান
সে সুধা লহরী মরমে পশিয়া   আকুল করিল প্রাণ।
সপ্তসাগর সে সুরে ছাইল, চমকি জগৎ সে গান শুনিল
বিশ্বকবির উচ্চ আসন তোমারে করিল দান।
হেথায় ফুটে না শ্বেত শতদল,   ফুটে না হেথায় রক্ত কমল
বনফুল দুটি করিয়া চয়ন   এনেছি দিতে উপহার
এ দীন ভূমির ভক্তি অর্ঘ্য চরণে লভুক স্থান॥

শ্রীহট্টে যে সকল উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী কাজ করে গেছেন তাঁদের কয়েকজন উত্তরকালে যশস্বী পুরুষ হন, যেমন বিচারপতি বি. এন. রাও, আই. সি. এস, শঙ্করনাথ মৈত্র, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। বিচার বিভাগের পান্নালাল বসু, রেণুপদ মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল সেনগুপ্ত, অবনীপ্রসাদ নিয়োগী, শচীকান্ত রায় সুনাম অর্জন করেছিলেন। শ্রীহট্টের সাংস্কৃতিক জীবনের উপর এঁরা সবাই রেখাপাত করেছেন।

বিবিধ কথা

শ্রীহট্ট শহর খুব প্রাচীন, কিন্তু পুরোনো দিনে শহরের চেহারা কি রকম ছিল তা জানার কৌতূহল হতে পারে পাঠকদের।

হিন্দু আমলে বসতি ছিল প্রধানতঃ গড়দুয়ার অঞ্চলে অর্থাৎ বর্তমান আম্বর খানার পশ্চিম দিকে। এখনকার দস্তিদার বাড়ি যেখানে তার কাছাকাছি এলাকার নাম ছিল বরশালা। রাজকর্মচারীদের বাসস্থান বলে এটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। রাজা গৌড়গোবিন্দের রাজধানী

ছিল গড়দুয়ার। মনারায়ের টিলা বা মিনারের টিলার উপরে গৌড়গোবিন্দের ইষ্টদেবতা হাটকেশ্বর শিবের মন্দির ছিল, হয়তো গৌড়গোবিন্দ নিজেও সেখানে থাকতেন কখনো কখনো। শহরের পূর্ব প্রান্তে টিলাগড় অঞ্চলে পার্বত্য জাতিদের আক্রমণ ঠেকাবার উদ্দেশ্যে গোবিন্দ একটি গড় তৈরি করেছিলেন। মুসলমান আমলেও সে গড় ব্যবহৃত হত; বছর ৪০ আগেও গড়ের ভগ্নাবশেষ দেখা যেত। রায়নগর প্রভৃতি এলাকায় জনবসতি ছিল খুব সামান্য।

মুসলমান আমলে রাজধানী সরে আসে শাহজলালের দরগার সন্নিকটে। গড়দুয়ার জনহীন হয়। বরশালার বসতিও ক্ষীণ হয়ে আসে, তবে আখালিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুদের বাসভূমি অনেকদিন থেকেই ছিল। প্রধানতঃ জনবসতি ছিল চৌহাট্টা থেকে আম্বর খানার মধ্যে। নদীর তীরবর্তী এলাকা জলাভূমি ছিল বলে ওখানে অনেক দিন পর্যন্ত কোনো জনবসতি ছিল না। এখনো বড় বড় জলার চিহ্ন রয়ে গেছে ওখানে। শেখঘাট-কাজির বাজার এলাকায় ধীরে ধীরে নাগরিকদের, বিশেষতঃ মুসলমানদের বাড়ি গড়ে ওঠে। মীরাবাজার থেকে রায়নগর পর্যন্ত এলাকা এসময় বেড়ে ওঠে। বিশেষতঃ রায়নগরে অনেক সঙ্গতি সম্পন্ন হিন্দু ব্যক্তির বাড়ি ছিল। দেওয়ান আনন্দ চন্দ্র রায় ওখানে থাকতেন বলেই নাম 'রায় নগর'। বাজার ছিল বর্তমান চালিবন্দর এলাকায়। একেই বলা হত 'বন্দর'। পরে বাজার উঠে আসে বর্তমান স্থানে। এ জায়গাটা জলা ছিল বলে বড় বড় মাটিভরা মটকা ফেলে তার উপর মাটি ভরাট করে বর্তমান বন্দরবাজার তৈরি হয়। চালিবন্দর তার পূর্বগৌরব হারায়---- চালিবন্দরের পাশে কাঠের কোনো 'গড' ছিল। এ হল অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। এখনকার লালদিঘির পুরানো নাম 'নবাব তালাও'-এর পাশেই নবাবের কাছারি ছিল। ডাক বাংলার সামনে যে মসজিদটি রয়েছে সেটি ঐ সময়কার। এসময় নতুন আর একটি পাড়া গড়ে ওঠে কালীঘাট মহল্লায়। শেখঘাট থেকে জনবসতি উত্তর মুখে ছড়ায়। বর্তমান লামাবাজার এলাকায় বসতি ছিল ঢাল নির্মাতাদের, এপাড়া তখন খুব জমজমাট। লামাবাজারের পর অনেকখানি ফাঁকা রেখে আবার পাড়া গড়ে ওঠে সুবিদবাজার (তখন নাম ছিল সুবিদ রায়ের গুধা), যুগলটিলা প্রভৃতি এলাকায়। মুসলমান আমলে শহরের সমৃদ্ধি সবচেয়ে বাড়ে নবাব ফরহাদ খাঁর শাসনকালে। রায়নগরে যাবার পথে গোয়ালিছড়ার পুলটি ফরহাদ খাঁর তৈরি। ঈদ্গাও ফরহাদ খাঁর দ্বারা নির্মিত।

ইংরাজেরাও প্রথম কাছারি তৈরি করেন নবাব তালাওয়ের পাশে। বর্তমানে ডেপুটি কমিশনারের বাংলো যেখানে সেখানে রেসিডেন্টের বাসস্থান তৈরি হয়। ক্রমে ক্রমে লামাবাজার থেকে পূর্বদিক ধরে জল্লারপাড়—নয়াসড়ক হয়ে জনবসতি ছড়িয়ে পড়ে। তেলিহাওর প্রভৃতি এলাকায় বাড়িঘর আরো পরে হয়। পুরাণ লেন জিন্দাবাজার চৌহাট্টা ঘরবাড়িতে পূর্ণ হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ইংরাজরা আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিছু ইয়োরোপীয় বনিক শ্রীহট্ট শহরে বসতিস্থাপন করে। এদের মধ্যে অন্ততঃ একজন ফরাসী ছিল। ঊনিশ শতকের প্রারম্ভে জেলখানা নতুন আদালত প্রভৃতি নিয়ে শহর সুসজ্জিত হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পে ডেপুটি কমিশনারের অফিস প্রভৃতি ভেঙে গেলে নতুন করে বানানো হয়। মুসলমান আমলের কিছু কিছু স্মৃতি কোনো কোনো পাড়ার নামে এখনো রয়ে গেছে যেমন, 'তোপখানা', 'পীলখানা'

(বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও এখানে হাতী বাঁধা থাকতো)। বর্তমান সার্কিট হাউসের সামনে বহু দরজাযুক্ত একটি 'গোলঘর' ছিল, সেটি ছিল বৃহৎ আস্তাবল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুকের আগমন উপলক্ষে চাদনীঘাটের সিঁড়ি তৈরি হয়। লংলার জমিদার আমজদ আলী নদীতীরে সিঁড়ির মাথায় ঘড়িঘর তৈরি করে দেন। সাধারণ মানুষের মুখে ছড়া শোনা যেত—

চাদনীঘাটের সিঁড়ি
আজাদ আলী চৌধুরীব দাড়ি
জিতুমিয়ার গাড়ি
আমজদ আলীর ঘড়ি।

শ্রীহট্ট শহরে তখনো রেল লাইন পাতা হয়নি— সেটা হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে। সাধারণতঃ ট্রেনে করিমগঞ্জ এসে লোকে নৌকায় শ্রীহট্ট সহরে আসতো। তবে স্টিমার তখন সারাবছর চলতো। নদীপথে মেঘনা হয়ে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যেত। শিলং যাতায়াতের জন্য ছাতক— থারিয়াঘাট হয়ে চেরাপুঞ্জি গিয়ে সেখান থেকে বাস ধরতে হত— বর্তমান সিলেট শিলং রাস্তা খোলা হয় ১৯৩০ সালের পরে।

সাধারণ হিন্দু ভদ্রলোকেরা বাড়িতে মোটা ধুতি পরতেন, পায়ে থাকতো কাঠের খড়ম। বাইরে যাবার সময় গায়ে নিমা বা চাদর অবশ্যই রাখতে হতো। রাজদ্বারে যেতে হলে হিন্দু মুসলমান সবাই চোগা চাপকান লাটুদার পাগড়ি নাগড়া জুতা প্রভৃতি ব্যবহার করতেন। নিজের হাতে ছাতা ধরে চলা সম্ভ্রমহানির কারণ হতো— চাকরেরা মাথার উপর বিরাট বাঁশের ছাতি ধরে চলতো। কোনো ভদ্রলোক বা ভদ্রবংশীয় সন্তান বাজারে যেতেন না। শীতের দিনে তাঁরা ব্যবহার করতেন শাল বনাত বালাপোষ। গরীবদের শীতবস্ত্র ছিল যুগীয়ানী গিলাপ।

এই শতকের প্রথমে স্কুলের ছাত্র, কি হিন্দু কি মুসলমান, ধুতি ও সার্ট পরতেন। কখনো কখনো বিশেষ উপলক্ষে পায়জামা পরতেন মুসলমান ছাত্রেরা। মুসলমান ভদ্রলোকেরাও অনেকে ধুতি পরতেন। অফিসারদের মধ্যে কোট ও প্যান্টের চল হলেও অনেক নিষ্ঠাবান মুসলমান ভদ্রলোক কখনো নেকটাই বাঁধতেন না। ওরা মনে করতেন নেকটাই খ্রীষ্টীয় ক্রুশের প্রতীক।

মেয়েদের মধ্যে ব্লাউজের চল হয় গত শতাব্দীর শেষ ভাগে। মিশনারী মেমেদের প্রভাবে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়েদের পোশাক-আশাকে, সেলাইর কাজে, পড়াশোনার ক্ষেত্রে, কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছিল সন্দেহ নেই। বাইরে যাবার সময় মহিলারা লেস দেওয়া লম্বাহাতা ব্লাউজ পরতেন।

ভদ্র হিন্দু পরিবারে আহার্য তালিকায় মাংসের স্থান ছিল কম। উৎসবে বিরণ চালের ব্যবহার ছিল খুব। নানা ধরনের পিঠা তৈরি হত। নারকেলের বিভিন্ন জাতের সন্দেশ, বিশেষতঃ 'গঙ্গাজলি' ও 'চিড়াজিরা' খুব বিখ্যাত ছিল।

মুসলমান পরিবারে উৎসবের খাদ্য তালিকায় থাকতো সিমাই, পুর দেওয়া সমুসা, পর, আজোয়াইন রুটি, কাসরংগা প্রভৃতি।

'চুংগা পিঠা' হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই প্রিয় ছিল।

'অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটা হলে গ্রাম অঞ্চলে বহুলোক একত্র হয়ে রাত্রে বাড়ির সামনেব মাঠে রুট নামক পিঠা তৈরি কবে উল্লাস করে খেত। সাধারণতঃ পুরুষেরাই উঠানে চুলা করে এই পিঠা তৈরি কবত। চাউলের গুঁড়া, মশলা, তেল ও ঘির সাহায্যে রুট তৈরি করা হত' (আমাদের কালের কথা)।

শতাব্দীর গোড়ায় ফুলকপি শালগম বিলিতি বেগুন প্রভৃতি সৌখীন সবজি শহরেও কম আসতো। গ্রামে এগুলি প্রায় অপবিচিত ছিল। গ্রামের দরিদ্র ব্যক্তিবা শালুক তুলে সেদ্ধ কবে খেত অন্য খাদ্যেব অভাব হলে।

শ্রীহট্ট সহবে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেব মধ্যে তখনো ঘোড়ায় চড়ার বেওয়াজ ছিল। তাঁরা পোলো খেলতেও ভালোবাসতেন অনেকে। খেলা হতো বর্তমান পুলিশ লাইনেব সংলগ্ন মাঠে। এ খেলায় মণিপুরীরাও অংশ নিতেন। সম্ভবতঃ রাজা গম্ভীর সিংহের ও তার অনুচরদের দ্বারা পোলো খেলা শ্রীহট্ট কাছাড়ে প্রচলিত হয়েছিল। শিলচর পোলো ক্লাব পৃথিবীর প্রাচীনতম পোলো ক্লাব বলে খ্যাত।

গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতেব জন্য ঘোড়ার ব্যবহাব ছিল— এখনো কিছু কিছু আছে (দক্ষিণ শ্রীহট্টেই বেশি)। গ্রামে পালকী ও সোয়াবির প্রচলন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ছিল। শহরে একসময় ঘোড়ার গাড়ি ছিল। ধনী জমিদারেরা অনেকেই টমটম প্রভৃতি ব্যবহার করতেন। ট্যাকসি আসার পর ঘোড়াব গাড়ি উঠে যায়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টে প্রথম সাইকেল রিক্সা আসে। ওই সময় ট্যাকসির প্রতি ট্রিপের ভাড়া ছিল আট আনা ও রিক্সাব ভাড়া আনা তিনেক।

শ্রীহট্টে প্রথম মোটর গাড়ি আনেন খাজাঞ্চি বাড়ির রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। নিজস্ব জেনারেটর দিয়ে বাড়ি আলোকিত করেছিলেন তিনিই প্রথম। শ্রীহট্ট সহরে বিজলী বাতি জ্বলে প্রথম ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ সৌখীন ব্যক্তি ছিলেন— তাঁর বাড়ির আসবাব পত্র কেনা হত ল্যাজারাস থেকে। ভোরে উঠে তিনি ওয়েলাব ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন।

সহরাঞ্চলে এশতাব্দীর গোড়ায় কেরোসিনের বাতি ব্যবহৃত হত অধিকাংশ পরিবারে। তবে লণ্ঠনের পরিবর্তে অনেকে কুপির চারদিকে কাঁচঢাকা একরকম হাত লণ্ঠন ব্যবহার করতেন, এগুলি স্থানীয়ভাবে তৈরি হত। রেড়ির তেলের বাতিও জ্বালানো হত। মাটির প্রদীপের মধ্যে একটা অংশে জল থাকতো— তার ফলে তেল পুড়তো কম। গ্রামে বেড়ীর তেল নাগকেশর তেল প্রভৃতিব ব্যবহার মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দরিদ্রেরা পুঁটি জাতীয় মাছ মাটিতে পুঁতে তার তেল বার কবে নিত।

হিন্দু গৃহস্থ বাড়িতে পুরাণ পাঠ, মনসামঙ্গল পাঠ ইত্যাদির রেওয়াজ ছিল। বিশেষতঃ শ্রাবণমাসে সমগ্র জেলায় মনসাপূজা মনসামঙ্গল পাঠ চলতো। কবিগান বেশ জনপ্রিয় ছিল— বিংশ শতাব্দীতেও তা নষ্ট হয় নি। ঢপ কীর্তন প্রভৃতিও এযুগে উপভোগ করতো লোকে।

স্থানীয় কোনো যাত্রার দল ছিল না তবে পূজার পর থেকে বহিরাগত যাত্রার দল দেখা যেত। পি. ডব্লু. ডি অফিসে (বারিক অফিসে) যাত্রা উৎসব বিখ্যাত ছিল। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা পূজা উপলক্ষে নৌকা বাইচও জনপ্রিয় উৎসবরূপে গণ্য হতো।

সাধারণ মুসলমানদের জীবনে আনন্দ উৎসবের সুযোগ ছিল কম। সেজন্য দুর্গাপূজার বিসর্জনে ঝুলন উৎসবে তাঁরাও দলে দলে আসতো। সরস্বতী পূজা মুসলমান ছাত্রদেরও কৌতূহলের বস্তু ছিল। নৌকাবাইচে মোল্লাদের নিষেধ সত্ত্বেও মুসলমানেরা অংশগ্রহণ করতেন। এগুলি প্রায় সর্বজনীন উৎসব ছিল। যাত্রা উৎসবে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের উপস্থিতির সংখ্যা কম হত না। অসহযোগ আন্দোলনের সময় মুকুন্দ দাস শ্রীহট্টে কিছুদিন ছিলেন, সারা জেলাকে তিনি মাতিয়ে দিয়ে যান।

সাধারণ মুসলমানের আর একটি আনন্দের কথা বলেছেন সৈয়দ মূর্তাজা আলী ;

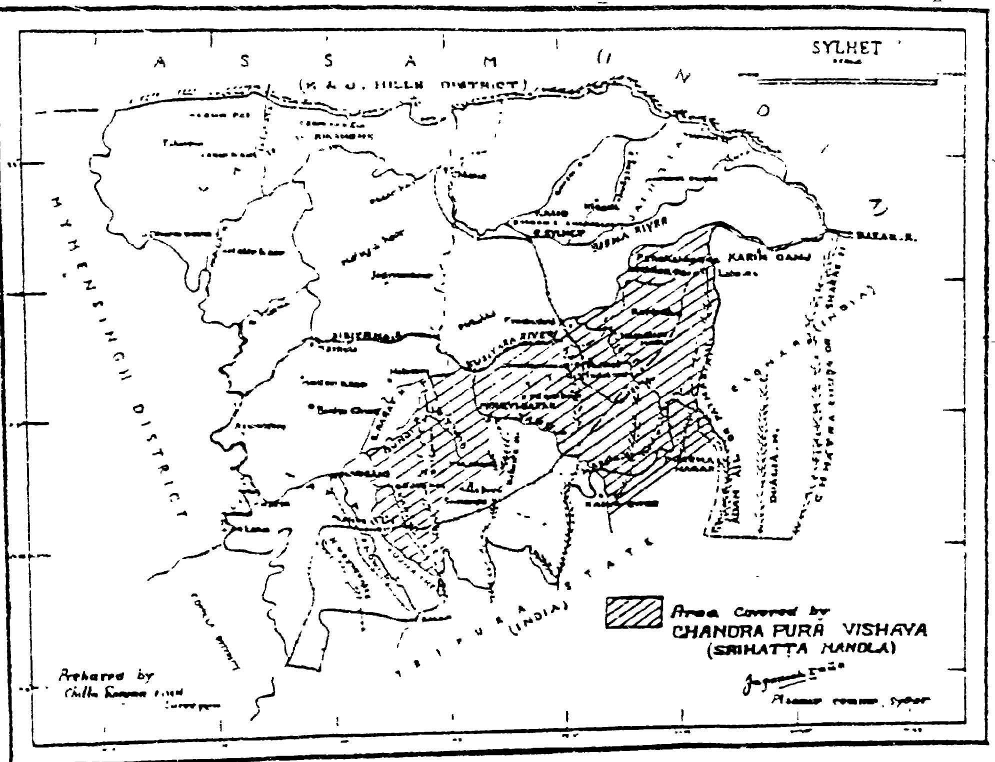
'গাজীর গীত শোনার প্রতি নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের উৎসাহ ছিল। আলীম ওলামারা অবশ্য গাজীর গীতের বিরোধী ছিলেন। গাজীর গীতের খলিফা (সূত্রধার) মৌলবী মৌলানাদের মত জমকালো পোশাক পরত। তার মাথায় পাগড়ি ও পাগড়ির সম্মুখ দিকে আয়না থাকত। খলিফা পরত ঢিলা পায়জামা। তার সামনে থাকতো অর্ধদণ্ড খচিত ত্রিশূলের মত দণ্ড। সে প্রথমে এই দণ্ডকে বন্দনা ও সালাম করত। গোলে বকাওলি, গোলে হরমুজ, গোলে শোনাওর ইত্যাদি কেচ্ছা এই সকল আসরে সুর করে পড়া হত। এই সকল কেচ্ছা সংবলিত পুস্তক কলকাতার বটতলা অঞ্চলে ছাপা হত। খলিফার সঙ্গী গায়েনরা তবলা বাজাত ও গান করত।'

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, শিক্ষার উন্নতি, আর্থিক সমৃদ্ধি, স্বচ্ছন্দতর জীবনযাত্রা সত্ত্বেও লোকের নৈতিক মান এই শতাব্দীতে ক্রমাগত নেমে যাচ্ছিল। নানাপ্রকার নেশার চর্চা, যৌন অপরাধ দ্রুত বাড়ছিল। গান্ধীজির আন্দোলন অনেকটা নৈতিক উত্থান ঘটিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

শ্রীহট্টবাসী বিদেশযাত্রা প্রিয়। শ্রীহট্ট সমুদ্র থেকে দূরবর্তী হলেও সমুদ্রগামী জাহাজে খালাসীর কাজে সিলেটী মাল্লারা সুদক্ষ। রেসিডেন্ট লিন্ডসের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তাঁকে হত্যা করবার জন্য সৈয়দ উল্লা নামক এক ব্যক্তি লন্ডন পর্যন্ত ধাওয়া করে। সৈয়দ উল্লা জাহাজে মাল্লার কাজ নিয়ে গিয়েছিল। এ হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিককার কথা। জাহাজের কাজে শ্রীহট্টবাসীরা তখন থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

শ্রীহট্ট মণ্ডলে চন্দ্রপুর বিষয়ের মানচিত্র

(শ্রীকমলাকান্ত গুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত)



সংযোজন

মহারাজ ভাস্কর বর্মা প্রদত্ত
নিধনপুর তাম্রশাসন (সপ্তম শতাব্দী)

প্রথম পট্ট

১। ওঁ প্রণম্য দেবং শশিশেখর (ং) প্রিয়ং পিনাকিনং ভস্মকণৈর্বিভূষিতং (।) বিভূতয়ে ভূতিম (তাং দ্বিজ)

২। ম্নানাং করোমি ভূয় (ঃ) ষ্ফুটবাচমুজ্জ্বলাং॥ স্বস্তি মহানৌহস্ত্যশ্বপত্তিসম্পত্ত্যপাত্ত (ত) জয়শব্দা (ন্ব)

৩। র্থস্কন্ধাবারাৎ কর্ন্নসুবর্ণ্ণ বাসকাৎ॥ ভোগীশ্বর কৃত পরিকর্ন্নীক্ষণ শির রামিপম

৪। বিমুক্তং পরমেশ্বরস্য রূপং নিজভূতিবিভূষিতং জয়তি॥ জয়তি জগদেকবন্ধুর্লোকান্বিত

৫। যস্য সম্পদো হেতুঃ (।) পরহিতমূর্ত্তিবদৃষ্টঃ ফলানুমেয় স্থিতিধর্ম (ঃ) ধাত্রীমুদ্ধিক্ষিপ্সো

৬। রস্থানিধে (ঃ) কপটকোলরূপস্য (।) চক্রভৃত (ঃ) সূনুরভূৎ পার্থিব বৃন্দারকো নরক (ঃ)॥

৭। তস্মাদদৃষ্ট নরকান্নরকাদজনিষ্ট নৃপতিরিন্দ্রসখ (ঃ)। ভগদত্ত খ্যাতজয়ং বিজয়ং

৮। যুধি যঃ সমাহ্বয়ত॥ তস্যাত্মজ (ঃ) ক্ষতারের্ব্বজ্রগতি র্বজ্রদত্ত নামাভূৎ (।) শতম---

৯। খমখণ্ডবলগতিবতোষযদ্ যঃ সদাসংখ্যে॥ বংশ্যেষু তস্য নৃপতিষু বর্ষসহ—

১০। স্রত্রয়ং পদমবাপ্য (।) যাতেষু দেবভূয়ংক্ষিতীশ্বর (ঃ) পুষ্যবর্ম্মাভূৎ মাৎস্যান্যায

১১। বিরহিত (ঃ) প্রকাশরত্ন(ঃ) সুতো দ্বৈরথলঘু (ঃ) পঞ্চম ইব হি সমুদ্র (ঃ) সমুদ্রবর্ম্মাভবত (ও) স্য॥

১২। অবিখণ্ডিত **বলবর্ম্মা** তস্যাসুনুরজনিষ্ট (।) ক্ষিতিপস্য **দত্তদেব্যাং**সেনা য

১৩। সাভ্যামিত্রীযা॥ তস্যাপি রত্নবত্যাং নৃপতিঃ কল্যাণবর্ম্মনামাভূৎ (।) তনয়স্তনীযসা

১৪। মপি যো দোষাণামনাবাসঃ॥ **গন্ধর্ব্ববতী** তস্মাদ্ গণপতিমিব দানবর্ষণমজস্রং

১৫। **গণপতি** মগণিত গুণ গণমসূত কলিহানয়ে তনয়ং॥ তস্যাগ্রিষী যজ্ঞবতী

দ্বিতীয় পট্ট (সম্মুখভাগ)

১৬। যজ্ঞবতী বারণিঃ সুতমসূত ( ) যজ্ঞবিধীনামাস্পদমনলমিব মহেন্দ্রবর্ম্মাণং॥ তস্য দ

১৭। জনয়দাত্মজমাত্মবিদঃ সুব্রতা ভুবঃ স্থিতয়ে। **নারায়ণ বর্ম্মাণং** জনকমিবা ধিগতঃ সাংখ্যার্থং॥

১৮। প্রকৃতিরিব তস্য পুংসো **দেববতী** স্থিরগুণানুবন্ধায়। ষষ্ঠমিব মহভূতন্দধৌ **মহা**
১৯। ভূতবর্মাণং॥ **চন্দ্রমুখস্তস্য** সুতশ্চন্দ্রইব কলাকলাপরমণীয়ঃ। বিজ্ঞানবতী
২০। দ্যৌবিব যং সুযুবে ধ্বান্তশান্তিকরং॥ ভোগবতী **ভোগবতী** ভূতেঃ **স্থিতবর্মণ**
২১। ত(স্ত)তো হেতুঃ। আসীদ্ভোগিপতেরিব ভূমিভৃতোনন্তভোগস্য॥ তস্মাদগাধ
২২। মূর্তের কলিতবত্নাদুপোঢ়লক্ষ্মীকাৎ। ক্ষীরোদধেরিব নৃপাদকলঙ্ক—
২৩। **শ্রী মৃগাঙ্কোভূৎ**॥ উদপাদি **নয়নদেব্যাং** সূনুস্তস্য স্ববাহুধৃত
২৪। রাজাঃ। দেবঃ **সুস্থিতবর্মা** যঃ খ্যাতঃ শ্রীমৃগাঙ্ক ইতি॥ প্রভুরসং বিলসন্তী
২৫। তদ্বন ইব যাং মুদ্রা হরির্বহতি। সঃ শ্রীরথিজনেভ্যঃ ক্ষিতিরিব বিশ্রাণিতা যেন॥
২৬। কার্তযুগীব **শ্যামাদেবী** তস্মাদজীজনত্তনয়ং শশিনমিব **সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মা**
২৭। ণমপাস্তয়ে ত(ম)সাং। যস্যোন্নতিঃ পবার্থা বিদ্যাধর চক্রবর্তিসেব্যস্য সগ
২৮। জস্য সুপ্রতিষ্ঠিত কটকস্য কুলাচলস্যেব সৈব শ্যামাদেবী তস্যানুজম
২৯। কলিতোদয়মসৃত। **শ্রীভাস্করবর্মাণং** ভাস্কবমিব তেজসাং নিলয়ং॥

দ্বিতীয় পট্ট (পশ্চাদ্ভাগ)

৩০। একোপি হি যঃ পুংসাং হৃদয়েস্ব ভিলক্ষিতঃ স্বভাবেন। শুদ্ধেষু দর্পণেষ্বিব বহুসুষমং
৩১। সম্মুখীনেষু॥ যস্যাবিহতমতনুভিস্তেজোভির্লক্ষ্ম নৃপতিভবনেষু উদ
৩২। পাত্রেষ্বিব ভূরিষু বিলোক্যতে ভাস্করস্যেব। অব্যালঃ স্বারোহঃ কল্পদ্রুমবত্
৩৩। সমৃদ্ধিভূরিফলঃ। ছায়োপাশ্রিত জনতাপরিবেষ্টিতপাদমূলো যঃ॥
৩৪। ইত্যপি স জগদুদয় কল্পনাস্তমযহেতুনা ভগবতা কমলসম্ভবেনা
৩৫। বকীর্ন্নবর্ণ্নাশ্রম ধর্মপ্রবিভাগায় নির্মিতো ভুবনপতি রিবোদয়ানুরক্ত মণ্ডলো
৩৬। যথাযথমুচিত করণিক(ব) বিতরণা কুলিত কলিতিম (মি)র সঞ্চয়
৩৭। তয়া প্রকাশিতার্থ ধর্মালোকঃ স্বভুজ বল তুলিত সকল সাম
৩৮। ন্তচক্রবিক্রমঃ স্থিতি বিনযসংস্তবোপচিতভক্তিষু প্রকৃতিষু পরম্পবীনাসু
৩৯। নিকামমুপকল্পিতানেক ভোগীনবর্ত্মা সমরবিজিত নরপতিশতবিহিত
৪০। বিবিধনুতিবচন কুসুমরচিত রুচিরকীর্তি চিত্রাবতংস সাঙ্কঃ শিবিরিব পরো
৪১। পকার বিশ্রাণনাভিবসত্ত্ব বৃত্তির্যথাসময়মুদিতগুণ বিধিবিভাগ
৪২। সম্বন্ধ পটুতয়া সুরগুরুরিবাপরঃপরৈরবহিত প্রভাবঃ শ্রুত শৌর্য ধৈর্য
৪৩। শৌটীর্যসুচরিতৈরলঙ্কৃতাত্মবৃত্তিঃ প্রতিপক্ষ সংশ্রয়নিরাকৃতৈরিব বিব-
৪৪। র্জিতো দোষৈরচলিত নিরন্তর প্রণয়রসভরাকৃষ্ট কামরূপলক্ষ্মীম্ সমা—

তৃতীয় পট্ট (সম্মুখভাগ)

৪৫। লিঙ্গন প্রকটিতাভিকা (গা) মিক গুণানুরাগবৃত্তিঃ কলিযুগ পরাক্রমাকলিতবিগ্র
৪৬। হস্য সমুচ্ছাস (সমুচ্ছ্বাস) ইয় ভগবতো ধর্মস্য নয়স্যাধিষ্ঠানমা স্পদং গুণানাংনিধিঃ
৪৭। প্রণয়িনা মুপঘ্নঃ মন্ত্রস্ত্রানাং শ্রীসম্পদ। মায়বনং বসুমতীসুত ক্রমাধি
৪৮। গত পদ সমুৎকর্ষদধি (শি) ত প্রভাবশক্তির্মহাবাজাধিরাজঃ **শ্রীভাস্করবর্ম**
৪৯। দেবঃ কুশলী॥ চন্দ্রপুরি বিষয়ে বর্তমানভাবিনো বিষযপতী নধিকর
৫০। ণানি চ সমাজ্ঞাপয়তি বিদিতমস্ত ভবতামে তদ্বিষয়ান্তঃ পাতি **ময়ূর**
৫১। **শাল্মলাগ্রহার** ক্ষেত্রং রাজা **শ্রীভূতিবর্মণা** তাম্রপট্টীকৃতং যৎ তত্তাম্রপট্টোভা
৫২। বাৎ করদমিতি মহারাজ জ্যেষ্ঠভদ্রবিজ্ঞাপ্য পুনবস্যাভিনব তাম্রপট্ট করণায় শাস-
৫৩। নং দত্ত্বা চন্দ্রার্ক ক্ষিতি সমকালম কিঞ্চিৎ প্রগৃহ্য তয়া ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়েন পূর্বভো
৫৪। ক্তৃ ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রতিপাদিতং যত্র ব্রাহ্মণনামানি প্রাচেতসো বাজসনেয়ী পট্টকপ
৫৫। তিঃ অংশ দ্বয়ভোক্তা সাধারণ স্বামী শ্রীবসুভ্রাতৃত্রয়েণ একোংশঃ সোমবসু ভ্রাতৃ সহিতোর্ধাংশঃ
৫৬। কাত্যায়ন ছান্দোগো মনোরথস্বামী চতুর্থাংশহীনো দ্বিরংশঃ পট্টকপতিঃ অর্ধাংশঃ বিষ্ণুঘোষ স্বামী॥
৫৭। বেদঘোষস্বামী একাংশঃ যাস্কো বাহ্বৃচোদাম দেব স্বামী অংশঃ ঘোষদেব স্বামী অর্ধাংশঃ॥ নন্দ দে
৫৮। বস্বামী অর্ধাংশঃ ভারদ্বাজ ছান্দোগোর্কদত্তো গোত্রসহিতাধ্যর্দ্ধংশঃ তুষ্টি দত্ত স্বামী অর্ধা

তৃতীয় পট্ট (পশ্চাদ্‌ভাগ)

৫৯। ংশঃ কাশ্যপগোত্রবাজসনেয়ী ঋষিদাম স্বামী অংশঃ শুভদাম স্বামী অংশঃ কৌৎসো বাজসনেয়ী
৬০। শনৈশ্চবভূতিঃ গোত্রাংশঃ বাহ্বৃচো গৌরাত্রেয় সঙ্কর্ষণ স্বামী দ্বিরংশঃ॥ নরস্বামী অংশঃ॥ নারায়ণ
৬১। স্বামী অর্ধাংশঃ । বিষ্ণুস্বামী অংশঃ সুদর্শন স্বামী অংশঃ গোপেন্দ্রস্বামী অংশঃ অর্কস্বামী অংশাচ্চতুর্থোভাগঃ
৬২। ভানুস্বামী অর্ধাংশঃ॥ ভূয়স্কর স্বামী অর্ধাংশঃ ॥ কৃষ্ণাত্রেয়ো বাজসনেয়ী যশঃভূতি স্বামী গোত্রাংশঃ। ভারদ্বাজ
৬৩। ছান্দোগো বরুণস্বামীঅংশঃ। কৌণ্ডিন্যো বাজসনেয়ী মধুসেন স্বামী অংশঃ॥ গৌতমছান্দোগো
৬৪। ধ্রুবসোম স্বামী অংশঃ॥ বিষ্ণুসোম স্বামী অংশঃ॥ ভারদ্বাজ বাজসনেয়ী বিষ্ণুপালিত স্বামী
৬৫। অর্ধাংশঃ ॥ শুচিপালিত স্বামী অংশঃ॥ মিত্রপালিতার্থ পালিতয়োঃ অর্ধাংশঃ
৬৬। প্রজাপতিপালিত স্বামী অংশাচ্চতুর্থভাগঃ॥ গৌতমো বাজসনেয়ী মধুস্বামী অংশঃ
৬৭। চক্রদেব স্বামী অর্ধাংশঃ॥ বাৎসশ্চাবকাঃ কুষ্মাণ্ডপত্র স্বামী চতুর্থাংশহীন পাদঃ। ঈশ্বর

৬৮। দত্ত স্বামী দ্বিরংশঃ মৌদ্গল্যবাজসনেয়ী সুদর্শন দিনকর স্বামি ভ্যাম্ অংশঃ।। শৌনকো
৬৯। বাজসনেয়ী যজ্ঞকুণ্ডস্বামী অর্ধাংশঃ যশঃকুণ্ডস্বামী পাদাধিকোংশঃ শ্রদ্ধকুণ্ডস্বামী অংশঃ
৭০। নাবায়ণকুণ্ডস্বামী অংশঃ।। ঈশ্বরকুণ্ডস্বামী অর্ধ পাদাভ্যধিকঃ অংশঃ। শক্তিকুণ্ডস্বামী
৭১। অংশাচ্চতুর্থোভাগঃ।। তোষকুণ্ডস্বামী অর্ধপাদাভ্যধিকঃ অংশঃ। পারাশর্য চারক
৭২। সাধুস্বামী অংশঃ।। আশ্লায়ন ছান্দোগো গঙ্গস্বামী অংশঃ বাবাহো বাহ্বৃচ্যো নরস্বামী অংশঃ।।

চতুর্থ পট্ট অপ্রাপ্য

পঞ্চম পট্ট (সম্মুখভাগ)

১। স্বামি-অর্ধাংশঃ। ভট্টিমহেশ্বব স্বামী অধাংশঃ।। পারাশর্যো বাহ্বৃচ্যো গোপাল নন্দিস্বামী অংশঃ।। ভার্গবো
২। বিশ্বভূতিস্বামী অংশঃ।। সুরক্ষিত সুচরিতাভ্যাম্অর্ধাংশঃ ভারদ্বাজ স্তৈত্তিরীয় শিবগণ
৩। স্বামী অংশ।। বাহ্বৃচ্যকাত্যায়নঃ ভ্রাতৃত্রয়েণ বসুশ্রীস্বামীঅংশঃ। কৌশিকোবাজসনেয়ী
৪। বীরভূতিস্বামী অংশঃ।। বিষ্ণুভূতিস্বামী অর্ধাংশঃ।। প্রমোদভূতিস্বামী অংশঃ।। ভাবদ্বাজো বাজ
৫। সনেয়ী বিষ্ণুদত্তস্বামী অংশঃ ।। কৌণ্ডিন্যো বাজসনেয়ী বৃহস্পতিস্বামী অংশঃ।। যাস্কো
৬। বাহ্বৃচ্যহর্ষদেবস্বামীঅংশঃ।। জাতুকর্ণ বাজসনেয়ী মেধস্বামী অংশঃ।। কৃষ্ণস্বামী অংশঃ।।
৭। মাধবহরিভ্যাম্ অংশঃ।। ভারদ্বাজশ্ছান্দোগো জনার্দনদেবস্বামী অংশঃ।। মৌদগল্যো
৮। বাজসনেয়ী বিষ্ণুসোমস্বামী অর্ধাংশঃ।। গার্গশ্চারক্যো ধনসেন স্বামী অংশঃ প্রমো
৯। দসেন ঘোষ সেনাভ্যাম্ অংশঃ।। সোমসেনস্বামী অংশঃ।। গৌতম বাহ্বৃচ্য ভাস্কব
১০। মিত্রস্বামী অংশঃ।। মধুমিত্রস্বামী অংশঃ।। সাধারণ মিত্রসাধুমিত্রভ্যাম্ অংশঃ।। ধৃতি
১১। মিত্রস্বামী অর্ধাংশ।। ভারদ্বাজো বাহ্বৃচ্যশুক্রভবস্বামী অংশঃ।। পৌত্রিমাষ্যবাহ্বৃচ্য সুদর্শন
১২। ধনেশ্বর স্বামিভ্যাম্ অর্ধাংশঃ।। শাণ্ডিল্যো বাজসনেয়ী ববিস্বামী অংশঃ মধুস্বামী অংশঃ।।
১৩। মহীধর স্বামী অংশঃ।। পৌর্ণো বাহ্বৃচ্য ভট্টি মহেশ্বরস্বামী অংশঃ।। ভট্টিমাতৃস্বামী অর্ধাংশঃ।।
১৪। রুদ্রভট্টিস্বামী অর্ধাংশঃ।। কৌশিক ছান্দোগঃ অদ্রি বিলেপন স্বামী অংশঃ। সাবর্নি
১৫। কসগোত্র বাজসনেয়ী গোমিনাগস্বামী অংশঃ।।

পঞ্চম পট্ট (পশ্চাদ্ভাগ)

১৬। প্রবরনাগস্বামী চতুর্থভাগোহীনংশ।। অপনাগস্বামী অংশঃ। তোষনাগহম্পিনাথ স্বামিভ্যাম্।
১৭। অংশাচ্চতুর্থোভাগঃ।। কাশ্যপবাজসনেয়ী মন ঘোষ গোস্বামীঅংশঃ। বৈষ্ণবৃদ্ধি ছান্দোগো
১৮। সর্পির্ণিস্বামীঅংশঃ।। জনার্দনস্বামী অংশঃ। কৌশিকবাহ্বৃচ্যঅর্কস্বামী অর্ধাংশঃ শ্রদ্ধদাস
১৯। স্বামী অর্ধাংশঃ। গৌতমবাজসনেয়ী সনাতন স্বামী অংশঃ।। হর্ষপ্রভ গোত্রেণ সহ অর্ধা
২০। ংশঃ।। কৌটিল্য বাজসনেয়ী খণ্ডসোমস্বামী অর্ধাংশঃ শ্রেয়স্কর গতি গৌরি সোমেভাঃ

২১। অংশঃ ॥ বকুলসোমস্বামী অর্ধাংশঃ ॥ ধৃতিসোম সিংহসোম সামিভ্যাম্ অর্ধাংশঃ ॥ কৃষ্ণা
২২। ত্রেয়ো বাজসনেয়ী ভাযশঃস্বামী অর্ধাংশঃ ॥ যজ্ঞস্বামী পাদাভ্য ধিকোংশঃ দৈব
২৩। স্বামী পাদাভ্যধিকোংশঃ ॥ পদিস্বামী অর্ধাংশঃ ॥ প্রদ্যুম্নস্বামী অর্ধাংশঃ বৃদ্ধিস্বামী দ্বিবংশঃ ॥
২৪। দিবাকর হর্ষ্যদ্ভূত ত্বষ্টুভোষনাগেভ্য অংশঃ ॥ কবেস্তবো বাজসনেয়ী
২৫। মেঘ স্বামী অংশঃ ॥ মাণ্ডব্যো বাজসনেয়ী ধৃতিস্বামী গোত্রেণসহ অংশচতু
২৬। র্থভাগঃ। কশ্যপ বাজসনেয়ী কেশবস্বামী অংশঃ। ভাবদ্বাজো বাজসনেয়ী গৌবিস্বামী
২৭। অংশঃ ॥ সুচরিতস্বামী অর্ধাংশঃ ॥ ভাবদ্বাজ বাজসনেয়ী বপ্পস্বামী অংশঃ ॥ কৌণ্ডিন্যো বাহ্বৃচাঃ
২৮। কর্কদত্তস্বামী অংশঃ ॥ ভাবদ্বাজো বাহ্বৃচাঃ উদয়নস্বামী অংশঃ ॥ বাসিষ্ঠো বাহ্বৃচা মেরুদত্তস্বামী
২৯। অংশঃ ॥ অগ্নিবেশ্য বাজসনেয়ী নরেন্দ্র বেণুভূতি স্বামিভ্যাম্ অংশঃ মেধভূতিস্বামী অর্ধাংশঃ ॥
৩০। সাংকৃত্যায়ন চাবক্যঃ চন্দ্রপক্ষস্বামী অংশঃ ॥ যাস্কো বাহ্বৃচা কালিস্বামী অংশঃ ॥

ষষ্ঠ পট্ট (সম্মুখভাগ)

১। শালঙ্কায়নো বাজসনেয়ী সূর্যস্বামী অংশঃ। ভাবদ্বাজো বাজসনেয়ী ভবদেবস্বামী অংশঃ।
২। শর্বদেবস্বামী অংশঃ ॥ গোমিদেবস্বামী অর্ধাংশঃ। সবিত্রদেবস্বামী দ্বিরংশঃ। অর্কদেবস্বামী অর্ধাংশঃ।
৩। সাধারণ স্বামী অংশাচ্চতুর্থভাগঃ। গার্গ্যো বাজসনেয়ী দামরাতস্বামী অংশঃ। ভারদ্বাজো
৪। বাজসনেয়ী বসুদত্তস্বামীদ্বিবংশঃ। আলম্বায়ণো বাজসনেয়ী যাগেশ্বর স্বামী দ্বিরংশঃ।
৫। বিশ্বেশ্বর স্বামী অংশঃ। দিব্যেশ্বরস্বামী অংশঃ। গণেশ্বর স্বামী অংশঃ। বুধেশ্বর স্বামী অংশঃ।
৬। জাতেশ্বরাঙ্গেশ্বরাভ্যাম্ অংশঃ। ধৌতেশ্বর স্বামী অংশাচ্চতুর্থভাগঃ মঘেশ্বর স্বামী অংশাচতুর্থভাগঃ ॥
৭। জহ্নীশ্বর স্বামী অর্ধাংশঃ। নন্দেশ্বর স্বামী অংশঃ আঙ্গিরসো বাজসনেয়ী দামভূতি
৮। স্বামী অংশঃ। কাশ্যপো বাহ্বৃচ্য প্রকাশবর স্বামী ভ্রাতৃসহিতো ংশঃ যাস্কো বাজসনেয়ী
৯। গায়ত্রিপাল স্বামী অংশঃ। পারাশর্যো বাহ্বৃচ্য শান্তশর্মস্বামী অংশঃ কৌশিকো
১০। বাহ্বৃচ্যঃ পদ্যুদাস স্বামী গোত্রাংশঃ ॥ গোবর্ধন যজ্ঞপাল পণু সুদর্শন স্বামি
১১। ভ্যাম্ অর্ধাংশঃ ॥ পাক্কলাশ্ছান্দোগো গোপালস্বামী অংশঃ। কাশ্যপস্তৈত্তিরীয়ষু উগ্রদত্তস্বামী
১২। অংশঃ ॥ বার্হস্পত্যো বাহ্বৃচ্যো ভট্টিনন্দস্বামী অংশঃ। সাধুস্বামী অংশঃ দেবকুল স্বামী অংশঃ ॥
১৩। জনার্দন স্বামী অর্ধাংশঃ ॥ সুনয়ন-নারায়ণ বৃদ্ধিস্বমিভাঃ অর্ধাংশঃ ॥ গৌতম বাহ্বৃ

ষষ্ঠ পট্ট (পশ্চাদ্‌ভাগ)

১৪। চ্য ঈশ্বর ভট্টিস্বামী অংশঃ॥ ভৃগুস্বামী অর্ধাংশঃ ভারদ্বাজ বাহ্বৃচ্য রুদ্র ঘোষ স্বামী অংশঃ॥ কাত্যায়নশ্চারকঃ কৌশিসো

১৫। ম স্বামী অংশঃ। গৌতমো বাজসনেয়ী প্রভাকর কীর্তিস্বামী অংশঃ॥ শাণ্ডিল্যো বাজসনেয়ী আনন্দস্বামী অংশঃ॥

১৬। শৌনকো বাহ্বৃচ্যো গতিভট্টিস্বামী অংশঃ॥ তেজভট্টিস্বামী অংশঃ॥ মনঘোষ তেজভট্টি নন্দভূ

১৭। তি স্বামিভ্যাম্ অর্ধাংশঃ॥ দামভট্টি স্বামী অংশঃ॥ মেঘভট্টিস্বামী অংশঃ। সুমতিভট্টিস্বামী অংশঃ॥

১৮। সুযোগ ভট্টিস্বামী অংশঃ॥ বাৎস্যো বাহ্বৃচা শাশ্বত দাম স্বামী অংশঃ॥ গৌতমশ্ছান্দোগঃ তোষস্বামী

১৯। অংশঃ। বারাহো বাহ্বৃচ্যো ভট্টি হর স্বামী অংশঃ। ভারদ্বাজো বাজসনেয়ী নাগদত্তস্বামী অর্ধাংশঃ।

২০। আলম্বায়নো দূর্বেশ্বর স্বামী ভ্রাতাসহার্ধাংশঃ। ভারদ্বাজো রূপাঢ্যস্বামী অর্ধাংশ॥ কৌশিক

২১। বাহ্বৃচ্য চন্দ্রদাস বিমর্দন দাস স্বামিনোয়েকাংশঃ। কাশ্যপো বাজসনেয়ী

২২। সুপ্রতিষ্ঠিত স্বামী অংশঃ॥ গৌতমনন্দন স্বামী অংশঃ। শাকটায়নঃ তোষস্বামী

২৩। অর্ধাংশঃ। গৌতমকাশ্যপয়োঃ সারসবকুল স্বামিনোরেকংশ। ভারদ্বাজো বিদুষ

২৪। স্বামিনো অর্ধাংশশ্বেতি॥ বলিচরুসত্রোপযোগায় সপ্তাংশাঃ॥ যদেতৎ কোশিকো পচিতকক্ষেত্রং

২৫। তৎ প্রফলং প্রতিগ্রাহক ব্রাহ্মণনামেব যত্ত্ব গঙ্গিণ্যপচিতক ক্ষেত্রং তদ্‌যথালিখিত

২৬। ক ব্রাহ্মনৈঃ বিভজ্যতামিতি॥ সীমানো যত্রপূর্বেণ শুষ্ককোশিকা। পূর্বদক্ষিণ

২৭। ণেন সৈব শুষ্ক কৌশিকাডুম্বরীচ্ছেদ সংবেদ্যা। দক্ষিণেনাপি ডুম্বরীচ্ছেদঃ। দক্ষিণ

সপ্তম পট্ট

১। পশ্চিমেন গঙ্গিনিকাডুম্বরীচ্ছেদ সংবেদ্যা॥ পশ্চিমেনাধুনা সীমগঙ্গিনিকা॥ পশ্চিমো

২। ত্তরেণ কুম্ভকারগর্তসৈসব চ গঙ্গিণিকা প্রাগভূজ্যমানোত্তরেণ বৃহজ্জাটলী। উত্তরপূ

৩। র্বেণ ব্যবহারি খাসোক পুষ্করিণী সৈব শুষ্ককৌশিকা চেতি॥ আজ্ঞাশতং প্রাপয়িতা

৪। প্রাপ্তপঞ্চ মহাশব্দ শ্রী গোপালঃ। সীমাপ্রদাতা চন্দ্রপুরিনায়ক শ্রীক্ষিকুণ্ডঃ

৫। ন্যায়করণিক জনার্দন স্বামী ব্যবহারি হরদত্তঃ কায়স্থ দুক্কুনাথ প্রভৃতবঃ

৬। শাসয়িতা লেখায়িত চ বসুবর্ণঃ। ভাণ্ডাগারাধিকৃত মহাসামন্ত দিবাকরপ্রভঃ

৭। উৎখেটয়িতা দত্তকারপুর্ণঃ সেক্যকারকালিয়া॥ ষষ্টিং বর্ষসহস্রা

৮। নি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ। আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নবকে বসেৎ॥

৯। স্বদত্তাং পরদত্তাংবা যো হরেত বসুন্ধরাং সবিষ্ঠায়াং কৃমি র্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে।

১০। শাসন দাহা দার্বাগমিনব লিখিতানি ভিন্নরূপাণি। তেভ্যোক্ষরাণি যস্মা

১১। তস্মান্নৈতানি কূটানি॥

মহারাজা শ্রীচন্দ্র প্রদত্ত
পশ্চিমভাগ তাম্রপট্ট (দশম শতাব্দী)
সম্মুখভাগ

১। ৎ স্বস্তি। বন্দ্যো জিনস্‌স ভগবান করুণৈক পাত্রন্ধ ম্মোপ্য মৌ বি

২। জয়তে জগদেকদীপঃ। যৎ সেবয়া সকল এব মহানুভাব সন্সার—

৩। পারমুপগচ্ছতি ভিক্ষু সঙ্ঘঃ॥ পূর্ণচন্দ্র ইতি শ্রীমান্যাসীন্নাসী বজং রজঃ। যস্যা পুররয়ো পূর্বনা—

৪। তপক্রমপত্রপাঃ॥ নাম্নৌ বিশুদ্ধো ন তুল্যাধি রূঢ়ঃ কিন্তু প্রকৃত্যৈব যুতো গরিম্ণা। তথাপি কল্যাণ সু

৫। বর্ণ কল্পস্‌সুবর্ণ চন্দ্রস্‌সুকৃতী ততোভূৎ। দর্শেহস্য মাতা কিল দোহদেন দিদৃক্ষ মার্ণৌদিতবিন্দু—

৬। বিম্বং। সুবর্ণচন্দ্রেণ হি তোষিতেতি সুবর্ণচন্দ্রং যমুদাহরন্তি॥ তস্মাদ্বন্দি বিলোচনেন্দু দৃষদান্নি—

৭। স্‌সান্দ চন্দ্রোদয়ঃ কৌলীনাৎ সভয়স্‌সভা কমলিনী সুপ্রাতসন্ধ্যা তপঃ তৃষ্ণকৃচাতকমন্ডলী নবঘন স্‌সু

৮। গুপ্ত প্রজাযামিকঃ। ত্রৈলোক্য প্রথিতোরুকী র্তিরজনি ত্রৈলোক্য চন্দ্রো নৃপঃ। চতুঃ পয়োরাশি সমাপ্তপৃ—

৯। থ্বী জয়াভিলাষো বিষয়েস্ব লুব্ধঃ। যুদ্ধেষু নিস্তৃংশ লতা জলেন যো বৈরি বহ্নিং শময়াঞ্চকার॥ ক্ষীরোদাম—

১০। নদেব পর্বত ইতি শ্রীমত্তদেতৎ পুরং যত্রাগস্তজনস্য বিস্ময়রসঃ কম্বোজ বার্তাদ্ভুতৈঃ। লালম্বী বনমত্র বাতি

১১। কশতৈর ন্বিষ্ট সিদ্ধৌষধিব্যাহারা ইতি হশ্রুতাস্‌সমতট ন্নির্জিত্য যৎ সৈনিকৈঃ। ভূত্বা চঙ্গদধীনি কৃষ্ণ শিখ-

১২। রি গ্রামেষু কৌতূহলাৎ বিন্ধ্যস্যাপ্য ধি মেখলা বনতলং পীতা সুরুঙ্গা নদীঃ। জেতুর্যস্য বলৈ র্বগা

১৩। ভিমলয়ঃ শৃঙ্গোপল প্রস্খলৎ কাবেরীজল বেণিজর্জর বর ব্যামিশ্র-কোলা হলৈঃ॥ ইন্দ্রাণীব মহে

১৪। ন্দ্রস্য ভবানীব ভবস্য যা। তস্য শ্রীকাঞ্চিকা নাম বভূব মহিষী প্রিয়া॥ স রাজ যোগেন শুভ মুহূর্তে

১৫। মৌহূর্তি কৈস্ সূচিত রাজ চিহ্নং অবাপ তস্যাং তনয়ন্নয়জ্ঞঃ শ্রীচন্দ্র মিন্দু পমমিন্দ্র তেজাঃ। একাতপ-

১৬। ত্রাভরণাম্ভুবং যোবিধায় বৈধেয় জনা বিধেয়ঃ। চকার কায়াসু নিবেশিতারির্যশস্ সুগন্ধীনি দিশান্মু-

১৭। খানি। যৎ সৈন্যৈঃ কিল কামরূপ বিজয়ে বোহৎ কপোতীঘনা নিবিষ্টীঃ ভলপা কপিঙ্গকদলীকুঞ্জ

১৮। ভ্রমদ্বানবাঃ। বোমস্থলসবদ্ধনিদ্রচমরী সংসেবিত প্রান্তবা লৌহিত্যস্য বনস্থলী পবিসবাঃ কালাগু

১৯। রশ্যামলাঃ সৈষা চিত্রশিলা মনোরমশিলা পুষ্প প্রতানাচিতা তালী সচ্ছদ মর্মরৈঃ পরিসরৈঃ

২০। সা পুষ্পভদ্রা নদী। ইত্যুৎ কণ্ঠুলমুত্তরা পথ জয়ে যৎ সৈনিক শ্রোত্রিয়ৈ রধ্যায়ে পঠিতাশ্চিরং হিমগিরৌ

২১। দৃষ্টা স্থলী দেবতাঃ॥ সন্তোষং বণ দেবতাঙ্গময়ত্র বীর্যাবদানৈর্ন্নির্জ্জেকন্মৃষ্টং বমণী পয়োধব তট পত্রা

২২। ঙ্গুলি মন্ডলং। শোকপ্রচ্ছন্নজর্জরং বিরচিতং ভূপী কপোলদরং যেনোন্মূলিত মুৎকলী নয়নয়ো স্তালীসুবা

২৩। ঘূর্ণিতং॥ স্পৃষ্টঃ পার্থিব পানসু দোহদবমশ্লাঘা ধনৈ র্দিগ্‌গজৈ র্নেত্রাণাম্ নিমেষতঃ পরিহৃতো দূবেণ ব্

২৪। ন্দাবকৈঃ। কেশশ্বঙ্গর সাম পূর্ব পলিতভ্রান্তিক্ষমা রোপয়ন্ সন্তানো রজসাং বণেষু জয়িনো যস্য দ্যুমার্প-

২৫। ক্ততঃ॥ স খলু শ্রী বিক্রমপুব সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবাবাৎ পরমসৌগতঃ পবমেশ্ববঃ পরমভট্টারক

২৬। মহাবাজাধিবাজ শ্রী ত্রৈলোক্যচন্দ্র দেব পাদানুধ্যাতঃ পরম সৌগতঃ পরমেশ্বরঃ পবমভট্টাবকো মহা-

২৭। রাজাধিবাজঃ শ্রীমান শ্রীচন্দ্র দেবঃ কুশলী। শ্রী পৌন্ড্র বর্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি শ্রীহট্ট মন্ডল সাতল বর্গজ-

২৮। সম্বন্ধ অবেড়িকাসমেত-গরলা বিষয়— পোগার বিষয়-চন্দ্রপুর বিষয়েষু। সমুপগতাশেষ বাজ্ঞী। রা—

পশ্চাদ্‌ভাগ

২৯। ণক। রাজপুত্র। মহাসান্ধিবিগ্রহিক। মহাসৈন্যপতি। মহামুদ্রাধিকৃত।

৩০। মহাক্ষপটলিক। পাদমূলিক। মহাপ্রতীহার। মহাতন্ত্রাধিকৃত। মহাসর্বাধিকৃত। মহাবলা-

৩১। ধিকরণিক। মহাব্যূহপতি। মণ্ডলপতি। কোট্টপাল। দৌস্‌সাধসাধনিক। চৌরোদ্ধরণিক। নৌবলহস্ত্যশ্ব গোমহি-

৩২। ষাজাবিকা দিব্যাপৃতক। গৌল্মিক। শৌল্কিক। দাণ্ডিক। দাণ্ডপাশিক। দাণ্ডনায়ক। বিষয়পত্যাদীন্যনাংশ্চ বাজপাদো-

৩৩। পজীবিনোধ্যক্ষ প্রচারোক্তা নিহাকীর্তিতান্। চাটভটজাতীয়ান্। জনপদান্ ক্ষেত্রকবাংশ্চ ব্রাহ্মণোত্তরান। যথার্হং মানয়

৩৪। তি। বোধয়তি। সমাজ্ঞাপয়তি চ। মতমস্তভবতাং। বিষযানেত্তান্ পূর্বেণ বৃহৎ কোট্টালিসীমা। দক্ষিণেন মণিনদী সীমা। পশ্চির্মে

৩৫। ন জুজ্জন খাতক কাষ্ঠপণ্য খাতক বেত্র ঘণ্ডী নদীসীমা। উত্তরেণ কোসিয়াব নদীসীমা। ইত্যেবং চতুঃসীমাপর্যন্তান্ শ্রী শ্রী

৩৬। চন্দ্রপুবাভিধানং ব্রহ্ম পুবম্পরিকল্প্য। এতস্মিন্ শ্রী চন্দ্রপুবে। ব্রহ্মণে। এতন্মঠ প্রতিবদ্ধ চন্দ্র ব্যাখ্যানো পাধ্যাযস্য দ-

৩৭। শদ্রৌণিক দশপাটকাঃ। দশচ্ছত্রাণাং পালি ফুট্টকার্থং দশপাটকাঃ। অপূর্ব পক ব্রাহ্মণানাং প্রত্যহন্তুক্তন্দা ভুম্পঞ্চপা-

৩৮। পাটকাঃ। এতদধিষ্ঠায কারযিতু ব্রাহ্মণস্য পাটকঃ। গণকস্য পাটকঃ। কাযস্থস্য সার্ধ পাটক দ্বযং। মালাকাব চতুষ্ট-

৩৯। য়স্য। তৈলিকদ্বয়স্য। কুম্ভকাব দ্বয়স্য। পঞ্চ কাহলিকানাং। শঙ্খবাদক দ্বযস্য। ঢক্কাবাদক দ্বযস্য। অষ্ট দ্রাগড়িকা-

৪০। নাং। দ্বাবিংশতি কর্মকর চর্মকবাণাঞ্চ। অষ্ট বেষ্টিকানাং প্রত্যেকং। অর্ধ পাটকঃ। নটস্য পাটকদ্বয়ং। সূত্রধার দ্বয়স্য। স্থপতি দ্বযস্য। কর্মকা

৪১। ব দ্বযস্য চ। প্রত্যেকং পাটকদ্বয়ং। অষ্টবেষ্টিকানাং প্রত্যেকং পাদোনপাটকঃ। নবকর্ম নিমিত্তঞ্চ সপ্তচত্বাবিংশৎ পাটকাঃ। এ-

৪২। বমনেন নিযমেন বিংশত্যধিকপাটকশতং। তথা দেশান্তরীয় মঠ চতুষ্টযে। বঙ্গাল মঠ চতুষ্টয়েব। বৈশ্বানব যোগেশ্বব-

৪৩। জৈমণি-মহাকালেভ্যশ্চ। এষামুভয়েষাং মঠ প্রতিবদ্ধ ঋগ্ যজু সামাথর্বৈর্বোপাধ্যায়ানাম ষ্টানাং প্রত্যেকং দশপাটকাঃ। প্র-

৪৪। তিমঠ পঞ্চছাত্রাণাং পঞ্চপাটকাঃ। মালাকাব-নাপিত তৈলিক-রজকানাং। অষ্টকর্মকব চর্মকারাণঞ্চ। প্রত্যেকং অর্ধ-

৪৫। পাটকঃ বেট্টিকা দ্বয়স্য প্রত্যেকং পাদোন পাটকঃ। প্রতিমঠন্নব কর্ম নিমিত্তঞ্চ দশপাটকাঃ। প্রতিমঠ চতুষ্টয়ে চ। ম-

৪৬। হত্তব ব্রাহ্মণস্য। পাটকদ্বয়ং। বারিকস্য সার্ধপাটকঃ। কায়স্থস্য সার্ধপাটকদ্বয়ং। গর্ণকস্য পাটকঃ। বৈদ্যস্য পাট-

৪৭। কত্রয়ং। এবমনেন নিয়মেন। অশীত্যুত্তর পাটক শতদ্বয়ং। বাবুস দত্ত। হর্ষ। শেখর। বিশ্বরূপ। ভানুদত্ত। ঈশান।

৪৮। বৎসনাগ। নন্দ। যশঃ। চঙ্গ। গোবর্ধন। সিঙঘদত্ত। কমলনন্দি। সবিতার মানিকা কামুক। ভীমপাল। অন্তগ। বৎসধর। নন্দ ঘো-

৪৯। ষ। শ্রীধর। রাম। শিববন্ধু। মঙ্গল। বেদো। ধবল। বিহূদত্ত। শান্তিদাস। গর্গ শর্ম। মহীন্দ্রসোম। রবিকর। ভানু। নারায়ণ।

৫০। গর্গ গুপ্ত। শশী দত্ত। হরি। জয় দত্ত গর্গাদি ষড ব্রাহ্মণ সহস্রেভ্যশ্চ। নানা গোত্র প্রবরেভ্যঃ। চতুশ্চরণ নানা শাখা ধ্যায়িভ্যঃ।

৫১। সমবিভাগেন শেষভূমিঃ। ইতোব। ব্রহ্ম। অগ্নি। যোগেশ্বর। জৈমনিমহাকালেভ্যঃ। ষড ব্রাহ্মণ সহস্রেভ্যশ্চ। উপরিলিখিত-

৫২। সীমাবচ্ছিন্না বেড়িকাসমেত বিষয়া এতে। সতলাঃ। সোদ্দেশাঃ। সাম্রপনসাঃ। সগূবানা লিকেরাঃ। সজল স্থলাঃ। সগর্তোষরাঃ। স-

৫৩। দশাপরাধাঃ। স চৌরোদ্ধরণাঃ। পরিহৃত সর্বপীড়াঃ। অচাটভট্টপ্রবেশাঃ। অকিঞ্চিদ্ গ্রাহ্যাঃ। সমস্তরাজ ভোগকর হিরণ্যপ্রত্যা-

৫৪। য়সহিতাঃ। রত্নত্রয়ভূমি বর্জিতাঃ। ইন্দ্রেশ্বব নৌবন্ধ প্রতিবদ্ধ দশদ্রৌণিকদ্বা পঞ্চাশৎ পাটক বহিঃ। মহামুদ্রাধিকৃত শ্রীশুভা -

৫৫। ঙ্গদূতমুখেন। ভগবন্তম্বুদ্ধ ভট্টারকমুদ্দিশ্য। মাতাপিত্রোবাত্মনশ্চ পুণ্য যশোর্ভিবৃদ্ধয়ে। শ্রাবণ রবি সংক্রান্তৌ। বিধিবদুদক-

৫৬। পূর্বকং কৃত্বা। আচন্দ্রার্ক ক্ষিতিসমকালং যাবৎ। ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন। তাম্র শাসনীকৃত্য। প্রদত্তা অস্মাভিঃ। যতো ভবদ্ভির্জন পদৈঃ

৫৭। ক্ষেত্র করৈব্রাহ্মণৈশ্চ বিধেয়ীভূয় যথাদীয়মান প্রত্যায়োপনযঃ কার্যঃ। যথাকালভাবি ভোগপতিরপি ভূমের্দান ফলগৌ-

৫৮। রবাৎ। অপহরণে মহানরকপাতভয়ায়। দানমিদং সমাগনু মোদ্যানুপালনীয়মিতি।। সম্বৎ বৈশাখ দিনে ৫। তথা চ ধর্মা

৫৯। নুসংসিনঃ শ্লোকাঃ। বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ যস্য যস্য ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং। ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ

৬০। ভূমিম্ প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্যকর্মাণৌ নিযতং স্বর্গগামিনৌ সর্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান্ ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থযতোষ বামঃ।

৬১। সামান্যোয়ং ধর্মসেতুর্নৃপানাং কালে কালে পালনীয়ঃ ক্রমেণ। স্বদত্তা স্পরদত্তাম্বা যো হরেৎ বসুন্ধরাং স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা।

৬২। পিতৃভিস্ সহ পচ্যতে।। ইতি কমল দলাম্বুবিন্দু লোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ। সকল মিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পু-

৬৩। রুষৈঃ পরকীর্তযো বিলোপ্যাঃ।। শালবরেন্দ্রি বিনির্গত শুভাঙ্গ দূতমু খেন চন্দ্রপুরং শাসনমিদ স্প্রবৃত্তং রাজ্ঞঃ শ্রীচন্দ্র দে-

৬৪। বস্য।। কালীগ্রামভবো বৈষ্ণবঃ সমারোপয়াং বভূব কৃতী। শ্রীমান্ বিনায়কাখ্যো বিপ্রাণাং ষটসহস্রা নি।। এতচ্ছাসনম্।

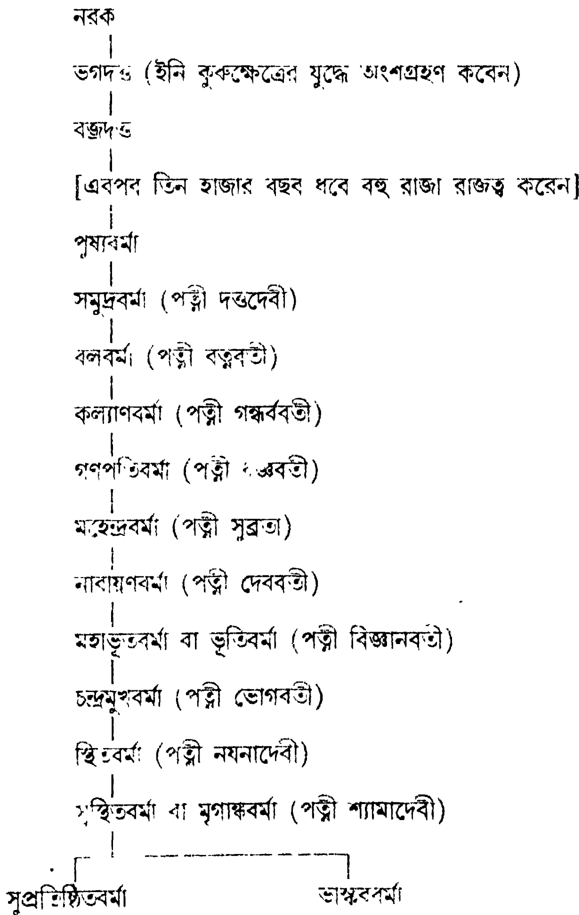
৬৫। ৎকীর্ণং হরদাসেন শিল্পিনা। বার্তা বিনির্মিতং যস্য। সাদৃশ্যং কর্মণঃ ক্বচিৎ। সান্ধিনি অনু

[পূর্বোক্ত দুটি তাম্রপট্টের পাঠ শ্রী কমলাকান্ত গুপ্ত নির্ণীত।]

মন্তব্য

শ্রীহট্টের ইতিহাস আলোচনায় নিধনপুর তাম্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই তাম্র শাসনের প্রাপ্ত তথ্যাদি নিয়ে মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ সরস্বতী ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। তাম্রপট্ট প্রদাতা হলেন কামরূপের মহারাজা ভাস্করবর্মা। ইনি সম্রাট হর্ষবর্ধনের বন্ধু ছিলেন এবং এঁর সহায়তায় হর্ষবর্ধন বাংলার রাজা শশাঙ্ককে পরাভূত করেন। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। দেখা যাচ্ছে, কর্ণসুবর্ণে অবস্থান কালে মহারাজা ভাস্করবর্মা তাম্রপট্ট দান করেন। তাম্রপট্ট প্রাপক ব্রাহ্মণদের পূর্বে ভূমি দান করেছিলেন মহারাজা মহাভূতবর্মা (বা ভূতিবর্মা)। তাম্রপট্টটি হারিয়ে যাওয়ায় ব্রাহ্মণদের অনুরোধে মহারাজা ভাস্করবর্মা নতুন করে এই তাম্র পট্ট প্রদান করেন।

তাম্রপট্টে উল্লেখিত কামরূপ রাজবংশের পরিচয়ঃ



তাম্রপট্টে জমির সীমানা নির্দেশ করা হয়েছে— পূর্বে কোশিকা বা কৌশিকা নদীর শুষ্ক খাত। দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি কাটা ডুমুর গাছ আছে। গাঙ্গিনিকা বা শুকিয়ে যাওয়া নদী আছে পশ্চিমে। ওই নদীখাত পূর্বমুখে ঘুরে গেছে— সেখানে আছে একটি কুম্ভকার গর্ত। উত্তরে একটি বৃহৎ জাটলী বৃক্ষ। উত্তর-পূর্বে ব্যবহারী খাসোকার পুকুর ও শুষ্ক কৌশিকা নদী খাত।

ক্ষেত্রের নাম ময়ূরশাল্মল অগ্রহার-তা চন্দ্রপুর বা চন্দ্রপুরী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। ভূমি দান করা হয়েছে ভূমিছিদ্রন্যায অনুসারে। ভূমিছিদ্র অর্থে ছিদ্রযুক্ত বা চাষের অযোগ্য ভূমি।

মহামহোপাধ্যায পদ্মনাথ সরস্বতী মনে করেছিলেন চন্দ্রপুর বিষয় উত্তরবঙ্গে অবস্থিত ছিল। কিন্তু শ্রীকমলাকান্ত গুপ্ত যথার্থই বলেছেন— চন্দ্রপুর বিষয় শ্রীহট্টেই অবস্থিত। পশ্চিমভাগে প্রাপ্ত মহারাজা শ্রীচন্দ্রের তাম্রপট্টে স্পষ্টই বলা হয়েছে— চন্দ্রপুর বিষয় পৌন্ড্রবর্ধন— ভুক্তির অন্তর্গত শ্রীহট্ট মণ্ডলে অবস্থিত। ময়ূরশাল্মল অগ্রহার ক্ষেত্রটি যে পঞ্চখণ্ডেই ছিল (যার কাছাকাছি এলাকায় নিধনপুরে তাম্রপট্ট পাওয়া যায়) সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রদত্ত ভূমির একটি বৃহৎ অংশ বলিচরুসত্রের জন্য সংরক্ষিত। বলিচরু (পূজা) এবং সত্র (অতিথিসেবার) জন্য যে ব্রাহ্মণেরা নিযুক্ত ছিলেন সম্ভবতঃ তাঁরাই দান প্রাপক। পঞ্চখণ্ড সুপাতলায় বাসুদেব বিগ্রহ পূজিত হন। অনুমিত হয় এই মন্দিরের জন্যই ভূমি প্রদত্ত।

পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনটি পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত মহারাজা শ্রীচন্দ্রের দ্বারা প্রদত্ত। চন্দ্রবংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই বংশের মহারাজা পূর্ণচন্দ্র— সুবর্ণচন্দ্র— ত্রৈলোক্যচন্দ্র— শ্রীচন্দ্র পাল বংশের দেবপাল— বিগ্রহপাল (১)— নারায়ণ পাল ও রাজ্যপালের সমসাময়িক ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

ত্রিপুরার মহারাজা যজ্ঞ উপলক্ষে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে মিথিলা থেকে আনিয়ে ভূমিদান করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। ত্রিপুরার সেই মহারাজার (আদি ধর্মপা) কাল নির্দেশ করা যায় নি। মহারাজা শ্রীচন্দ্রের প্রদত্ত তাম্রপট্ট পাবার পর অনুমিত হচ্ছে ত্রিপুরার মহারাজা বলতে শ্রীচন্দ্রের কথাই বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট

ক

অদ্বৈত আচার্য

চৈতন্য বন্দনা

পুলকে রচিত গায়　　সুখে গড়াগড়ি যায়
　　দেখরে চৈতন্য অবতারা।
বৈকুণ্ঠ নায়ক হরি　　দ্বিজরূপে অবতরি
　　সংকীর্তনে করেন বিহারা॥
কনক জিনিয়া কান্তি　　শ্রী বিগ্রহ শোহে রে
　　আজানুলম্বিত মালা সাজে রে।
সন্ন্যাসীর রূপে　　আপন রসে বিহ্বল
　　না জানি কেমন সুখে নাচে রে॥
জয় জয় গৌর　　সুন্দর করুণাসিন্ধু
　　জয় জয় সুন্দর বৃন্দাবন রায়া রে।
জয় জয় সম্প্রতি,　　নবদ্বীপ পুরন্দর
　　চরণকমল দেহ ছায়া রে॥
(চৈতন্য ভাগবতে উদ্ধৃত)

মুরারি গুপ্ত

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি

কি ছার পিরীতে কৈলা　　জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
　　বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই।
সফরী সলিল বিন　　গোঙাইবে কত দিন
　　শুন শুন নিঠুর মাধাই॥
ঘৃত দিয়া এক রতি　　জ্বালি আইলা যুগবাতি
　　সে কেমনে রহে অযোগানে।
তাহে সে পবনে শুন　　নিভাইল বাসোঁ হেন
　　ঝাট আসি রাখহ পরানে॥

বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরীতি তোষে
স্থান ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়।
তার সাক্ষী পদ্ম ভানু জল ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পিরীতি না রয়॥
যত সুখে বাড়াইলা তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদবন্ধু ভাতি।
গুপ্ত কহে একমাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহুরাতি॥

যদু কবিচন্দ্র

গৌরাঙ্গের রূপ

বিকচ কনয়া কষণ কাঁতি
বদন পূর্ণিমা চাঁদের ভাতি।
দশন শিখর নিকর পাঁতি
অধরে অরুণ বান্ধুলী মাতি।
মধুর মধুর গৌরাঙ্গ শোভা
এ তিন ভুবন নয়ন লোভা।
কি জানি কি রসে সতত মাতি
গমন মন্থর গজেন্দ্র ভাতি।
অরুণ নয়নে ঝরয়ে লোর
আসিয়া বসে কি চকোর জোড়।
সোঙরি কান্দয়ে পূরব লেহ
যৈছন গরজে নবীন মেহ।
কোথা বৃন্দাবন বলিয়া ডাকে
যদু কহে পহুঁ ঠেকিলা পাকে॥

খ

সুন্দরীমোহন দাস-কৃত 'সিলেটী রামায়ণ'

ঐ দেখ সূর্য উঠইন বিয়ানিয়া বেলা।
হৌ গুষ্টির রাজা দশরথ বড় ভালা॥
তিন বিয়া কইল্যা রাজায় কপাল পুড়িয়া।
এক রাণীর না অইল এগুয়া পুয়া॥
কুবাই তনে আইলা মুনি রাজার অন্দর
গাট্টা গাট্টা চাইর পুয়া আইলা রাজার ঘর॥
বড় রাণীর পুয়া রাম, ভরত মাইঝানর অইন।
হুরু রাণীর দুই পুয়া লক্ষ্মণ শত্রুঘইন॥
দশরথে আইজ্ঞা দিলা রাম অইতা রাজা।
হুনিয়া বড় সুখী হইলা রাজ্যের যত প্রজা॥
কেকয়ীর এক বাপর বাড়ির বান্দী কপালপুড়া।
পিঠ যেলান মন হেলান ধনুর লাখান তেড়া॥
কেকয়ীরে কইলা গিয়া রাম রাজা অইত।
তোর ছাওয়াল ভরত বুঝি ক্ষুদর জাউ খাইত॥
বড়র পুয়া রাজা অইলে তুই অইবে বান্দী।
ভরত রাজা অইবার লাগি পড় গিয়া কান্দি॥
হুনিয়া কেকয়ীর মাথা চৌরঙ্গী দিলাইল।
গুসা করি উপাস থাকি মাটির উপর হইল॥
দশরথে দেখি কইল ইতা কর কিতা।
ঐ দন্ডত দিতাম পারি তুমি চাও যেতা॥
কেকয়ী উঠিয়া কইলা রামরে পাঠাও বনে।
আমার ভরতরে বয়াও সিংহাসনে॥
সুয়া রাণীর কথা হুনি রাজা গলি গেলা।
কইলা কান্দিও না সুনা তুমার কথাউ ভালা॥
রাম গেলা বনবাসে ভরত বড় বুকা।
সিংহাসন আনি রাইখলা রামর পাদুকা॥

বাউগ পাইয়া বউ চুরি করিলা রাবণ।
বন্দির লাগি করইন রামে যুদ্ধর আয়জন।।
বুদ্ধিমানে জাম্বুবানে কইন লও ঠেলা।
লংকায় যাইতায় কুন্ হালা।।
ফাল মারি হনুমান হইল লঙ্কা পার।
লেঙ্গুরে আগুন বান্দি লংকা করিল ছারকার।
বড় বড় গাছ দিয়া বানাইল এক পুল।
বান্দরে রাক্ষসে যুদ্ধ লাগল তুমুল।।
রাবণের রাক্ষস বংশ হকল উজাড় করিয়া।
হুক্কু হুক্কু করে বান্দর লেঙ্গুর লাচাইয়া।।
বান্দর গুষ্টি লইয়া রামে যুদ্ধ করইন ভীষণ।
রাবণ মারি আইনলা সীতা ঔত রামায়ণ।।

কাছাড়ের কাব্য নিদর্শন

এক

রাজ্যভ্রষ্ট রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রচিত সঙ্গীত

নাম তোমার রণচণ্ডী মাও রণের জান ছন্ধি।
রাখিয়াছ হেড়ম্বেশ্বর মাও করি নানা সন্ধি॥
জন্মস্থান এড়ি আইলাম মাও তোমার নামটি শুনি।
স্থানমান দিয়া রাখ তোমার নামের ধ্বনি॥
মেড়া মাংস মহিষ বলি মাও তাহে নাহি গণি।
আনন্দে মগন হইয়া দিমু নানা বলি॥
চৌদিকে অরণ্য মধ্যে মাও তোমার নামটি জাগে।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ তোমার চরণ মাগে॥

দুই

গ্রাম্যগীতি—— 'মদনরাজা'

আগে করে সখীগণ সঙ্গে লইয়া চলে
রূপস ভেলাই চলি গেলা নদীয়ায় ছিনানে
সখীগণ লইয়া কইন্যা ফট্‌খেইড় খেলে
বউল গাছর তল বসি মদন রাজা দেখে
খেশ ভালা দেখিল্ রাজা আরিয়ার চর
মাথা ভালা দেখিল্ রাজা ডাব নারিয়ল
চক্ষি ভালা দেখিল্ রাজা হাগের দুই তারা
ঠোট ভালা দেখিল্ রাজা হাচিপানের বিরা
এইসব দেখিয়া রাজা গুরা পিঠি লইয়া
পাটে হামাইয়া রাজা কবাট লাগাইলা

মাইয়ে জিগাইলে রাজা না দিলা উত্তর
কিসের দুঃখী মদন রাজা কইবায় আপন
কবাট খুলিয়া কথা কইও মায়ের আগে
যেই ইচ্ছা কর বাজা সেই দিবে মাইয়ে
কত মতে কথা কইলা মদন রাজার মাও
কুন মতে মদন রাজা না কয়িলা রাও।
কিসের দুঃখী অইছ রাজা কও মাইর আগে
যেই তুমি মাঙ্গন কর সেই দিবে মাইয়ে
সত্যি কর মাই তুমার বেটার আগে
সুনা বারই রূপা বারই তারা দুই ভাই
তান ঘর জর্ম কইন্যা রূপস ভেলাই
এই কইন্যা মাইয়ে যদি খুসিয়ে না দেও বিয়া
আস্ পার রাখিমু আমি বারইর বাড়ি গিয়া
কবাট খুল মদন রাজা বাকি্য কইলাম মাইয়ে
কাইল কুয়া যাইমু আমি কইন্যা জুরিবারে
রাতি পুয়াইলে মাইয়ে দাসী বুড়ি ডাকে
গুয়াপানের ঝাপি আনি হাজাও সত্তরে

[করে—পেছনে, ফট্‌খেইড়—লাই, একপ্রকার জল খেলা, খেশ—কেশ, হাগের—স্বর্গের, আরিয়ার চর—চমরী গাভীব পুচ্ছ, গুরা—ঘোড়া, হামাইয়া—প্রবেশ করিয়া, জর্ম—জন্ম, আস পার—হাঁস, পারাবত; বউল—বকুল]।

ঘ

প্রাচীন দলিল ও পত্র সংকলন

এক

প্রাচীন রসিদের নিদর্শন

লিখিতং শ্রীসেক আতাউল্লা মৃধা পং বাণিয়াচঙ্গ মহাল মজকুর কবজপত্র মিদং কার্যঞ্চ আগে আমি মুকাম পরগণে ইটাত ৺জিউর দিঘিত পরগণা মজকুরর মাটী কামলা বেগার লৈয়া গিয়া মাটীকাম করিয়াছিলাম আমরার অজুরা সত্ত্ব দিঘি মজকুর যে মাটী কাটিছিলাম এর মবলগ ২০ ৯ ১৪॥ বিস কাহন দুই পণ চৌদ্দগণ্ডা সাড়ে কৌড়ি মং তপছিল মবলগ মজকুর গৌরিবল্লভ পৌতদাবও গযরহর তহবিল হনে তামাম কামাল সমজিয়া পাইয়া কবজ দিলাম ছালিন হনে দাওয়া করি ঝুটা বাতিল এতদর্থে কবজপত্র দিলাম। ইতি সন ১১৫৩ সাল বতারিখ সাবান।

[রসিদের দক্ষিণপাশে পাঁচটি ফার্সি মোহর এবং আতাউল্লা মৃধার নাম দস্তখত আছে]

দুই

দানপত্রের নিদর্শন

ইয়াদিকির্দ শ্রীগোবিন্দরাম চক্রবর্তী ও শ্রীরঘুনাথ চক্রবর্তী সদাসয়েষু— লিখিতং শ্রী পরগণা সেন গ্রামের চৌধুরী ও পুরকাইস্ত ৺পত্রমিদং কার্যঞ্চ আগে— আমার পরগণা মজকুর ময়াজি ১॥০ দেড় কুবলা জমিন খারিজ জমা জঙ্গলা শ্রীশ্রী .... পূজা ও তুমার ভরনপুসনর কারণ মকরর আছে আমরার সেই ময়াজি মজকুর মহাফিক তপছিল আবাদ আবাদানা করিয়া শ্রীশ্রীসেবা করিয়া পুত্র পৌত্রক্রমে ভুগ করহ আমরার প্রকাশ সদব জব্দ জমাবন্দি হৈতে যাহার চিঠা সামিল লেখাইয়া দিব এতদর্থে ব্রহ্ম উত্তর ও দেবউত্তর পত্র লেখীয়া দিলাম ইতি সন ১১০৩ সাল মাহে ৫ বৈশাখ।

[দাতার নাম— সর্বানন্দ সেন, শীবরাম সেন, ধনরাম সেন, যাদবরাম দেব, মহমুদ ছালে, আসাদ খাঁ।]

তিন

ঢাকাদক্ষিণে শ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে যে আয় হতো তা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেবার জন্য প্রস্তুত দলিল—

ইং শ্রীসিবরাম পণ্ডিত গং ও শ্রীপরশুরাম পণ্ডিত ও শ্রীকেশবরাম পণ্ডিত গং ও শ্রীখতুরাম পণ্ডিত অস্য সময় করাব পত্রমিদং কার্জঞ্চ আগে আমরা সকলে জমাবন্ধ (একত্র) হইআ সময় করিলাম, ঠাকুর সেবায় আমরার যে বারি (পালা) আছিল তাতে নবাব ও দেওয়ান ও রাজা গৈয়র (প্রভৃতি) ও দুর্লভ দাসের নিজঘর ও তান সঙ্গে জে আইসেন— সকলর ববান (এজমালি) আর দুর্লভ দাসর ইখানর (অর্থাৎ ঐ স্থানের) মুহন মালা ও লগুণ (সোনার মোহনমালা ও স্বর্ণউপবীত) গৈয়র ও খতে যে পাইছি এরে (ইহা) বাটীয়া (বিভাগ করিয়া) লৈমু এতে বের্ত কোন অজাউত তাফাউত করি ৺গুণাগার এতধন্তে সময় কবার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি ১১৬৬ সাল বতারিখ ১১ আষাড়।

চার

মনুষ্য ক্রয়ের দলিল, এতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে ঢাকার অধীনে শ্রীহট্টের নবাব ঈনাত খাঁ (অর্থাৎ ইনায়েৎ খাঁর) নাম আছে:

শ্রীশ্রীমতাং শুলতান ওরঙ্গসাহা দেব
পাদপদ্মানা—

স্বস্তি নবতি নবত্যুত্তর সহস্রাব্দে চৈত্রস্য একবিংশতি দিবসে ৺মভ্যুদয়িনি বাজো গৌড়বঙ্গেশ্বর শ্রীযুত নবাব ইব্রাহিম খাঁন মহাশয়ানাং ঢক্কাবস্থিতিকালে শ্রীহট্টাধিপতৌ শ্রীযুত নবাব সৈদ ইনাত খাঁ মহোদয়স্য বিষয়ে পরগণে বাজুবনভাগ চত্বরকান্তর্গত মৌজে মসুনাগ্রাম পাটকস্থ শ্রীরামজীবন চৌধুরী শকাশাত ষোড়শকার্ষাপণান গৃহীত্বা তত পরগণান্তর্গত তদ্গ্রাম নিবাসিনা শ্রীগঙ্গা রামধরেন নিজ দাশী শ্রীবদজানন্দীঃ স্বেচ্ছয়া বিক্রিতামিতি— অত্র প্রাণি এক অজয়মাল ১৬. সুন্ন কাহন ইতি সং ১০৯৯ সালতে ২১ চৈত্র।

[নিচে 'অত্রাত্রে সাক্ষিণঃ'— বলে বিভিন্ন হস্তাক্ষরে সামধর প্রভৃতি তিনজনের স্বাক্ষর আছে এবং পাশে দলিল লেখকের হস্তাক্ষরে 'শ্রীগঙ্গারাম ধরস্য মতং শ্রীবদনী দাসী নাম্নী খতঞ্চ' লিখিত। নিচের দক্ষিণ কোণে 'উভয়ানুমত্যা শ্রীগনেশরাম শর্মণা লিখিতামি' বলে লেখকের দস্তখত। দক্ষিণ পাশে 'উগাহী' শব্দের নিচে দুই ব্যক্তির স্বাক্ষর রয়েছে।]

পাঁচ

নিম্নোদ্ধৃত হকিকতনামা (স্বত্বনামা) থেকে ১০৫৪ সালের ভাষা ও লিখন পদ্ধতির উদাহরণ পাওয়া যাবে:

হকিকতনামা পত্রমিদং কার্যঞ্চ আগে আমরা আপনা আপনা মুরব্বি (প্রাচীন ব্যক্তি) সকলের পাসত (কাছে) শুনিয়াছি জুয়ার রায়গড়ের রঘুনন্দন চৌধুরী আছিলা দচপত (দস্তখত) তান আছিল [।] পরগণার সিকদার আছিলা ৺খিতাবী নাম রঘুনন্দন সিকদার আছিল— তান বেটা (পুত্র) বিষ্ণুদাস দেবে রাজমহলে উনকামাইতা সেখান ত আসিয়া সাদি (বিয়ে) করিয়া পুনশ্চ উন গেছিলা [।] অনেক বছর বাদে এক আসা বরদার (আসাধারী কর্মচারী) সঙ্গে লৈয়া একমাসের বিদায় লৈয়া বাড়ীতে আসিলা [।] একমাস বাদে আসাবরদারে নিবার (নেওয়ার) একীয়ত করিল (জানাল) [।] তাতে বিষ্ণুদাস দেব উন যাইবার কবুল (সম্মত) না করণে তান পিতা চৌধুরী-এ অনেক কহিলা [।] তথাচ উন যাইবার কবুল না করিলা [।] পরে রঘুনন্দন চৌধুরী তান বেটার উপর গরম হৈয়া (ক্রুদ্ধ হয়ে) তান ছুট ভাই শম্ভুরাম দেবকে কহিলা তুমি রাজমহলে উন জাও। [।] তাইন (তিনি) উন যাইবার কবুল করিলা [।] তান উপর খুস হৈয়া পাগুড়ি বান্দিয়া রাজমহলে উন দিলা— শম্ভুরাম দেবে অনেক বছর উন কামাইলা [।] পরে রঘুনন্দন চৌধুরীর কাল (মৃত্যু) হৈলে পরে শম্ভুরাম দেবে কাবি নামে চৌধুরাই ছনদ হাসিল করিয়া আনিয়া পরে বিষ্ণুদাস দেব গং ৺ইখান (এখানে) নালিস করিলা আমার পিতা রঘুনন্দন চৌধুরীর নামে দচখত আছিল [।] শম্ভুরাম দেবে কবি নামে ছনদ আনিলা ছববকি (কারণ কি?) তাতে শম্ভুরাম দেব জবাব দিলা আমার কেওর (কারো) নাম কবি না হয় [।] বিনাম ছনদ আনিছি [।] জুয়ারর ছয়বরা করিয়া ৺কাম জে দেয় তার নাম কবি— এই ছনদ বিষ্ণুদাস দেবের হৈল [।] তাইন (তিনি) কবি নামে দছখত করুকা (করুন) [।] পরে বিষ্ণুদাস দেবে জবাব দিলা বিনামের দচগত আমি না করিমু [।] আমার পিতা রঘুনন্দন চৌধুরী নামে দচখত আছিল [।] এখন ফয়েতি (মালিকশূন্য) হৈছে হাদুজ সেই নামে দচগত করিতেছি [।] এখন সেই নাম লেখিমু [।] এই কথা ৺শাক্ষাত মঞ্জুর হৈল— কবি নামের ছনদ জারি না হৈল— বিষ্ণুদাস দেবে জুয়ারর ছরবরা করিয়া ৺কাম দিতা [।] পরে বিষ্ণুদাস দেব কাহিলা (দুর্বল) হৈয়া ঘর বসিলা [।] শম্ভুরাম দেবে ৺কাম হিমতে করিয়া কবি নামের ছনদ জারি করি মথুরেশ নামে দছগত করিলা বিষ্ণুদাস গং না জানিয়াই ..... মজাহিম না মানিলা ..... হৈতে .... আমরা মুরবির পাসত শুনিছি [।] জানি শুনিয়া হকিকত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১০৫৪ (তারিখ কীটদষ্ট)

এই দলিলে ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তরের এগারো জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম স্বাক্ষর আছে, যথা মথুরেশ, শম্ভুচরণ, রাজারাম গুপ্ত, শেখ বিরাছিম ইত্যাদি।]

ছয়

ঢাকা দক্ষিণবাসী বাসুদেব ভট্টাচার্যের গুণে মুগ্ধ হয়ে শ্রীহট্টের নবাব মোহম্মদ আলী খাঁ বাহাদুর তাঁকে 'জনাবদার' উপাধি সহ ৮/০ হাল পরিমিত ভূমি দেবত্র দান করেন, তার সনদ—

সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্গত বাহাদুরপুর গয়রহ পরগণার মৎসুদ্দিগণ, চৌধুরীবর্গও কানুনগো সকল জ্ঞাত হইবেন যে প্রার্থী বাসুদেব ভট্টকে ৮/০ হাল জমি খারিজ জমা করিয়া দেওয়া গেল। পরগণা মজকুরের মৌজাজাত হইতে পূজার সরঞ্জাম খরচ ও সেই জনাবদার পূজারীব খুরাখি খরচের জন্য ইহা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, অতএব জনাবদার পূজারী ইহাতে পূজার সরঞ্জাম ও নিজের খরচের জন্য ব্যয় করিতে থাকে। কোন বিষয় জরিপ, জরিবানা শিকার, তীরমারা ইত্যাদি কষ্টকর বিষয় গয়রহ দেওয়া হইবে না। বৎসর বৎসর নূতন সনদ তলব করা না হয়, ইহা তাগিদ জানিবা। ১২ ববিয়স সানি ৮ জলুস।

[এই ৮/০ হাল ভূমির মধ্যে দেবার্চনার দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ৪/০ হালের উপস্বত্ব এবং নিজ জীবিকা নির্বাহের জন্য ৪/০ হালের আয় নির্দিষ্ট ছিল। ঐ সনদ প্রাপককে 'জবিবানা' 'তীরমারা' ইত্যাদি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এতে বোধ হয় যে কোন কোন স্থলে প্রাপকবর্গকে এ সকল উৎপাত ভোগ করতে হত এবং প্রতি বৎসর তাঁদের সনদ তলব করা হত।

সনদে জনাবদার উপাধিপ্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয় বাসুদেব ভট্টাচার্যকে পূজারী শব্দে সংজ্ঞিত করা হয়েছে। পূর্বে এই শব্দ হীনার্থক ছিল না। মুসলমান আমলে রাজকর্মচারিগণ দেবসেবার অধ্যক্ষদের পূজারী বলে লিখতেন। বস্তুতঃ পূজারী শব্দ যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি ব্যবহৃত হত বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত 'পূজারী গোস্বামী' ইত্যাদি উপাধি থেকে তা জানা যায়। বেতন ভোগী দেবপূজকেরা 'দেবল' কথিত হতে দেখা যায়।]

সাত

রাজপণ্ডিতির দুটি নিদর্শন

(ক) 'ব্রাহ্মণ-শাসনে'র ভট্টাচার্য বংশীয় রঘুনন্দন মিশ্র পরগণা খিত্তা প্রভৃতির রাজপণ্ডিতি পেয়েছিলেন। রঘুনন্দনের পুত্র রামনাথ পিতার মৃত্যুর পর রাজপণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ রাজপণ্ডিতি পান, এরপর এঁর ছেলে শ্রীকৃষ্ণ রাজপণ্ডিত হবার কথা, কিন্তু তাঁর বয়স অল্প বলে রামভদ্র রাজপণ্ডিতির দখলদার হন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র হরিশঙ্কর কার্যদক্ষ হলে পৈতৃক অধিকার লাভে সমর্থ হন। এই দলিলে দেখা যায় এঁরা চুয়াল্লিশ পরগণার রাজপণ্ডিতি পেয়েছিলেন। মূল ফার্সি দলিলের তলায় বাংলা অক্ষরে তার অনুবাদ লিপিবদ্ধ আছে, কোনো কোনো অংশ পাঠ করা যায়নি—

নকল বতারিখ (১৭* * সন ১১৭১ সাল ইহাদিকীর্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীহরিশঙ্কর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য সদাসত্রসু পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে * * খিত্যা গং পরগণা সকলর রাজপণ্ডিতি তুমার প্রপিতামহ ৺ভট্টাচার্য মকরর আছিলা— পত্রতে তান দছগত হইত। তাইন পরলোক হইলে তুমার পিতামহব জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামনাথ ভট্টাচার্য মকরর হৈছিলা— তান কাল হৈলেপর তুমার পিতা * * অল্প বত্রস প্রযুক্ত কার্যেতে দখল না আছিল ও রামভদ্র দখলকার হৈলা পত্রেতেও তাইন দছগত করিতা। অখন তুমিও কার্যদক্ষ প্রযুক্ত বদস্তুর সাবেক তুমার পিতামহর বিষয় * * করিলাম তুমীও তুমার পিতামহর বিষয় দছগত করিবায় এতদর্থে পত্র করিয়া দিলাম।

[দস্তখতের জায়গায় ফার্সিভাষায় লিখিত মূলের ডান পাশে শ্রীরঘুনন্দন রায়, শ্রীনাথ রায়, শ্রীজয়কৃষ্ণ রায়, ব্যতীত 'শ্রীমছউদ বক্ত' এই দস্তখতটিও আছে। মসউদ বখত্ শ্রীহট্টের সদর কানুনগো ও মজুমদার বংশীয় ছিলেন।]

(খ) শ্রীগঙ্গারাম চক্রবর্তী সদাশয়েষু লিখিতং শ্রীসাহবাজপুরের চৌধুরিয়ান ও কানোনগোইও পাটোরিয়ান বর্গস্য পত্র মিদং কার্জঞ্চ আগে আময়ার পরগণা মজকুরেত পূর্বে তুমার পিতামহের বাজপণ্ডিতি আছিল [।] এখনেই আমরা রজাবন্দ হৈয়া তুমারে রাজপণ্ডিত মকরর কবিলাম [।] তুমি 'হুজুর হনে ছনদ হাসিল করিয়া আমরার পরগণা মজগুরেত রাজপণ্ডিতি করহ [।] এতদর্থে পত্র লোখিয়া দিলাম ইতি সন ১১৫০ সাল তাং ১ কার্ত্তিক।

[এই দলিলের দক্ষিণ পাশে দস্তখত 'শ্রীমাহামদ ছাদনস, শ্রীফতে মাং মাহাম্মদস্য ও শ্রীরাঘবরামদেবস্য শ্রীগুল মাহাম্মদস্য' এবং একটি ফার্সি দস্তখত আছে। উক্ত নাম চারটি যথাক্রমে বাহাদুরপুরের জমিদার, শাহবাজপুরের জমিদার, লাউতার পুরকায়স্থ ও বাড়ুহুদার চৌধুরীর দস্তখত।]

৬

শ্রীহট্টীয় উপভাষা

শ্রীহট্টীয় উপভাষার কিছু কিছু বিশেষত্ব উল্লেখনীয়। এই উপভাষায় বাঙ্গালী ও কামরূপী দুয়েরই প্রভাব রয়েছে।

ধ্বনিতত্ত্ব

স্বরধ্বনি— অ, আ, ই, উ প্রভৃতি ধ্বনির দুটি করে উচ্চারণ হয়। একটি সাধারণ ভাবে বাংলার অ, আ, ই, উ প্রভৃতি। অন্যটি মূলত 'হ' থেকে উৎপন্ন এবং ঈষৎ শ্বাসাঘাতযুক্ত। যেমন, 'হয়' স্থানে 'অয়', 'হাত'— 'আৎ', 'হিসাব'— 'ইসাব', 'হুঁশ',— 'উস্'।

'ও' স্থলে 'উ'— খোকা > খুকা।

ব্যঞ্জনধ্বনি— 'ক' থেকে 'ম' পঁচিশটি স্পর্শবর্ণের সবগুলিতেই উষ্মীভবন লক্ষণীয়। তা সবচেয়ে প্রকট 'চ' বর্গ ও 'প' বর্গের ধ্বনিগুলিতে—

ভাত > বাত্; ধান > দান।

শ, ষ, স— এদের মধ্যে উচ্চারণগত পার্থক্য নেই। বহুক্ষেত্রে 'শ' 'হ্'-তে পরিণত, যেমন শ্যালা > হালা।

য ও জ-তে কোনো পার্থক্য নেই। অন্তঃস্থ 'ব' ও বর্গীয় 'ব' তেও পার্থক্য রক্ষিত হয় না। ড়, ঢ়— দুটিরই উচ্চারণ 'র'। ঘোড়া, গোরা, গুঁড়া— তিনটির উচ্চারণ একই রকম— 'গুরা'।

মূর্ধণ্য ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বাগ্র ঠিক মূর্ধা স্পর্শ করে না।

ধ্বনি পরিবর্তন

ই-স্থানে আই — তিনি > তাইন্।
ও-স্থানে উ — খোকা > খুকা।
ঋ-স্থানে ইর্ — মৃদঙ্গ > মিরদঙ্গ।
ঋ-স্থানে অ — দৃঢ় > দর।
এ-স্থানে অই — গেছেন > গেছইন।
এ-স্থানে আয় — যাইতে > যাইতায়।
ও-স্থানে অই — রোদ > রইদ্।
ওয়া-স্থানে ওন — খাওয়া > খাওন।
ব-স্থানে অর্ — প্রতি > পর্তি।
ল-স্থানে র — কোল > কুর।
অঘোষীভবন — বীজ > বিচ।
অল্পপ্রাণীভবন — দুধ > দুদ্; বাঘ > বাগ।
মধ্যব্যঞ্জনলোপ — বসিল > বইল।

রূপতত্ত্ব

প্রত্যয় — তদ্ধিতঃ আছে অর্থে 'নী' প্রত্যয় — চান্দনী (রাইত)। স্বার্থিক 'তা'— কি অর্থে কিতা। তুল্যার্থে 'আ'— ইটের তুল্য অর্থে 'ইটা'। আছে বা যুক্ত অর্থে 'আ'— গন্ধ > গান্ধা। অস্ত্যর্থে 'ই'— তল আছে যার 'তলই'।

কৃৎ : কর্তা বোঝাতে 'উরা'— (খ+উরা=খাউরা), অনীয়া (খাওনীয়া)। স্বরান্ত ধাতুতে অন্— নাচন।

ক্রিয়া—

নিত্যবৃত্ত বর্তমান— আমি যাই। তুমি যাও, আপনে যাইন্, তুই যাচ্। হে যায়, তাইন্ যাইন্।

ঘটমান বর্তমান— আমি যারাম্। তুমি যারায়, আপনে যারা, তুই যাবে। তাইন্ যারা, হে যার।

পুরাঘটিত বর্তমান— আমি গেছি। তুমি গেছ, আপনে গেছইন্, তুই গেছচ্। হে গেছে, তাইন্ গেছইন।

সাধারণ অতীত— আমি গেলাম। তুমি গেলায়, আপনে গেলা, তুই গেলে। হে গেল, তাইন্ গেলা।

নিত্যবৃত্ত অতীত— আমি যাইতাম। তুমি যাইতায়, আপনে যাইতা, তুই যাইতে। হে যাইত, তাইন্ যাইতা।

পুরাঘটিত অতীত— আমি গেছলাম। তুমি গেছলায়, আপনে গেছলা, তুই গেছলে। হে গেছিল্, তাইন্ গেছলা।

ঘটমান অতীত— নিত্যবৃত্ত বর্তমানের অনুরূপ—'যখন আমি বাজারে যাই তখন তার লগে দেখা অইল'।

সাধারণ ভবিষ্যৎ— আমি যাইমু। তুমি যাইবায়, আপনে যাইবা, তুই যাইবে। হে যাইব, তাইন্ যাইবা।
'না'-বাচক অব্যয়ের সঙ্গে থাকলে নিত্যবৃত্ত অতীত কালের মতো রূপ হয়—যাইমু 'না' স্থলে 'যাইতাম নায়'।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা— তুমি যাইও, আপনে যাইওইন্।

অসমাপিকা ক্রিয়া— 'ইতে' প্রত্যয়েব পরিবর্তে 'ইত'—সে যাইতে চায়—হে যাইত চায়।

কোনো কোনো অঞ্চলে 'ইতে'র পরিবর্তে 'ইবাব' ও 'বার' প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ দেখা যায়—'যাইবার', 'খাইবার' ইত্যাদি। 'ইতে' কোনো কোনো স্থলে শুধু 'তে' হয়—কান্তে কান্তে।

'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত পদ কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশক্ষেত্রে 'ইয়া' স্থলে শুধু 'ই'—খাইয়া যাও—খাই যাও।

'ইলে' প্রত্যয়ের প্রয়োগ শুদ্ধ বাংলার অনুরূপ।

শব্দভাণ্ডার—শ্রীহট্টীয় উপভাষায় তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশজ, বিদেশী সবরকম শব্দ পাওয়া যায়। কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ ও উৎপত্তি কৌতূহলজনকঃ

আউশ < আশা, আড়ুয়া (বোকা), উন্ধা (মাথা নিচু করে উর্ধ্বশ্বাসে ছোটা), কেরদানি (বাহাদুরী), চুকুম বুধাই < ত্রিপুরার চক্‌ম বুধাই চকম = মই; জামির < সং জম্বীর, টেকর (গাঁট্টা), ঠাটা (বজ্র), বন্দ্‌, (মাঠ), বরই < সং বদরী, বিরতুঙ্গ (আনারস) < বীজতুঙ্গ, বৈতল < সং বিস্থল, বইরাতি < বরযাত্রী, ভইনারি < ভগিনী+আরি, ভাতিজা < ভ্রাতৃজ, ভাদামিয়া < ভাদ্রমাসিয়া, ভেমতালা (বুদ্ধিবৃত্তির অক্রিয়তা), ভাগ্‌ (ক্ষমতা), মগ্‌রা (ফাঁকিবাজ), মেকুর (বিড়াল), রাব (গুড়), রিস্‌কিন্তি (ঠাট্টা), লপ্‌ (এক হাতের তালুতে যতখানি ধরে), লাকান < সং লক্ষণ, লেতর্‌ (চলৎশক্তিহীন), হউর (শ্বশুর), হরি (শাশুড়ি), হাবিগুতে < সার্বিক+গোত্র, হাই এড়ি (স্বামী পরিত্যক্তা), হিজা (সহ্য হওয়া), হেজা < সজারু, হুরইন্‌ (ঝাঁটা), সাউকার < সাধুকার ইত্যাদি।

শ্রীহট্টীয় উপভাষায় প্রচুর হিন্দী গোত্রীয় শব্দ আছে, যথা—আম্‌লি (ইম্‌লি), জুদা (পৃথক), তাজ্জব, তাবিস (প্রতাপ), তালেবর, ধুন্‌ (গভীর চিন্তা), ফাবাক, বইগ্‌লা (বগুলা), বেদিশা, বাজ্‌বন্দা, মছর (না-মছর=অপ্রাপ্য), মুনাসিব (বিবেচনা), মাত্‌, রআব (ফুটানি), বুরা (মন্দ), সাবুদ (সোজা) ইত্যাদি।

ঘটমান বর্তমান— 'তাইন্‌ যারা'— এখানে যারা সম্ভবতঃ হিন্দী 'যা রহা'-র প্রভাবে গঠিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'করিআরোঁ' জাতীয় ক্রিয়াপদের প্রভাবেও হতে পারে।

বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ—কানব ধারে কানাইর বাঁশী, উগারি সখ, ঘাড়র নাম গর্দনা, দেশের ভাই সুকুর মামুদ, পানি কাইত, মঘাইয়ার ফান্দ (মহাবিপদ) মা মরলে বাপ তাঐ।

চ

শ্রীহট্টীয় প্রবাদ প্রবচন

১. অপরোক্ষে রাজাও রাণীরে চর্চে।
(সমালোচনা করে)

২. অবতব গিরিসুতা মায়ে বলে পড় পুতা
পড়িলে সে দুধভাতা না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতা।

৩. আইলা পানি গেলা পানি, বৈলা পানি নিগ্রাউনি।
(প্রাচুর্য দুদিনের, অসচ্ছলতা বরাবরের জন্য)।

৪. আগে হাঁটা, ছাগল কাটা, বিয়ার ঘটক, প্রসাদ বাঁটা,
গাই খিবানি, জালাবাইন, চৌদ্দ পুরুষে গাইল খাইন।
(এসব কাজে গাল খেতেই হবে)

৫. আমে বান, তেতৈ এ ধান।
(আমি বেশি হলে বন্যা, তেঁতুল বেশি হলে ভাল ফসলের সম্ভাবনা)

৬. ইমান নাই দঢ়, কিওর নমাজ পড়।

৭. ঊনাভাতে দুনা বল, অধিক ভাতে রসাতল।

৮. এড়ি দিছি ডাউক, চবি ফিরি খাউক।

৯. কাউয়া হনে কাঁকডা সেয়ান, যার আছে ব্রহ্মজ্ঞান।

১০. কানের কাছে কানাইর বাঁশী।

১১. কিবা ভাগের চাউলতলী তার মাঝে গয়াস নগর।

১২. কুড়িয়া ছাগী, চেনাইবার যম।

১৩. খামকা গৌরাঙ্গ মোবে রাখ বাঙা পায়।
(বৃথা তোষামোদ)

১৪. গাঙে গাঙে দেখা হয় তবু ভইনে ভইনে দেখা হয় না।

১৫. ঘব নষ্ট বড় ভাই পাগল।

১৬. ঘোড়াব পিঠ খালি থাকে না।

১৭. চরে পাখি মরে না।
(কাজ কবলে শরীর সচল থাকে)

১৮. চেঙ উজাইন বেঙ উজাইন খৈয়া পুটি তাইনও উজাইন।

১৯. চোরেব মনে খিরাব খেত।

২০. ছাগলের ইচ্ছায় ঘাড়ে কুব।

২১. ঝি বেচিয়া কড়ি, গলায় লাগে দড়ি।

২২. ডুবছে নাও, ডুবাইয়া বাও।

২৩. তিন দিনেব বউয়ে তিন কাম কৈল,
তপ্তা পানি দিয়া লাউগাছ মাইল।

২৪. তেল তামুক ভক্ষণ তবে স্নানের লক্ষণ।

২৫. থাকলে কাচি হাবাইলে দা।

২৬. দিনের পাহাড় বাইতের আগুন।
(খুব নিকটে দেখায়)

২৭. দেখাদেখি ভেকায় নাচে।

২৮. নাই দেশে কলাইর ডাইল সন্দেশ।

২৯. ন্যায়ের হুটি (বিদ্যালঙ্কার)

৩০. পরের পুত কুত্তার মুত।

৩১. ময়না পড়তে পড়, নায়তে পিঞ্জিরা খালি কর।

৩২. মানুষে চিনে মানুষ, উলসে চিনে কাঁথা।

৩৩. লাঙ্গলের সাত কাইড়।
(খাঁজ—জোয়ালের দড়ি, একটা না একটায় লাগবে)

৩৪. শনিবারের মড়া।
(গ্রামাঞ্চলে সংস্কার আছে যে শনিবারে একজন মরলে আরো একজন মারা যাবে। একজন অসৎ ব্যক্তি আর একজনকে দলে টানতে চায়।)

৩৫. ষোলমুখীর ঘরের বত্রিশ মুখী।

৩৬. সন্ধ্যাকালে ছুছি হইলাম।
(বৃদ্ধ বয়সে অপযশ)

৩৭. সাক্ষী সুরানন্দ খুড়া।

৩৮. সিচাপানি মিছা কথা।
(কোনোটাই বেশিক্ষণ টেঁকে না)

৩৯. সোনার কুমড়া।

৪০. হিয়ালর টাইন ছাগী বাগী।

হেঁয়ালী

১. ছয়চরণ কৃষ্ণবরণ পেট কাটিলে আটে (পিপড়া)।

২. উপরে তক্তা তলে তক্তা, মাঝখানে কলকলি দেবতা (জিহ্বা)

৩. যার লাগি অত, তাবে পাইলাম পথ।
হেও ছাড়ে না, আমিও আইতাম পারি না। (জল আনতে গিয়ে বৃষ্টির জন্য ফিরতে দেরি হওয়া)

৪. মাতৃগর্ভে জন্ম তার মাতৃমাংস খায়,
ভূমিতে পড়িয়া সে হাঁটে ছয় পায়। (আমের পোকা)

৫. রাজার বাড়ির ধুড়ি, এক বিয়ানে বুড়ি। (কলাগাছ)
